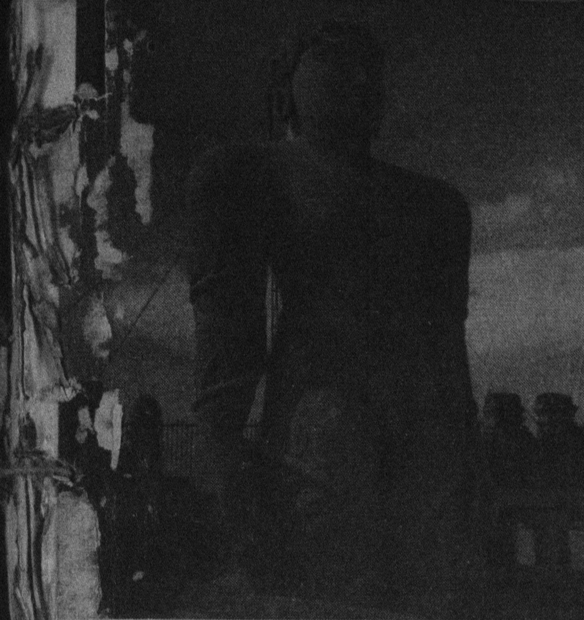


গোমতেশ্বর,
শ্রবণ বেলগোলা

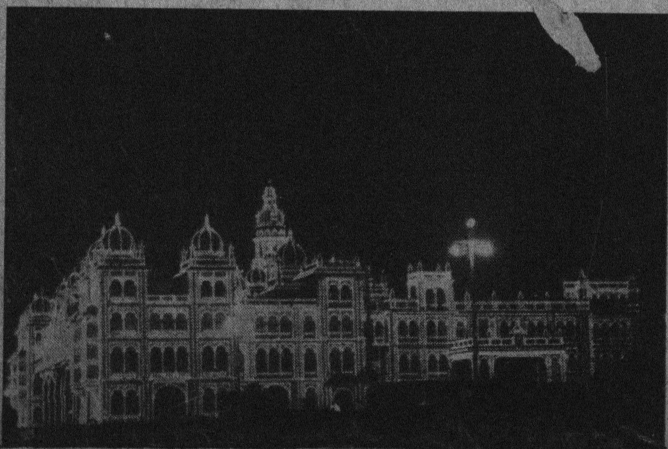
নন্দী,
মহিসুর





হয়শাল স্থাপত্য,
বেলুর

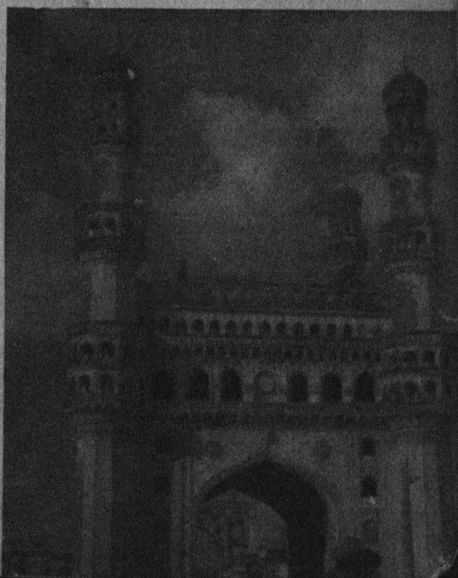
রাজপ্রাসাদ,
মহিস্থুর





বিবি-কা-মক্‌বারা,
ঔরঙ্গাবাদ

চারমিনার,
হায়দ্রাবাদ



রম্যাণি বীক্ষ্য

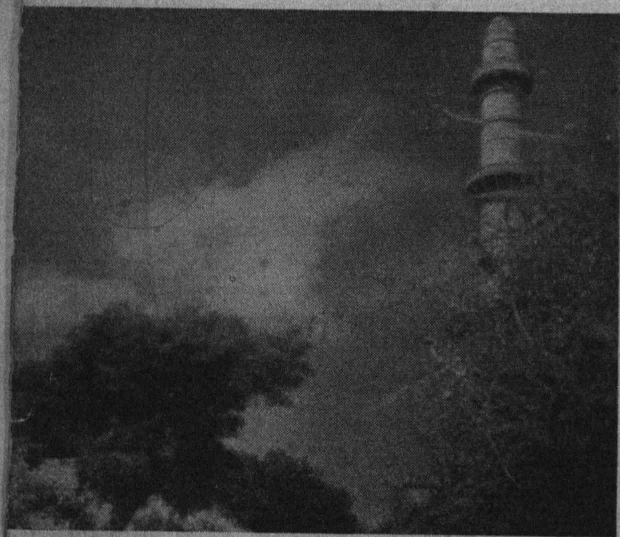
দ্রাবিড় পর্ব

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিঃ

হাসপাতাল,
হায়দ্রাবাদ



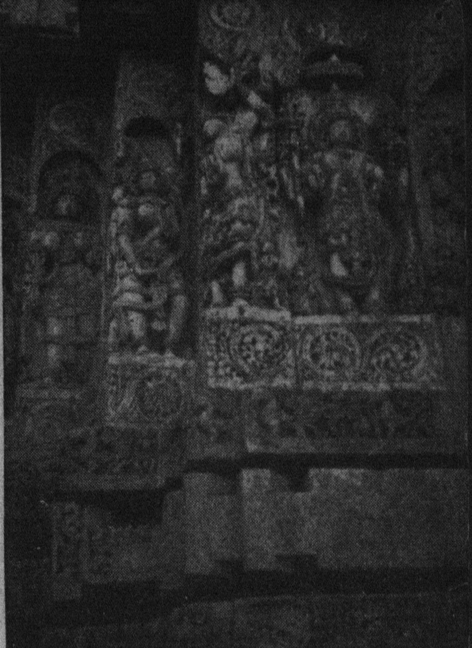


চাঁদমিনার,
দৌলতাবাদ

প্রকাশক :
জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : মহালয়া, ১৩৬৭

মুদ্রাকর
প্রিণ্ট-ও-গ্রাফ
৯-সি ভবানী দত্ত লেন
কলকাতা-৭৩



হয়শাল স্থাপত্য,
হালেবিদ



রাবণের কৈলাস উত্তোলন,
ইলোরা

এই লেখকের লেখা

রম্যাণি বীক্ষ্য :

১-দক্ষিণ-ভারত পর্ব

২-দ্রাবিড় পর্ব

৩-কালিন্দী পর্ব

৪-রাজস্থান পর্ব

৫-সৌরাষ্ট্র পর্ব

রূপম্ ?

একটি আশ্বাস

মণিপদ্ম

সেই উজ্জ্বল মুহূর্ত

অগ্নি অবগাহনে

জনম জনম

তুলতন্দ্রা

কী মায়া



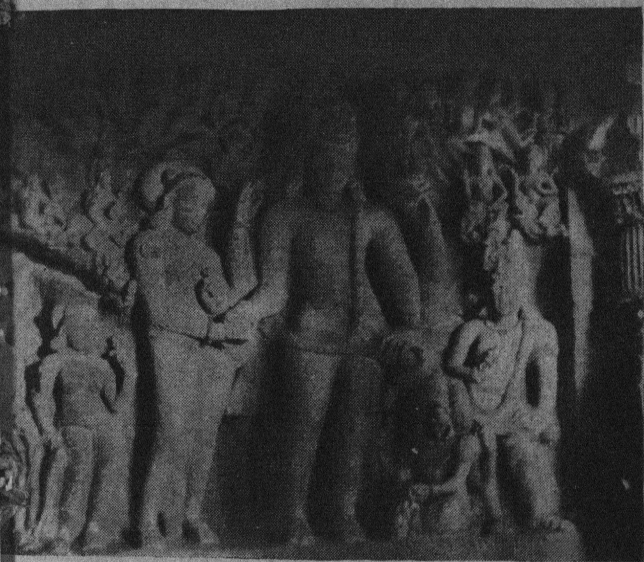
হয়শাল স্থাপত্য,
হালেবিদ

কৈলাস মন্দিরের স্থাপত্য,
ইলোরা





অজন্তার স্থাপত্য



ইলোরার স্থাপত্য



কৈলাস মন্দির,
ইলোরা

অজন্তা গুহাশ্রেণী



হলের দ্বার
৯ নং গুহা
অজন্তা



অজন্তা গুহাশ্রেণীর পথে

১

কন্যাকুমারীতে আমাদেব যাত্রা শেষ হল না। স্বাতি বলে, পৃথিবীব শেষ না হলে মানুষের যাত্রার শেষ নেই। পৃথিবীটা তো কোন সময় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায় না, সাবাক্ষণ লাট্টুর মতো ঘোরে, ঘুরতে ঘুরতেই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবীর মানুষ তাই কী করে স্থির হয়ে থাকবে! তাকে ঘুরতেই হবে, চলতেই হবে। তার যাত্রার শেষ কোনদিন হবে না।

যতদিন ভ্রমণ ততদিনই সান্নিধ্য। তার পরে কী সঞ্চিত আছে, তা ভাবতে ভয় হয়। এমনি একটি আশঙ্কা দেখেছিলুম স্বাতির বেদনার্ত দৃষ্টিতে। কিছু না বললেও আমি জানতে পেরেছিলুম তাব বাসনাব কথা। এক কন্যাকুমারী থেকে আমরা আর এক কন্যাকুমারী যাব, সমুদ্রবেলা থেকে পাহাড়ের চূড়োয়। পাশাপাশি বসব, কথা বলব কিংবা বলব না, মন প্রসারিত করে দেব উদার দিগন্তের দিকে। পৃথিবীর কথা? সমাজ-সংস্কার বিধি-নিষেধের কথা? নাইবা সে সব খানিকক্ষণের জন্য মনে রইল। সব কিছু ভুলে যাবার জন্য যে পরিবেশ চাই, সে কি কলকাতায় আছে, না দিল্লীতে!

ধর্মশালার বারান্দায় বসে আমিই প্রস্তাব পেশ করলুম: কালকের সেই মেয়ে-পুরুষের দলটি চমৎকার ব্যবস্থা করেছেন।

গভীর মনোযোগে মামা পাইপ টানছিলেন, বললেন: কী রকম?

খানিকটা তফাতে স্বাতি মামীকে ঘেঁষে বসে ছিল। আমি তাকে উৎকর্ণ হতে লক্ষ্য করেছি। বললুম: ত্রিবেন্দ্রাম থেকে তারা একই পথে কলকাতায় ফিরবে না। মোটরে এর্নাকুলম যাবে, ট্রেনে উটি, সেখান থেকে মোটরে মাইসোর।

চমৎকার!

মামার মন্তব্যে যেন বিদ্রূপের সুর ছিল। ঠিক এমনটি আমি আশা করি নি। কিন্তু স্বাতি আমাকে সাহায্য করল, বলল: লেপ কম্বল না নিয়েই বুঝি উটি যাওয়া যায়!

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমি সতর্ক হয়ে গেলুম। বললুম: সে কথা ওরা দেরিতে বুঝবে। তখন ভাববে, কোচিন থেকে সোজা মাইসোরে গেলেই ভাল হত। থ্রু কোচ আছে। রাতে উঠে ঘুমনো গেল, সকালবেলায় চোখ মেলে ব্যাঙ্গালোর। মাইসোর মাত্র পাঁচ ঘণ্টার পথ, মোটরে দু-তিন ঘণ্টা।

স্বাতি বলে উঠল: সত্যি!

মিথ্যে কথা কেন বলব!

আচ্ছা গোপালদা, বিজয়া দশমীতে শুনেছি লক্ষ লক্ষ লোক মাইসোরে যায়। মাইসোর কি কোন পীঠস্থান?

দক্ষিণ-ভারতে পীঠস্থান বড় কম। শিব আর বিষ্ণু তো আর্যদের দেবতা। তাই শোকে উন্মত্ত হয়েও শিব আর্যাবর্তেই ঘুরেছেন, আর সুদর্শন-চক্রে বিষ্ণু যে সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড করলেন, সে সবও উত্তর ভারতেই পড়ল।

হঠাৎ স্বাতির চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হল যে উত্তরটা তার একেবারেই মনোমত হয় নি। মামী পাশে আছেন। তিনি বেরিয়েছেন তীর্থ-দর্শন-মানসে। তাঁকে উৎসাহিত করতে অন্য উত্তরের দরকার। তাড়াতাড়ি বললুম: তবে একটা প্রবাদ এ দিকে প্রচলিত আছে। একদা মহিসুর রাজ্যের রাজা ছিলেন মহিষাসুর। দুর্গা সেইখানেই মহিষাসুর বধ করে বর্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। চামুণ্ডি পাহাড়ের উপর চামুণ্ডেশ্বরী এই রাজাদের ইষ্টদেবতা, নিকটেই নাকি মহিষাসুরের মূর্তি।

স্বাতি বলল: কিষ্কিন্ধ্যাও শুনেছি কাছে। রামচন্দ্র সেখান থেকেই

লঙ্কাবিজয়ে যাত্রা করেছিলেন। এইসব দেখেশুনেই বোধ হয় তিনি মহিষমর্দিনী দুর্গার পূজা প্রচলিত করেন।

স্বাতির ধর্মজ্ঞান দেখে কৌতুক বোধ করি।

খানিকটা ধোঁয়া উদ্গিরণ করে মামা বললেন: তারপর?

মনে হল দুজনেই আমরা ধরা পড়ে গেছি। তাতে ক্ষতি কী। হার তো বড়র কাছে। বললুম: সেখান থেকে উত্তরের পথ হায়দ্রাবাদ, ঔরঙ্গাবাদে নেমে অজন্তা ইলোরা। কিষ্কিন্ধ্যা দেখতে হলে গুণ্টাকলে গাড়ি বদল করতে হবে।

মামা বললেন: মহিসুরে আর কী মন্দির আছে বল।

শহরে আর নেই। কিন্তু আশেপাশে সোমনাথপুর বেলুর আর হালেবিদে এমন মন্দির আছে, যার তুলনা নেই গোটা ভারতবর্ষে। হয়শাল রাজাদের কীর্তি।

মামা মামীর দিকে তাকালেন। মামী কোন কথা কইলেন না।

আমি বললুম: পথ আমাদের দীর্ঘতর হবে না, শুধু কয়েকটা দিন বেশি সময় লাগবে।

তাতে আর ক্ষতি কী! শরীর তো সবারই সুস্থ মনে হচ্ছে।

মামার কথা শুনে স্বাতি যে কেন লাফিয়ে উঠল না, আমি তাই ভেবে আশ্চর্য হয়েছি। সে নাকি নিজেও আশ্চর্য হয়েছে। অনেকদিন পরে চুপিচুপি আমাকে বলেছিল, গোপালদা, তোমার পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে হয়েছিল।

কেন নিলে না?

মার ভয়ে। মা কিছু সন্দেহ করলেই বেঁকে বসতেন।

আর মামা?

বাবা সন্দেহ করেছেন বলেই তো রাজী হয়েছেন।

লজ্জার কথা!

সে তো তোমার।

আমারই বটে।

ত্রিবেন্দ্রাম থেকে তাই আমরা রেলে চেপে মাদ্রাজে ফিরলুম না। ট্যাক্সি ঠিক করা হল এর্নাকুলমের জন্য। সোয়াশো মাইল পথ, পাঁচ-ছ ঘণ্টায় অতিক্রম করা যায়। পথের দৃশ্যও নাকি মনোরম। কিন্তু এই মনোরম দৃশ্য অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার নজরে পড়ল না। ড্রাইভারের পাশে বসে মন আমার অন্য জগতে ডুবে গেল।

পনর দিন আগে কি আমি স্বাতিকে চিনতুম! না, এই পরিবারের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ ছিল! চারটে কুড়ির লোকাল ট্রেন ধরতে না পেরে সাত নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসেছিলুম মাদ্রাজ মেল দেখতে। রায়সাহেব অঘোর গোস্বামী আমার কাঁধে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললেন ঃ গোপাল কোথায় যাচ্ছ ?

একদিন তাঁর বালিগঞ্জের বাড়িতে যখন দেখা করতে গিয়েছিলুম, তিনি চিনতে পারেন নি। না পারবারই কথা। মাকেই ভাল করে চিনতেন না। আপনার বোনকেই লোকে আজকাল ভুলে যাচ্ছে, তায় পাতানো বোন! আর গরিবকে চেনাও তো বিপদের কথা। চাই ছাঁড়া আর বচন নেই পোড়া দেশে।

মামা বিপদে পড়েছেন। তাঁর চাকর রামখেলাওন গেছে পালিয়ে। এত দূরের পথে একা বেরতে কিছুতেই সাহস পাচ্ছেন না। পাঁচ মিনিটের ঘণ্টা যখন পড়ল, মামা বললেন ঃ মালপত্র নামিয়ে নিই ?

মামী আমার দিকে চেয়ে বললেন ঃ তুমি আমাদের সঙ্গে যেতে পার না ?

মামা আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরলেন। জানলার ভিতর মামীর চোখ দুটো দেখলুম ছলছল করছে বেদনায়। আর দরজায় দাঁড়িয়ে তাঁদের কৃশাঙ্গী মেয়েটি বড় বড় চোখ মেলে আছে উত্তরের প্রতীক্ষায়।

আমি জাত-বাউণ্ডুলে। অফিসের দিনে অফিস পালাই, ছুটির দিনে বাড়ি ফিরি নে। বাহিরের আকাশ আমাকে টানে, সেই টানে ঘরে আজও মন বসল না। পরদিন থেকে পুজোর ছুটি। সংসারে

কেই নেই ভাবনা ভাববার। আমার বাধা কিসের! চলতি ট্রেনে আমি উঠে পড়েছিলুম।

তারপর মাদ্রাজ মহাবল্লীপুরম কাঞ্চীপুরম ত্রিচিনপল্লী মাদুরা ধনুষ্কোডি রামেশ্বর ত্রিবেন্দ্রাম আর কন্যাকুমারী। সমস্ত দক্ষিণ ভারতটাই প্রায় দেখা হয়ে গেল।

একদা নর্মদা ও কৃষ্ণার মধ্যবর্তী ভূখণ্ডকে দাক্ষিণাত্য বলত। সাধারণ ভাবে বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে সমগ্র দেশকেই দাক্ষিণাত্য বলে। ঐতিহাসিক মানচিত্রে দেখেছি দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের খানিকটা পার্থক্য রাখা হয়েছে। হায়দ্রাবাদ ও মহিসুর রাজ্য পড়েছে দাক্ষিণাত্যে, দক্ষিণ ভারত তারও দক্ষিণের অংশ। এই সংজ্ঞা গ্রহণ করলে এইবারে আমরা দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করব। দ্রাবিড় ভ্রমণ।

আর কেউ লক্ষ্য না করলেও স্বাতির আকস্মিক পরিবর্তন আমি সারাক্ষণ প্রত্যক্ষ করছি। আড়ালে আমায় এড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সকলের সামনে কথা কইছে সহজ ভাবে। রামেশ্বরের সেই ঘটনার পরও তার কোন ভাবান্তর হয় নি। মামা উদ্বিগ্ন হয়েছেন, মামীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে, আর আমার প্রাণ ভয়ে উঠেছিল শুকিয়ে। কিন্তু স্বাতিকে স্বাভাবিক দেখেছি। সারা রাত সে বাড়ি ফেরে নি, আমিও ফিরি নি। ঘুমিয়ে পড়েছিলুম মন্দিরের ভিতর। শুধু ভয় নয়, লজ্জাতেও আমার মাথা কাটা গিয়েছিল। কিন্তু দৃঢ়স্বরে স্বাতি বলেছিল ঃ অপরাধ কিসের! রামেশ্বরের মন্দির-প্রাঙ্গণে পৌঁছে দিয়েও কি তোমার দায়িত্ব ফুরবে না? এ যদি অপরাধ হয় তো এই অপরাধই জীবনে সত্য হয় উঠুক।

এই দৃপ্ত মেয়েটি আজ হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেল! চোখের উপর চোখ রেখে কেন কথা কইতে পারে নি! কেন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, কেন সরে গেছে সামনে থেকে! সে কি চতুর্দশীর রাতের কথা এখনও ভোলে নি! অত জল, অত আলো, অমন আকাশ আর

অসীম [illegible] পরিবেশে যে সবাই নিজেকে হারিয়ে ফেলবে। তার তো দোষ নেই, দোষ কারও নয়।

আকাশের উজ্জ্বল চাঁদকে ঘিরে বসেছিল নক্ষত্রের নৃত্যসভা। নিচে আমরা দুজন। অমন পরিপূর্ণতার মধ্যেও যেন অসম্পূর্ণতার আভাস পেয়েছি। স্বাতি বলেছিল: আজ রাতেই যে পৃথিবীর শেষ হবে না কে জানে!

আমি বলেছিলুম: পূর্ণিমার যে আরও একটি দিন বাকি। আজই সব কিছুর শেষ চেয়ো না।

এর পর থেকেই স্বাতি আমায় এড়িয়ে চলছে। বোধ হয় সেই অসতর্ক মুহূর্তে ধরা দিয়ে ফেলার লজ্জায়। আমি হেসেছিলুম।

মামা মামী তখন কাছে ছিলেন না। স্বাতি বলল: হাসছ যে!

তোমার লজ্জা দেখে।

আমার লজ্জা, না তোমার!

এর উত্তরেও আমি বলেছিলুম: আমারই বটে।

২

পিছন থেকে মামা বললেন : গোপাল একেবারে চুপচাপ বসে আছ !

ভাবছি।

ভাবছ, তা একটু জোরে জোরেই ভাবলে পার।

স্বাতি হেসে উঠল।

মামী বললেন : জোরে জোরে আবার ভাববে কী !

কেন, তার অসুবিধা কী ! গোপাল তো আর আকাশ কুসুমের কথা ভাবছে না যে বলবার বাধা আছে। নিশ্চয়ই এমন কিছু ভাবছে যা আমাদেরও শুনতে ভাল লাগবে !

বলতে পারলুম না যে আমি আকাশ কুসুমের কথাই একটু আগে ভাবছিলুম। বললুম : একজনের ভাবনা আর একজনের খুব কমই ভাল লাগে।

সে দুঃখের কিংবা বিপদের ভাবনা। তুমি তো হয় অগস্ত্যের কথা ভাবছ, নয় পরশুরামের। অগস্ত্য কেন ফিরলেন না, আর পরশুরাম ফিরেছিলেন কি না।

স্বাতি আবার হেসে উঠল।

সত্যিই এ একটা ভাববার কথা। অগস্ত্য কেন ফেরেন নি, সে আমাদের জানা আছে। বিন্ধ্য পর্বত একদা আকাশ ছুঁয়ে বলেছিল, সূর্যকে যেতে দেব না মাথার উপর দিয়ে। দিন রাত্রি একাকার হয়ে গেল, সৃষ্টি বুঝি রসাতলে যায়। সেদিন উদ্ধত শিষ্যকে শান্ত করবার জন্য অগস্ত্য এসেছিলেন দাক্ষিণাত্যে। বিন্ধ্য প্রণাম করেছিল। গুরু তাকে তাঁর প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত নত হয়ে থাকবার নির্দেশ দিয়ে গেলেন, আর ফিরলেন না। তাঁর সঙ্গী সাথীরা কেন ফিরল না, সেই কথা ভেবে আমি বিস্মিত হই।

স্বাতি বলল ঃ এমন ট্যাক্সি ছিল না, এমন রাস্তাও না।

উল্টোটাও তো হতে পারে। এমন দেশে এল যে ফিরতে আর মন চাইল না।

মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে মামা বললেন ঃ আলবাৎ পারে। এমন নজির বহু আছে—বিদেশে গিয়ে দেশে আর ফিরল না। খোঁজ নিয়ে দেখ, বিয়ে-থা করে সে-দেশেই সুখে সংসার করছে।

স্বাতি বলল ঃ এ তো অনার্যের দেশ ছিল, রাক্ষস আর বানরের। এ দেশে কেউ স্বেচ্ছায় বাস করে !

মামা বললেন ঃ রাবণের কথা ভাব। তাঁর লঙ্কাপুরীতে স্থান পেলে যে কোন আর্যসন্তান কৃতার্থ হত। বল না গোপাল, আর কী কী ছিল এদেশে।

বিপদের কথা। সে যুগের তো কোন ইতিহাস নেই। টুকরো টুকরো খবর থেকে মোটামুটি একটা ধারণা করে নেওয়া যেতে পারে।

তাই কর।

বলে মামা আবার পাইপে মন দিলেন।

আমি ভাবতে লাগলুম, কোন্‌খান থেকে শুরু করি। কিন্তু কিছু বলবার আগেই স্বাতি বলল ঃ জোরে জোরেই ভাব না গোপালদা !

আর ইতস্ততঃ না করে বললুম ঃ ভাবছি কোন্‌খান থেকে শুরু করি। পেছন থেকে সামনে, না সামনে থেকে পেছনে। আজকের ঘটনা আমরা জানি, কাজেই ধীরে ধীরে পিছু হাঁটতে পারি। আবার গোড়ার কথা কিছুই জানি না, কাজেই যেখান থেকে জানি সেইখান থেকেও শুরু করতে পারি।

মামা বললেন ঃ তুমি সামনে বসেছ, তুমি পেছনেই হাঁট।

দাক্ষিণাত্যে মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হয়েছে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। তার পরের ইতিহাস পাকা। কিন্তু আগের ইতিহাস তৈরি হয়েছে হিন্দু ও বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ, চীনাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত ও শিলালিপি থেকে। সবচেয়ে বেশি সাহায্য পাওয়া গেছে পেরিপ্লাস থেকে। এ একখানা

অদ্ভুত গ্রন্থ। লোকে বলে এরিয়ানের লেখা। লেখা হয়েছে আশি থেকে উননব্বই খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। সে যুগে গ্রীকেরা ভারতে আসত মিশর আরব পারস্য বেলুচিস্থান হয়ে। ভারতের কোন্ কোন্ বন্দরে নোঙর ফেলত, তারই এক অদ্ভুত বিবরণ। দাক্ষিণাত্যের বন্দর ও বাণিজ্যের বৃত্তান্ত পড়ে মনে হয় না যে সেখানকার সভ্যতা উত্তর ভারতের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল।

এর পাঁচ-ছ শো বছর আগে বুদ্ধের যুগ। মহাবংশ মিলিন্দপ্রশ্ন সদ্ধর্মালঙ্কার রাজাবলী রাজরত্নাকরী প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থে দাক্ষিণাত্যে দুটি খণ্ডের উল্লেখ আছে। কৃষ্ণার উত্তরে উত্তর খণ্ড ও দক্ষিণে দক্ষিণ খণ্ড। উত্তর খণ্ডে ছিল উড়িষ্যা কলিঙ্গ লাল দেশ সুনাপরান্তক অবন্তি ও নবভুবন। দক্ষিণ খণ্ডে রক্তচন্দনের দেশ দ্রাবিড় পাণ্ড্য ও মলয় মহিন্দ্র নাগদ্বীপ ও মহিলারট্‌ঠ। চোল রাজ্য ছিল বৌদ্ধধর্ম-বিরোধী।

বাংলার বীর সন্তান বিজয়সিংহের কথা মনে পড়ে, যিনি 'হেলায় লঙ্কা করিল জয়'? নিশ্চয় পড়ে। কেননা আমাদের শৌর্যের ইতিহাস তো ঐখান থেকেই শুরু। আড়াই হাজার বছর আগে। মহাবংশে আছে, বুদ্ধ যেদিন নির্বাণ লাভ করেন, বাংলাদেশে বিজয়ের জন্ম হয়েছিল সেইদিন। যৌবনে ইনিই শত্রুদের তাড়িয়ে দক্ষিণ দেশে প্রবেশ করেছিলেন। লাল দেশের পর্বত ও উপত্যকার উপর দিয়ে মৃত্তুগিরি মলয়গিরি ও পাণ্ডুগিরি অতিক্রম করে যান। মলয়গিরি সূর্পারকে, মহাভারতে তার উল্লেখ আছে। সেই কালে মাহিষ্মতী ছিল নীলের রাজধানী। কাজেই মহাভারতের যুগেও আমরা সভ্যতার বিস্তার দেখি দক্ষিণ দেশে। গত চার হাজার বছর ধরে সভ্যতার ধারা এখানে অব্যাহত আছে।

ইতিহাসের সন তারিখ দিয়ে রামায়ণের কালকে বাঁধা যায় না। কোন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের মতে রামায়ণের কাল মহাভারতের পরে। তার কারণ বলেন এই যে রামায়ণে সভ্যতর সমাজের পরিচয় আছে।

সভ্যতার ক্রমবিকাশ মানতে হলে রামায়ণকে মহাভারতের পরবর্তী কালের ঘটনা বলে মানতে হবে।

করুণভাবে মামা বললেন : আমাদের এতদিনের বিশ্বাসকে তুমি পালটে দেবে গোপাল ?

না। আমাদের শাস্ত্রে এ মতের সমর্থন নেই। এ দেশের মুনি ঋষিরা বলেছেন যে সভ্যতা উল্টো পথে হাঁটছে, পৃথিবীটা দিনে দিনে অসভ্য হবে। তার প্রমাণ—সত্যযুগের পর ত্রেতা দ্বাপর, তারপর কলি। কলিতে ধর্মনাশ হবে, অর্থাৎ মানুষ তার আদিম বর্বর প্রবৃত্তি পাবে ফিরে।

মামা বললেন : এ সত্য না মেনে আজ উপায় নেই। মানুষ আবার বাঁদর হয়ে যাচ্ছে।

স্বাতি হেসে উঠল খিলখিল করে।

আমরা কেরালার বুক চিরে চলেছি। দক্ষিণ থেকে উত্তরে। ট্রেনে চেপে আমরা কুইলন আসতে পারতুম। রেলপথ তার পরে পূর্বদিকে গেছে। কুইলন থেকে এর্নাকুলম পর্যন্ত নতুন রেলপথ তৈরি হচ্ছে। আর কিছুদিন পরে দেশের লোকের আর যাতায়াতের দুঃখ থাকবে না।

রেলপথ আর রাজপথ ছাড়াও এদেশে আর একটা পথ আছে। সে জলপথ। ব্যাকওয়াটার্স ক্যানাল। কেরালার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। মাঝখানে যে ত্রিশ মাইল পথ যুক্ত নয়, তার উপরেও সরকারের দৃষ্টি পড়েছে। কেরালার সম্পদ এই জলপথেই বেশি চলাচল করে।

স্বাতি আমাকে ধমক দিল, বলল : আবার তুমি নিঃশব্দে ভাবছ ?

এ বড় বিপদের কথা। আমার কি চুপ করে চলতে নেই ?

মামা বললেন : এ হল ভাগ্যের কথা। মাস্টার সারা জীবন চেঁচাবে, আর ছাত্ররা শুনবে চুপ করে।

আমি তো মাস্টার নই, আমি কেরানী। মাথা নিচু করে কলম চালানো আমার কাজ।

পিছন ফিরে দেখলুম, স্বাতির দৃষ্টি যেন থমথম করছে। আর মামী বসে আছেন নির্বিকার ভাবে। স্বাতি কি ক্ষুব্ধ হল! কিন্তু কেন হবে! আমি তো মিথ্যা বলি নি। এই পরিবারের সঙ্গে আমার সামাজিক পার্থক্যের কথাই শুধু স্মরণ করিয়ে দিয়েছি। রায়সাহেব অঘোর গোস্বামী এম. পি., বাংলাদেশের জমিদার। ইংরেজ সরকার আর দু বছর এদেশে থেকে গেলে তিনি নিঃসন্দেহে রায়বাহাদুর হতেন। আমি তাঁর পরিবারের কেউ নই। তাঁর চাকরের পরিবর্তে এসেছি সাহায্য করতে। খড়্গপুরে মামার মুখেই এই কথা শুনেছি। ওঁদের গাড়ি থেকে খবরের কাগজখানা আনবার জন্য এগিয়ে গিয়েছিলুম। মামার গম্ভীর উপদেশ শুনে থমকে দাঁড়ালুম। মামীকে বলছিলেন: বেশি লাই দিও না এদের। খরচা করে নিয়ে যাচ্ছি সেই যথেষ্ট।

শেষ পর্যন্ত মামা নিজে সতর্ক থাকতে পারেন নি, কিন্তু আমি সর্বাক্ষণ সাবধানে আছি। আদরে যত্নে স্নেহে ও বাৎসল্যে ধন্য হয়েছি, কিন্তু আত্মবিস্মৃত হই নি। স্বাতিও হয় নি। কন্যাকুমারীর সমুদ্রতীরে বসে সেইজন্যই আমাকে অনুরোধ করেছিল: দেশে ফিরে বাবার অনুগ্রহ নিয়ে নিজেকে ছোট ক'রো না।

এ অনুরোধ সে না করলেও পারত। মাদ্রাজেই জেনেছিলুম, অগ্রহায়ণে তার বিবাহ। ত্রিচিতে বাকি খবরটুকুও মামী দিয়েছিলেন। বড় ভাল পাত্র। রূপে গুণে তার তুলনা হয় না। আট বছর বিলেতে টেক্সটাইল পড়ে দেশে ফিরেছে। মোটা মাইনের চাকরি পাবে। যেমন বিনয় তেমনি আদবকায়দা। মামীর নাকি হাঁফ ধরে তার সঙ্গে তাল রাখতে। মামার মুখে কিন্তু এই পাত্রের গুণের কথা শুনি নি। নিতান্ত নিরাসক্তভাবে তিনি শুধু পাইপে ধোঁয়ার কুণ্ডলী রচনা করেছেন।

মামা যা বলেন নি তা শুনেছি স্বাতির মুখে। সমুদ্রের ধারে বসে বলেছিল: লোকটা আট বছর বিলেতে কাটিয়েছে। মনুষ্যত্ব

বিকিয়ে সাহেবিয়ানা এনেছে সেখান থেকে। তার সহধর্মিণীর প্রয়োজন নেই, আছে বান্ধবীর। আর সে প্রয়োজনটাও নিতান্ত জৈব। একদিন মনে হয়েছিল, তার গলায় মালা দেবার চেয়ে রামখেলাওনের সঙ্গে ইলোপ করাও সহজ হবে আমার কাছে।

তারপরেই বলেছিল ঃ একটা অনুরোধ আছে তোমার কাছে। দেশে ফিরে বাবার অনুগ্রহ নিয়ে নিজেকে ছোট ক'রো না।

আমার প্রত্যয় হয়, স্বাতিকে আমি আঘাত দিয়ে ফেলেছি। সমাজটা পার্বত্যপ্রদেশের মতো, উঁচু নিচু অসমতল বন্ধুর। কেউ পাহাড়ের নিচে, কেউ উপরে। সহজ মসৃণ পথে তাদের যোগাযোগ হয় না। যদি হত, তাহলে ভাবনা ছিল না। পৃথিবীটা অন্য রকম হত। অন্ততঃ স্বাতি হত না বিচলিত।

কিন্তু মামা আমার মন্তব্যকে সহজভাবেই নিলেন, বললেন ঃ কেরানীবাবুর ক্ষমতার গল্প জান তো? সেনাপতির দাঁত ভেঙেছিল কলমের খোঁচায়।

মামী বললেন ঃ কী রকম?

সাহেবের পেনশন পেতে দেরি হচ্ছে। কেরানীবাবুকে শাসিয়ে বললেন, আজ যদি পয়সা না পাই তো তোমার দাঁত ভাঙব। কেরানীবাবুও শাসাল, কে কার দাঁত ভাঙে দেখব। বড়সাহেব ডেকে শুধোলেন, কেন দেরি হচ্ছে? কেরানীবাবু বললে, চেহারা মিলছে না। যিনি পেনশন পাবেন তাঁর সামনের দুটো দাঁত নেই, এঁর আছে। নথিপত্র দেখিয়ে দিল। ভাবি বিপদ! শেষ পর্যন্ত সেনাপতিকে দুটো শক্ত দাঁতই তুলে আসতে হল।

আমরা হেসে উঠলুম।

মামী বললেন ঃ সত্যি গল্প?

তা জানি নে। পড়েছি তুষারবাবুর বইয়ে

৩

ত্রিবাঙ্কুরের এক বিখ্যাত কবি তাঁর এক কবিতায় লিখেছেন :

কুইলন যে দেখেছে
সে সেখানেই থেকে যেতে চাইবে
নিজের ঘর দোর ছেড়ে—

সেইজন্যই বোধ হয় আমরা কুইলন দেখতে সাহস পেলুম না। চোখ বুজে এগিয়ে গেলুম।

মামা বললেন : এ সব গল্প তুমি কোথায় পড় ?

শোনা গল্প।

স্বাতি বলে উঠল : সারাক্ষণই সে লোকের সঙ্গে ভাব করবার চেষ্টা করছে।

মামা বললেন : এখানে দেখবার কী আছে ?

কিছুই নেই শুনেছি।

তবে ?

একসময় এর সমৃদ্ধি ছিল বিশ্বজোড়া। তখন জাহাজ আসত ফিনিস পারস্য আরব গ্রীস রোম আর চীন থেকে। চীনের তাঙ্গ রাজাদের সময় বাণিজ্য জমজমাট ছিল। কুবলাইখানের আমলে তো দূত বিনিময় হত। এ অঞ্চলে আজও অনেক চীনে তৈরি পিতল ও চীনেমাটির প্রাচীন বাসন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। কুইলন তখন স্বাধীন ছিল। তারপর কখনও ত্রিবাঙ্কুর কখনও কোচিন রাজ্য এই শহরটি শাসন করেছে। শেষ পর্যন্ত ত্রিবাঙ্কুরের ভাগেই পড়েছিল।

স্বাতি জানতে চাইল : ত্রিবাঙ্কুর নাম কেন হল ?

মুশকিল।

জান না তো ?

তোমার স্বাতি নাম কেন হল ?

বাবা মা রেখেছেন।

ত্রিবাঙ্কুর নাম রেখেছে এ দেশের লোক।

গোপালদা হেরে গেছে, হারিয়ে দিয়েছি।

আমি তো হেরেই আছি। কিন্তু উত্তরটাও দিতে পারি। এই জায়গার নাম ছিল শ্রী-ভাঝুম-কোড়ু। তার মানে যেখানে ঐশ্বর্যের বাস। কালক্রমে এই নাম হল থিরুভিথানকোড়ু। তারপর সাহেবী কায়দায় ট্রাভাঙ্কোর বা ত্রিবাঙ্কুর।

এই রাজাদের রাজধানী ছিল পদ্মনাভপুরমে। আজও সেখানে তাঁদেব পুরনো প্রাসাদ আছে। আগে জানা ছিল না যে কন্যাকুমাবীব পথের ধারে সেই প্রাসাদ। ফেবাব পথে আটত্রিশ মাইল পথ এসে মাইলখানেক ভিতরে যেতে হয়। উপেক্ষাব জিনিস তা মোটেই নয়। তিন তলাব একটা শোবাব ঘবে গিয়ে চোখ জুড়িয়ে যাবে। সেই ঘরের নাম 'হল্ অব ম্যুবাল্স্'। দেয়ালের গায়ে শিল্পের অদ্ভুত নমুনা। হালকা লাল নীল আব হলদে বঙে কত বিচিত্র চিত্র। একটি জাদুঘরও আছে, পাথবেব মূর্তি আর শিলালিপির ভাণ্ডার।

আব কী আমরা ছেড়ে এলাম ?

ববকলা।

সে আবাব কী ?

ত্রিবেন্দ্রাম থেকে ছাব্বিশ মাইল ছেড়ে এসেছি। সমুদ্রেব ধাবে শুনেছি এমন অপূর্ব স্থান আর নেই। পাহাড় প্রস্রবণ টানেল আব টেম্পল। তরঙ্গের পব তরঙ্গ এসে জনার্দন মন্দিরের পাদদেশে আছড়ে পড়ছে। নির্জন সমুদ্রবেলায় তরঙ্গভঙ্গের অবিবাম বন্দনাগান। জনার্দনমূর্তি দেখেও মুগ্ধ হতে হবে। দক্ষিণ ভারতের একশো আটটি বিষ্ণুমন্দিবে প্রভুব এমন বালকমূর্তি আর নেই।

মামী বললেন ঃ এমন জায়গায় কেন দাঁড়ালে না ?

কঠিন প্রশ্ন। কী উত্তর দেব !

মামা বললেন : তুমি আবার হরিভক্ত হলে কবে থেকে?

মামী এ কথার উত্তর দিলেন না। আমি বললুম : ম্যাপে দেখেছি, বরকলা ঠিক পথে পড়ে না। কতটা দূর, তা অনুমান করতে পারি নি।

স্বাতি বলল : যাক, একটা সত্যি কথা স্বীকার করলে।

সহসা আমার একটা বিশ্বাসের গল্প মনে পড়ল। ত্রিবেন্দ্রাম্ যাবার পথে ট্রেনে এই গল্প শুনেছিলুম। বরকলার মন্দিরে একটা ঘণ্টা আছে। জাহাজের ঘণ্টা। কেমন করে জাহাজ থেকে সেই ঘণ্টা মন্দিরে এল, তারই গল্প। একদা এক ওলন্দাজ জাহাজ এসে তীরে লাগল। বাতাস নেই। দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে। বাতাসের অভাবে জাহাজ আছে আটকে। জাহাজের কাপ্তান সাহেব চুপিচুপি এলেন এই মন্দিরের পুরোহিতের কাছে। বললেন : যদি সাহায্য কর, আমার জাহাজের ঘণ্টা দিয়ে যাব তোমার মন্দিরের জন্য।

কী সাহায্য?

একটু বাতাস। সমুদ্রের উপরে আমরা ভাসতে চাই, এগোতে চাই।

পুরোহিত বললেন : তথাস্তু।

সায়াহ্নে সাড়ম্বরে দেবতার পূজা হল, আর অন্ধকার হতেই জাহাজ উঠল দুলে। বাতাস—বাতাস উঠেছে। প্রবল বাতাস। ঘণ্টা নিয়ে কাপ্তান ছুটলেন মন্দিরে। এ যে অসম্ভব ব্যাপার। দেবতার পায়ে অর্ঘ্য না দিয়ে কি পালিয়ে যাওয়া যায়! সেই থেকে প্রহরে প্রহরে সেই ঘণ্টা বাজে, মন্দিরে পূজার ও আরতির সংকেত।

মামী চোখ বুজে ছিলেন। এইবারে খুলে বললেন : তোমরা শুধুই বেড়াতে এসেছ।

চুয়াল্লিশ মাইলে আমরা কুইলনও ছেড়ে এসেছি।

একটা নতুন জিনিস আমরা ভাল করে দেখবার সুযোগ পাই নি।

সেটা হল টানেল। ববকলার দুটো টানেলেব মধ্যে একটা প্রায় আধ-মাইল লম্বা। এব ভিতব দিয়ে ট্রেন যায় না, মোটরও না। যায় নৌকো। কুইলন থেকে ত্রিবেন্দ্রাম পর্যন্ত যে নালা বইছে, সেই নালা এই টানেলেব ভিতর দিয়ে পাহাড় অতিক্রম করেছে। দেখতে পেলে নতুন অভিজ্ঞতা হত।

কুইলন থেকে তিপ্পান্ন মাইল উত্তবে আল্লেপ্পি বন্দব। লোকে আদব কবে পুবদেশেব ভেনিস বলে। যত নালা তত নৌকো। নাবকেলেব ছোবড়া বোঝাই নৌকোগুলো নালাব জলেব বঙ যেন পালটে দিয়েছে। অদ্ভুত দৃশ্য। আব আছে গোলমবিচ। এবা বলে কালো সোনা। পৃথিবীব সমস্ত দেশ এই কালো সোনাব মুখ চেয়ে আছে।

আর কী আছে?

সে পথে আমবা যাব না। সে পেবিয়াব স্যাঙ্কচুয়াবি। বন্য জন্তুর আবাস। ত্রিবেন্দ্রাম থেকে একশো সত্তব মাইল। কোট্টায়ামেব কাছেই ববাব চা আব কফিব বড় বড় বাগান। পেবিয়াব নদীকে বেঁধে পেবিয়ার লেক হয়েছে। সেখানে একটু ঘুবে নেওয়া যেতে পাবে। লেকেব ধাবে গভর্নমেণ্ট হাউসেব বারান্দায় বসে দলে দলে হাতি ও বন্য জন্তু দেখা যায় জল খেতে আসছে। এই তিনশো বর্গমাইল অবণ্যেব ভিতর কত জন্তুই না আছে। কিন্তু শিকারেব অনুমতি নেই কাবও জন্য। থেকাডেব অবণ্য-নিবাস হোটেলে থাকবার চমৎকাব ব্যবস্থা। কোচিন এখান থেকে একশো পঁয়ত্রিশ মাইল পথ।

সোজা পথে আমবা কোচিনের দিকে চলেছি। তার উত্তবে আমবা যাব না। গেলে প্রথমে পাওয়া যেত আলওয়ে। পেরিয়াব নদীর তাবে একটি কাবখানার শহর। কাচ কাগজ কাপড় আর অ্যালুমিনিযম তৈরী হচ্ছে। ইতিহাসে এই শহরের নাম আছে টিপু সুলতানেব জন্য। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে টিপু বেবিয়েছিলেন ত্রিবাঙ্কুব জয়ে। এইখানে ধাক্কা খেয়ে তাকে ফিবে যেতে হয়। সৈন্যরা তাঁকে কাবু

কিন্তু পারতে না, কাবু করেছিল পেরিয়ার নদীর প্রবল বন্যা। যুদ্ধ বন্ধ করে তাঁকে ফিরে যেতে হয়েছিল।

ত্রিচুর শহর আরও উত্তরে। এখানে যাত্রী আসে পুরম উৎসবে। মহিসুরের দশেরার মতো। তারা ভডাকুন্নাথন মন্দির দেখে। আর দেখে চিড়িয়াখানা ও সরীসৃপ গৃহ। টাউন হলে কিছু শিল্পের নমুনাও আছে।

এই পর্যন্ত দেখলেই কেরালার বাহিরটা দেখা সম্পূর্ণ হবে।

কেরালাব ইতিহাসের শুরু বাণিজ্যের খ্যাতি দিয়ে। খ্রীষ্টজন্মের এক হাজার বছর আগে রাজা সলোমনের জাহাজ আসত এখানে। ওফির নামে একটা বন্দরে ফিনিসিয়ানরা তাদের জাহাজের নোঙর ফেলত। লোকে বলে, ত্রিবেন্দ্রামের দক্ষিণে পুভার গ্রামই সেই জায়গা। গ্রীস আর রোমেব সঙ্গে যে বাণিজ্যিক সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ ছিল, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। মেগাস্থিনিস প্লিনি ও মার্কপোলো সে সব বৃত্তান্ত লিখে রেখে গেছেন। কুইলন আর কোচিনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল চীনাদেব। ইতিহাসে তার প্রমাণ না থাক, এ অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে তার প্রমাণ তারা রেখে গেছে। সে তাদের মাছ ধরার জাল।

তারপর একে একে এল দিনেমার পর্তুগীজ ও ওলন্দাজ, এল ফরাসী ও ইংরেজ। পর্তুগীজ ভাস্কো ডা গামা কালিকট বন্দরে এসেছিলেন পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে। আরবী ও মিশরী বণিকরা প্রবল আপত্তি তুলেছিল। কিন্তু পর্তুগীজরা গ্রাহ্য করে নি। কোচিনে বেশ জাঁকিয়ে বসল। চুক্তি হল আট্রিঙ্গলেব রাণীর সঙ্গে। এর পর কে রইল আর কে কখন গেল, সবই লেখা আছে ইতিহাসের পাতায়। ইতিহাস আমরা স্কুলে পড়ি।

এরই ভিতর একটা সত্য লক্ষ্য না করে উপায় নেই। কয়েক শতাব্দী ধরে বিবাদ চলেছিল খ্রীষ্টান ও মুসলমান বণিকদের মধ্যে। বাজা সলোমনের জাহাজে চড়ে ইহুদীরাও এসেছিল। কিন্তু এ দেশটার হিন্দু সংস্কৃতি বদলাল না। লোকের রীতিনীতি আচার-

ব্যবহার ঠিক আগের মতোই রয়ে গেল। যিশুখ্রীষ্টের শিষ্য টমাস এখানে ধর্ম প্রচার করেছেন, সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার কন্যাকুমারী থেকে কুইলন পর্যন্ত ভ্রমণ করে কোট্টারে নাকি গির্জা নির্মাণ করে যান। কত লোক ধর্মান্তরিত হল, কিন্তু মানুষগুলো একই রকম রইল। সাদা সরল শিক্ষিত অতিথিপরায়ণ। এই দেশেই সম্ভব হল আচার্য শঙ্করের আবির্ভাব। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের যতটুকু প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল, শঙ্করের অভ্যুত্থানে তা শেষ হয়ে গেল। মাভেলিক্কারা ও আল্লেপ্পিতে এখন কিছু নিদর্শন মাত্র আছে। কিছু বুদ্ধমূর্তি ও একটি মন্দির। তাতেও চীনা প্রভাব। জৈন প্রভাবের প্রমাণও কিছু আছে। কর্কলায় আছে গোমাতার মর্মরমূর্তি, তারই নিকটে জৈনস্তম্ভ, মুদ্‌বিদ্রিতে আছে জৈন বস্তি বা মন্দির।

এ তো গেল ইতিহাস আর ধর্মের কথা। মানুষের কথাও কিছু উপেক্ষার নয়। শিক্ষিত মানুষ ও আদিবাসীর কথা, তার আনন্দ-বেদনাব কথা, তার নৃত্যগীত শিল্প-সাহিত্যেব কথা।

আমাদের গাড়ি না বেগড়ালে থামবে না।

৪

স্বাতি বলল : কেরালার আরও অনেক কথা আছে।

আছে বইকি!

কিন্তু তোমাকে দেখে আর সে কথা মনে হচ্ছে না।

কেন?

তুমি ঝিমিয়ে পড়েছ। মনে হচ্ছে, তোমার ভাণ্ডার গেছে ফুরিয়ে।

আমি তো বিশ্বকোষ নই।

মামা হেসে বললেন : তা নও, কিন্তু তোমাকে পেলে নগেনবাবু আরও কয়েক খণ্ড বাড়াতে পারতেন।

আমি লজ্জা পেয়েছিলুম। লক্ষ্য করে স্বাতি বলল : লজ্জা কিসের?

সবজান্তা কথাটা আজকাল গুণের বিশেষণ নয়, লোকে তামাশা করে বলে। সংস্কৃত কবি একসময় বলেছিলেন, তাবচ্চ শোভতে মূর্খ, যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে। তখন মূর্খদের মুখ খোলার ভয় ছিল, এখন সমস্যা উল্টে গেছে। বলা চলে, তাবচ্চ শোভতে পণ্ডিত, যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে। পাণ্ডিত্য প্রকাশ হয়ে পড়লেই পাড়ার ছেলেমেয়েরা পেছনে লাগবে—সবজান্তা যাচ্ছে।

মামা অট্টহাস্য করে উঠলেন। গাড়ির ড্রাইভার চমকে উঠেছিল। তারপর ব্যাপারটা বুঝতে পেরে নিশ্চিন্ত হল।

বিরক্তভাবে মামী বললেন : তুমি একটা বিপদ ঘটাবে।

কেন?

আমরা যে ঘরে বসে নেই সে কথাটা ভুলে যাও।

কেন, গাড়ি কি খানায় নিয়ে ফেলবে!

অমন চমকে দিলে কেন ফেলবে না!

স্বাতি বলল : খানার মধ্যে কার রথ পড়েছিল গোপালদা ?

আমার মনে হল, স্বাতিকে আমি বুঝতে পেরেছি। মামা মামীর সামনে ঠিক এমন করে সে আগে আমাকে আক্রমণ করেনি। আমার উপর কখনও তার কোন আক্রোশ ছিল না। এই আক্রোশ দেখছি গত চতুর্দশীর রাত পোয়াবার পর থেকে। সামনে পড়লে পালিয়ে যাচ্ছে, আর আক্রমণ করছে মামা মামীর সামনে। এ যে তার আত্মগোপনের চেষ্টা তাতে আর আমার সন্দেহ রইল না। বললুম : খোঁড়ার রথ।

খোঁড়ার পা খানায় পড়ে, রথ কেন পড়বে !

খোঁড়া রথেই চড়ুক আর পায়েই হাঁটুক, পড়বে গিয়ে সেই খানার ভেতরেই।

কেন ?

আমাকে দেখছ না, বারেবারেই আমি খানায় পড়ছি।

বড় বেশি হেঁয়ালি করছ, ধাঁধার উত্তর দিতে আমি পারি নে।

পৃথিবীর কটা লোকের দুটো পা-ই গোটা আছে বল ! সোজা রাস্তায় কটা লোক গটগটিয়ে চলে !

মামা মনোযোগ দিয়ে পাইপ টানছিলেন, বললেন : তা বটে।

স্বাতি বলল : খোঁড়া পা নিয়ে কি নাচা যায় ? এদেশের সবাই তো শুনেছি নাচতে জানে।

কথাটা সত্য নয়। বললুম : খোঁড়ার চলাকেই নাচ মনে হয়।

স্বাতির শোক হঠাৎ উথলে উঠল : কথাকলি নাচ দেখাবে বলেছিলে, কই, দেখালে না তো !

সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই দেখা হত।

সুযোগ কি পাওয়া যায়, সুযোগ আদায় করতে হয়।

আমাদের দেশনেতাদের মতো জ্ঞানগর্ভ কথা হল। সত্যিই তো, সুযোগ আদায় করতে পাচ্ছি নে বলেই আমরা উপবাস করছি।

মামী বললেন : সেই মুখোসপরা নাচ তো ?

কথাকলির নামে মুখোসটাই আগে মনে পড়ে। হাঁটুর নিচ অবধি ঘাগরা পরা একদল মানুষ। তাদের বিচিত্র পোষাক। মুখে মুখোস, মাথায় নানারকমের নানা আকারের মুকুট। প্রথম নজরে তিব্বতী বলে ভ্রম হবে। তারপর চেনা যাবে কথাকলির দল বলে। বললুম ঃ ঠিক বলেছেন।

স্বাতি বলল ঃ এর কোন ইতিহাস নেই ?

সব কিছুরই ইতিহাস আছে। আজ যদি আকাশ থেকে কিছু পড়ে তো এই ঘটনাই তার ইতিহাস হয়ে রইল।

মামা বললেন ঃ ভাল্লাথোল নামে এদেশের এক কবি নাকি এই নাচের প্রবর্তন করেন।

বাধা দিয়ে বললুম ঃ এ নাচ অনেক পুরনো আমলের। কবি ভাল্লাথোল একে নতুন জীবন দিয়েছেন। তাঁর চেষ্টায় শুধু জনপ্রিয়তা নয়, প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

মামা আমার মুখের দিকে এমন করে তাকালেন যে মনে হল তিনি আরও কিছু শুনতে চাইছেন। বললুম ঃ প্রাচীনকালে এ দেশে রামনাট্যম কৃষ্ণনাট্যম প্রভৃতি নৃত্যনাট্যের খুব প্রচলন ছিল। এক সময় কালিকটের এক জামোরিণ কৃষ্ণের জীবন নিয়ে একটি নাটক লিখলেন। তার অভিনয় হল কৃষ্ণনাট্যম। দক্ষিণ কেরালায় কোট্টারক্কারার রাজা সেই অভিনয়ের প্রশংসা শুনে জামোরিণকে অনুরোধ করলেন তাঁর দলটিকে পাঠাবার জন্য। জামোরিণ বললেন যে উচ্চাঙ্গের শিল্পকলা দক্ষিণীদের জন্য নয়। অপমানিত রাজা বললেন, ঠিক আছে। তিনিও বিদ্বান ছিলেন, নাটক লিখলেন রামের জীবন নিয়ে। তার অভিনয় হল, নাম হল রামনাট্যম। এর সাফল্য দেখে অভিনেতা থেকে নাট্যকার পর্যন্ত সবাই মেতে গেলেন। ক্রমে ক্রমে রামায়ণ থেকে পুরাণ এল, নাম হল আট্টকথা বা কথাকলি।

ত্রিবেন্দ্রামের বাজারে একখানা ছোট গাইড বই পেয়েছিলুম।

লুকিয়ে কিনেছি, লুকিয়ে পড়েছি, তারপর লুকিয়ে রেখেছি ব্যাগের মধ্যে। এ দেশের সম্বন্ধে তাতে অনেক কথা আছে, অনেক গল্প, অনেক ইতিহাস, নাচ গানের কথাও আছে। কথাকলিতে নাকি মেয়েদের অংশ গ্রহণের অধিকার নেই, তাই বালকেরা মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় করে। আমার বেশ মনে পড়ছে, ছবিতে আমি মেয়ের মুখ দেখেছি। সে কি মেয়ে নয়!

তুমি নাচতে জান গোপালদা ?

কেন বল তো ?

তাহলে তোমাকে নাচের সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস কবতাম।

বেশ তো, করেই দেখ।

কথাকলির কায়দা সম্বন্ধে কিছু বল।

এ সম্বন্ধে আমার গাইড বইএ কিছু পড়েছি। তাই একটু তাচ্ছিল্যের সুরে বললুম ঃ এই কথা!

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম ঃ কথাকলি একজনের নাচ নয়, এ একটা দলের নাচ। একটা ভাবের প্রকাশ নয়, একটা গল্পের অভিনয়। বামায়ণ বা মহাভারতের একটা গল্পকে শুধু মুখের ভঙ্গি ও হাতের মুদ্রা দিয়ে ফুটিয়ে তোলা। কথা কেউ বলবে না।

আশ্চর্য!

আশ্চর্য বলেই এর শিক্ষার সময় এমন দীর্ঘ। বালক বয়সেই শিল্পীকে দলে যোগ দিতে হবে। প্রথমে শারীরিক ব্যায়ামের কৃচ্ছ্রসাধন। কসরত আর মালিশ করে শরীরটাকে মোলায়েম করতে হবে, তারপর মুখের কসরত, মানে ভাবপ্রকাশ। প্রেম প্রীতি লজ্জা ভয় ঘৃণা ঈর্ষা ক্রোধ বিস্ময়। সকলের শেষে মুদ্রা শিক্ষা। সবশুদ্ধ চৌষট্টি মুদ্রা।

একজন পাকা নর্তক চোখেরই কত ভঙ্গি করতে পারেন। মুখের ভাবের তো তুলনা নেই। একই সঙ্গে মুখের একদিক ক্রোধে উন্মত্ত,

অন্তর্নিক আনন্দে মশগুল। কথাকলির শিল্পী ছাড়া এমন অসাধ্যসাধন আর কেউ করতে পারবে না।

মামা বললেন ঃ তারপর ?

তারপর অভিনয়। আমাদের যাত্রাগানের মতো সন্ধ্যাবেলায় শুরু হয়ে শেষ রাত পর্যন্ত চলে। ভোরই হয়ে যায়। আট দশ ঘণ্টার কমে একটা পালা সম্পূর্ণ হয় না।

কথা নেই, বার্তা নেই, লোকের ধৈর্যচ্যুতি হয় না ?

আবহসঙ্গীত আছে। শিল্পীদের পিছনে একটা সুতোর কাপড়ের পর্দা, পিতলের প্রদীপ জ্বলছে। সামনে মূক অভিনয়, আর আড়ালে চমৎকার সুরের গান। গায়করা গল্প শোনাচ্ছেন গানে, আর নর্তকরা তা প্রকাশ করছেন ভাবে ও মুদ্রায়। মুখের ভাব আমরা বুঝি, মুদ্রা বুঝলে গল্প বোঝাও সুবিধে হয়।

স্বাতি বলল ঃ তারপর ?

কথাকলির কথা আর জানি নে।

আর কিছু বল।

ওট্টন তুল্লালের কথা বলতে পারি। ওট্টন মানে দৌড়নো আর তুল্লাল মানে লাফানো। প্রচুর ছুটোছুটি আর লাফালাফি ছিল বলেই বোধ হয় নাচের নাম এই হয়েছিল। এই নাচের গতি একটু দ্রুত। ড্রামের সঙ্গে তাড়াতাড়ি নাচতে হয়। দু পা সমানে চলবে, অঙ্গভঙ্গি অবিশ্রাম, তার সঙ্গে গান। গানের বিষয় হবে কোন পৌরাণিক প্রেম-কাহিনী। নর্তকের পরণে বিচিত্র ঘাগরা, মাথায় বিরাট শিরস্ত্রাণ।

স্বাতি বলল, এ নাচের ইতিহাস কী ?

বলব। কিন্তু ইতিহাসের কথা আর জিজ্ঞেস করবে না কথা দাও।

আরও নাচ আছে ?

আছে বইকি। চাক্কিয়ার কুথু, কুড়ি্যা আট্টম, পটাকম, মোহিনী আট্টম, কথাপ্রসঙ্গম—

থাম থাম।

হেসে বললুম ঃ ভেবেই দেখ।

মামা বললেন ঃ তুল্লালের গল্পটা বল।

কুঞ্চন নাম্বিয়ার মালাবাবের বিখ্যাত কবি। প্রথম যৌবনে তিনি চাক্কিয়াব কুথু নাচে ড্রাম বাজাতেন। একদিন ঘুমের ঘোবে তাঁর তাল কেটে গিয়েছিল। রাগে চাক্কিয়াব তাঁকে সকলের সামনে অপমান করেন। দুঃখে অভিমানে নাম্বিয়ার বেরিয়ে এলেন। তারপর সারারাত ধরে নতুন নাচ তৈরি করলেন। পরদিন সন্ধ্যা বেলায় একেবারে নতুন সাজে সেই মন্দিরের কাছে এসে নাচ গান শুরু করলেন। চাক্কিয়ারের কুথুর জন্য যারা এসেছিল, তারা সবাই ঘিরে দাঁড়াল নাম্বিয়ারকে। দেখতে দেখতেই তুল্লাল সব নাচকে ছাড়িয়ে গেল। তুল্লাল তিন রকমের। ওট্টন, পরায়ণ, সীথাঙ্কন। ওট্টন তুল্লাল আজও খুব জনপ্রিয়।

তাবপর ?

তারপর মোহিনী আট্টম। আট্টম মানে নৃত্য। ভরতনাট্যমে যেমন বিশুদ্ধ কর্ণাটিক সঙ্গীতেব সঙ্গে একজন মেয়ে নাচতে পারে, মোহিনী আটমও তেমনি। এ একটি মেয়েব মোহিনী নাচ।

অনেকটা যে যৌন আবেদন আছে, সে কথা মুখে আটকে গেল।

স্বাতি বলল ঃ থামলে কেন ?

নাচেব কথা আর কতক্ষণ বলব ! মামাবাবু বিবক্ত হচ্ছেন।

মামা বললেন ঃ বেশ তো লাগছে।

স্বাতি বলল ঃ মাও মনোযোগ দিয়ে শুনছেন।

আর্যদের সংস্পর্শে এসে তিন রকম নাচের প্রচলন হয়। চাক্কিয়াব কুথু, কুড়িয়াট্টম ও পটাকম। কুথু বোধ হয় সবচেয়ে পুবনো। দ্বিতীয় শতাব্দীর বইএ এই কুথুর উল্লেখ পাওয়া গেছে। চাক্কিয়ার একটা জাত, শুধু এই জাতের লোকেরাই কুথু নাচের অধিকারী বলে এব নাম হয়েছে চাক্কিযার কুথু। খাঁটি সংস্কৃতে লেখা পুরাণের গল্প,

মন্দিরেব ভিতর অভিনয় হত। ছোট জাতের লোকদের দেখবারও অধিকার ছিল না।

কুড়ি্যে আট্টম হল কুথুর নৃত্যনাট্যরূপ। একজনের বদলে একটা দল নাচবে। আর সংস্কৃত শ্লোকগুলো মালয়ালাম ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

পটাকম আর কুথুতে তফাত খুবই কম। শুধু সংস্কৃতের বদলে মালয়ালাম গান আর কিছু বেশি স্বাধীনতা।

কথাপ্রসঙ্গমের অন্য নাম হরিকথা। পটাকম থেকেই জন্ম। এক অঙ্কের নাটক। গানেব ভিতর দিয়ে গল্প বলা হচ্ছে। এর জনপ্রিয়তা আজও সমান আছে।

মামীর চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হল তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। পিছন ফিবে কথা বলতে আমাবও কষ্ট হচ্ছিল। তবু স্বাতি বলল: ফুবিয়ে গেল?

বললুম: কেরালাব নাচের নাম ফুববে না। এতক্ষণ তো আর্য নাচেব কথা শোনালুম, দ্রাবিড নাচেব কথা সবই বাকি। মুটি্যয়েট্টু, থিরায়াট্টম, টিয়্যাট্টম—

থাম থাম।

হেসে বললুম: এবাবে সত্যিই থামতে দাও। বড ক্লান্ত বোধ কবছি।

কোচিন আব বেশি দূব নয়।

৫

সন্ধ্যাবেলায় এর্নাকুলম-কোচিনকে একটা পরীর রাজ্য বলে মনে হয়েছিল। এর্নাকুলম ছিল কোচিন রাজ্যের রাজধানী, আর কোচিন বন্দর। মাঝখানে পুল। রাতে এই পুলের উপরে বাতি জ্বলে, বাতি দুদিকের শহরে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে কোচিন বড় ধনী। সুন্দর দ্বীপ, সুন্দর সমুদ্র, তাল-নারিকেলবেষ্টিত হ্রদ আর বড় বড় জাহাজের আশ্রয় হারবার।

দিনের বেলায় ইহুদিদের সিনাগগ দেখা চলে। সেখানে নাকি ওল্ড টেস্টামেন্টের বড় রোল আছে। সমুদ্রের ধারে গির্জা আছে সেণ্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারের। এ সব দেখার অধিকার আমাদের নেই। ভিতরে যেতে মামী রাজী হবেন না। তাই বাহির থেকেই দেখতে হয়। আর একটি প্রাসাদ আছে পর্তুগীজের তৈরি। একবার নাকি এক পর্তুগীজ অফিসার কোন হিন্দুমন্দির লুণ্ঠন করেছিল। এই প্রাসাদ নির্মাণ করে তারা তার প্রায়শ্চিত্ত করে। ভিতরের ম্যুরাল চিত্রকলা দেখবার মতো।

ব্যাঙ্গালোরের গাড়ি ছাড়ে দুপুর সোয়া বারোটায়। শোরানুর প্যাসেঞ্জার। সেখানে গাড়ি বদল। মামা মামী ও স্বাতিকে একটা খালি গাড়িতে তুলে দিয়ে আমি তৃতীয় শ্রেণীতেই উঠলুম। আমার বাজার দর ভাল করেই জানা আছে, তাইতেই খুব শক্তভাবে মামার অনুরোধ ঠেলতে পারি। মামা বলেছিলেন: এতদিন একসঙ্গে থেকেও কি আমার কোন দাবি হল না গোপাল?

ছি ছি, এমন কথা বলবেন না।

আর কী বলব বল!

আমি যে নিজের প্রয়োজনে যাচ্ছি।

প্রয়োজন কি ফুরোবে না ?

নিশ্চয়ই ফুবোবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মামা বললেন ঃ দেখি।

আর কেউ দীর্ঘশ্বাস ফেলল কি না জানি না, কিন্তু আমার দুঃখ হল না। মনে হল, আমি ঠিক করেছি। গদিআঁটা গাড়িতে চাপার অধিকার আমার নেই। কোনদিন হবে না। দুরকম গাড়ি এদেশে চিবকাল থাকবে। কাঠেব বেঞ্চি আর গদির বিছানা। দেশের প্রায় সমস্ত লোক যাবে জানোয়ারের মতো গাদাগাদি বন্দী হয়ে, আব গুটিকয়েক ভাগ্যবান যাবে গদির বিছানায় গড়াগড়ি দিয়ে। আমি যে ভাগ্যবান নই, পরের ভাগ্যে আমি কেন জাত খোয়াব !

নিজের গাড়িতে ওঠবাব সময় আমি পিছন ফিরে তাকালুম। যা আশা করেছি তাই দেখলুম। দবজার হাতল ধরে দাঁড়িয়ে স্বাতি আমাকে দেখছে।

বেশ হাত পা ছড়িয়ে বসবাব জায়গা পেয়েছিলুম। কিন্তু ঠিক ট্রেন ছাড়বার সময়টিতেই গুটিয়ে বসতে হল। এক তরুণ ভদ্রলোক কাঁধে একটা ঝোলা আর বগলে একটা ছোট বিছানা নিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ল। আমি বসে ছিলুম দরজার দিকে মুখ করে। তাই আমাকেই আক্রমণ করল। এ রণে ভঙ্গ দেওয়াই ভদ্রতা। কিছু বলবার আগেই আমি তাকে বসবার ব্যবস্থা করে দিলুম।

যখন পরিচয় হল, তখন আপশোসের চেয়ে আনন্দ হল বেশি। ভদ্রলোক সোস্যাল সায়েন্সে এম. এ. পড়ছে। নাম নাম্বুদ্রি। এখন তাকে কলেজের ক্লাস করতে হয় না, কেরালার আদিবাসীর উপর একটা থিসিস দাখিলের জন্য নানা স্থানে গবেষণা কবে বেড়াচ্ছে।

নীলগিরির আদিবাসীদের কথা আমি কিছু পড়েছি। কাঞ্জীভরমের পথে একদল টোডা যাত্রীকে দেখবাবও সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু কেবালাব কোন আদিবাসীর নাম আমি শুনি নি। উত্তরভারতের

অনেকেই হয়তো শোনেন নি। ভাবলুম, এ ভারি ভাল হল। এই শিক্ষার্থী ভদ্রলোকের কাছেই অনেক শিক্ষা পাওয়া যাবে।

তাঁকে সুস্থ ও সহজ হতে দেখে বললুম : আপনার গবেষণা বুঝি সম্পূর্ণ হয়ে গেল !

প্রায়।

টোডাদের মতো কোন ইন্টারেস্টিং জাতি পেলেন ?

একটা !

তবে ?

এক গণ্ডা।

বলেন কি ?

ঠিকই বলছি। এই কদিনে আমি চারটি জাতের পরিচয় পেয়েছি। পাণ্ডরম, উরলি, উল্লটন, আব মুদ্রণ। অ্যান্থ্রপলজি কি আপনার ভাল লাগে ?

নিশ্চয়ই লাগে।

উৎফুল্ল হয়ে নাম্বুদ্রি নিজের ঝোলার ভিতর হাত দিল। বলল : দেখুন তো আমার ডাটা কেমন সংগ্রহ হয়েছে।

সর্বনাশ ! আমি যে এ সবের কিছুই জানি নে।

জানেন না !

নাম্বুদ্রি নিরাশ হচ্ছিল, তখুনি সামলে নিয়ে বলল : তাতে কী আসে যায় ! শুনলেই আপনি বুঝতে পারবেন।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল : আমাদের সমাজব্যবস্থার কথা আপনি জানেন তো ?

অকপটে স্বীকার করলুম : জানি নে।

তাহলে : ভদ্রলোক ভাবল এক মুহূর্ত, তারপর বলল : নায়ার আর নাম্বুদ্রি, এদের সম্বন্ধে আপনার কিছু জানা দরকার।

এ কথাও আমি মেনে নিলুম।

নাম্বুদ্রি বলল : প্রথমে নায়ারদের কথা বলি। এ অঞ্চলের

এরাই সবচেয়ে প্রাচীন অধিবাসী। আর্যরা এদেশে আসবার আগে এদের প্রতিপত্তির অন্ত ছিল না। ভাল যোদ্ধা ছিল এরা। থাকত যৌথ পরিবার প্রথায়। সেও মাতৃমুখী সমাজ। আমরা বলি মরুমক্কাথায়াম সমাজ। যৌথ গৃহের নাম তারাওয়াড। সকলের উপাজন একত্র জমা হয়ে সংসার নির্বাহ হবে। কিন্তু দিনে দিনে এই প্রথার প্রতি শ্রদ্ধা কমে আসছে। সম্পত্তি ভাগ হয়ে যাচ্ছে। মাতৃমুখী সমাজের প্রতিও বিরাগ গভীরতর হচ্ছে। শুধু নায়ার কেন, এই প্রথা ক্ষত্রিয় মুসলমান ও অন্যান্য সমাজেও প্রচলন আছে। বড় বড় যৌথ পরিবার। তার পরিচালনার ভার থাকবে করনভনের উপর। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষের নাম করনভন। গত চার-পাঁচশো বছর ধরে চেষ্টা হচ্ছে যৌথ পরিবার ভেঙে দিয়ে পিতৃমুখী সমাজ প্রচলনের। আমরা বলি মক্কাথায়াম। মনে হচ্ছে, এই ধারা সম্পূর্ণ পাল্টে যেতে আর বেশি সময় লাগবে না।

নাম্বুদ্রি বলল: আপনি বোধ হয় তারাওয়াড গৃহ দেখেন নি। এগুলির স্থাপত্যরীতি বড় অদ্ভুত। মোটা ভারি দরজা আর চৌকাঠের উপর বিচিত্র কারুকার্য আর পিতলের সরঞ্জাম।

আমাদের নিজেদেরও গোলমাল আছে। আমরা নাম্বুদ্রিরা খাঁটি আর্য সন্তান। আমাদের জ্ঞানের ও বিদ্যার যেমন নাম, তেমনি নাম সরল শান্ত জীবনযাত্রার। উপার্জন ত্রিবিধ উপায়ে—জমি থেকে, মন্দির থেকে বা পৌরোহিত্যে।

নায়ারদের মতো আমাদেরও গৃহের একটা নাম আছে, ইল্লম। যৌথ পরিবার প্রথাও আছে। আর আছে মেয়েদের পর্দা। শুনে হয়তো আশ্চর্য হবেন, আমাদের ঘরের মেয়েরা সোনার গহনা ভালবাসে না। অন্য জাতের মেয়েরা একথা বিশ্বাস করতেই পারে না। গোলমালের যে কথা বলছিলাম সে একটা প্রথা। একমাত্র বাড়ির বড় ছেলেরই নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ পরিবারে বিবাহের অধিকার আছে। কিন্তু বউ ঘরে আসবে না। মাঝে মাঝে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে

বউয়ের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে আসতে হবে। একে সম্বন্ধন বিবাহ বলে। অন্য ছেলেরা বিবাহ করবে ক্ষত্রিয় কিংবা নায়ার পরিবারে। কাজেই এই অসবর্ণ বিবাহে যে সন্তান সন্ততি হবে তাদের কোন অধিকার থাকবে না ইল্লম সম্পত্তিতে। ভাল কথা। কিন্তু তার ফল হল বিষময়। নাম্বুদ্রি মেয়েরা সব কুমারী রয়ে গেল। কাজেই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। সমাজ প্রথায় ভাঙন ধরেছে। আর আমরাও আধুনিক হয়েছি দেশের আর দশজনের মতো।

আর একটি জাতির কথা বলা উচিত। তার নাম হল ইঝভ। বিশেষত্ব কিছুই নেই। ধর্ম হিন্দু। চাষবাস আর নারিকেল নিয়েই আছে। এ দেশের বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক শ্রীনারায়ণ গুরু স্বামী এই কুলেই জন্ম নিয়েছিলেন বলে এদের নাম করছি। শ্রীনারায়ণ গুরুর কথা আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন ?

শুনি নি হল সত্য কথা। কিন্তু তাতে নিজের অজ্ঞতা বড় বেশি প্রকাশ হয়ে পড়ে। তা ছাড়া এইরকম উত্তরে নাম্বুদ্রি বোধ হয় আঘাত পাবে। একটু ঘুরিয়ে জবাব দিলুম: কিছু বলুন না তাঁর সম্বন্ধে।

তিনি শুধু সমাজ-সংস্কারক নন, ধর্মগুরুও ছিলেন। তাঁর বিশ্বাসের কথা বড় সহজ আর সুন্দর। বলতেন, 'এক জাতি, এক ধর্ম, এক ভগবান।' বলতেন, মানুষের ধর্ম যাই হোক না কেন, তার প্রগতি অব্যাহত থাকবে। শ্রীনারায়ণ গুরুকে বুঝতে হলে তাঁর সমকালীন সমাজের গোঁড়ামি কিছু জানতে হবে। আপনাদের বিবেকানন্দ সব দেখেশুনে এক কথায় বলে গিয়েছিলেন, 'ভারতের পাগলা গারদ'। সত্যিই কতকটা তাই। সমাজ তখন দুটো ভাগে ভাগ হয়ে আছে—সবর্ণ আর অবর্ণ। মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে সরকারী কর্মক্ষেত্র পর্যন্ত সবর্ণ হিন্দুদের একচ্ছত্র প্রাধান্য। নিম্নবর্ণ হিন্দুদের সেখানে প্রবেশের অধিকার নেই, পূজার অধিকার নেই, মন্দির-দ্বার তাদের জন্য রুদ্ধ। শুনে আশ্চর্য হবেন, মন্দির-সংলগ্ন রাজপথেও তাদের

গতিবিধি একেবারে নিষিদ্ধ। স্কুল কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে অবর্ণরা সবর্ণদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারবে না। এবং যথেষ্ট লেখা পড়া শিখেও সরকারী চাকরি পায় নি এমন উদাহরণ যথেষ্ট আছে। শ্রীনারায়ণ গুরুর আবির্ভাব হল সমাজের চরম দুর্দিনে, তাঁর আন্দোলন সফল হল। জাতিভেদ প্রথার মেরুদণ্ড গেল ভেঙে। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা দিলেন টেম্প্‌ল এন্ট্রি প্রোক্লামেশন। দেখতে দেখতে আইন পাস হয়ে এই অন্যায় বন্ধ হল।

শ্রীনারায়ণ গুরু এ যুগের মানুষ। ১৯২৮ সনে বরকলার শিবগিরি মঠে তিনি দেহরক্ষা করেন। তাঁর শিষ্যরা শ্রীনারায়ণ ধর্ম সংঘম নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে গুরুর সমাজধর্ম প্রচার করে যাচ্ছেন।

আর একটা অদ্ভুত ভাব এল মনে। আমরা কত অজ্ঞ। অথচ নিজেদের কত বিজ্ঞ ভাবি। অনেক কিছু জানার গর্ব আমাদের আর নেই। কিন্তু আমরা কতটুকু জানি! এই যে এদেশের একজন মহাপুরুষ, এঁর নাম তো আমি জানতুম না। কজনে জানে তাও জানি নে। এ সব না জেনেও যখন দিন চলে যায় তখন জানার প্রয়োজন কি সব ফুরিয়ে গেল!

কী ভাবছেন?

নাম্বুদ্রির প্রশ্নে আমার ধ্যান ভাঙল। তাড়াতাড়ি বললুম: কিছু ভাবছি কি!

ভাবছিলেন বইকি!

আমি তাকে সত্যি কথা বললুম। সব শুনে নাম্বুদ্রি বলল: এ আপনার দোষ নয়। তাঁর খ্যাতি হয়তো নিজের দেশেই সীমাবদ্ধ আছে।

হয়তো তাই। বড় বড় মহাপুরুষদের খ্যাতিও তাঁদের জীবদ্দশায় এমনি সীমাবদ্ধ থাকে। মৃত্যুর পরে তার প্রসার। শিষ্য-প্রশিষ্যরা যখন দিকে দিকে তাঁদের গুরুর বাণী প্রচার করে বেড়ান, তখন সেই

বাণী জগতের কানে গিয়ে পৌঁছয়। প্রতিষ্ঠা হয় প্রচারের দ্বারা। আজকের জগৎ তাই প্রচার-পাগল।

নাম্বুদ্রি বলল ঃ এদেশের অধিবাসীদের সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলব বলেছিলাম। এদেশের পাহাড়ে ও দুর্ভেদ্য বনে কত যে জাত অজ্ঞাত আছে তার হিসেব নেই। তাদেব কথা আমি কিছুই বলতে পারব না। আমি কুমিলির চারধারে একটা পাহাড়ে জাত দেখেছি। তাদের নাম পণ্ডরম। ছোটখাট শক্ত চেহারার লোক। থাকে গুহায় কিংবা গাছের কোটরে। প্রকৃতিতে যাযাবর বলে চাষবাস করে না। বনের ফলমূল মধু খেয়েই চালিয়ে দেয়। ভাল শিকারী তারা, তীরের লক্ষ্য একেবারে অব্যর্থ। এদেরই একজনকে আমি গ্রামে আসতে দেখেছিলাম। মধু মোম বিক্রি করতে এসেছিল। বললাম, তোমাদের গ্রাম দেখাতে পার ?

আপনার ভয় করল না ?

ভয় করলে চলে না। তাছাড়া, এরা নৃশংস নয় বলেই জানতাম। লোকটা কি ভাবল সেই জানে। আমায় সঙ্গে নিয়ে গেল। দেখলাম, গুহা নয় গাছের কোটরও নয়, থাকে একরকম ছোট ছোট ঘরে। কাঠ আর লতা-পাতা দিয়ে তৈরি। এক রকমের কাপড়ও পরে। বলল, বিয়ে দেখবে ? আজ আমাদের একটা বিয়ে আছে। আমি তো লাফিয়ে উঠলাম।

সেই বিবাহ দেখতে গিয়ে দেখলাম যে সকলে কাপড় পরে না। গাছের বাকলেও অনেকে লজ্জা নিবারণ করে। ওদের ভাষা আমি বুঝি নে। সেই লোকটাই আমাকে বুঝিয়ে দিল যে মেয়ের বাবা ছলছল চোখে বলছে, আমার মেয়েকে তোমার হাতে দিচ্ছি, ভাল করে তাকে দেখো।

তারপর চার গোলা ভাত রাখা হল বরকনের সামনে। কনে দু গোলা ভাত তুলে বরের হাতে দিল। বর তা খেয়ে বাকি দু গোলা দিল কনেকে। বিয়ে হয়ে গেল।

পুরুত নেই, মন্তর নেই?

কিচ্ছু না।

নাম্বুদ্রি বলল: কার্ডেমম পাহাড়ে উরলি জাত দেখেছি। তারা অনেক সভ্য হয়ে এসেছে। সমতলেও তাদের দেখা যায়, ধান নিয়ে কাপড় কিনতে আসে। কিন্তু হাতে একখানা ছুরি থাকবেই। তাতে সব কাজই সম্ভব। তাদের বস্তিতে আমি যাই নি। শুনেছি, বাঁশ আর বুনো ঘাস দিয়ে তারা ঘর তৈরি করে। চাষবাস করে। কিন্তু ভাত খায় বছরের ছ মাস, বাকি ছ মাস নাকি শাকপাতা আর ফল-মূল খেয়ে থাকে। এ একটা পুরনো প্রথা। তুকতাক ভেলকি জাদুতে এদের অসীম বিশ্বাস। অসুখ হলে ওষুধের বদলে এরা তুকতাকই করে। তারপর মরলে কবর দেয়। সেই কবরের ওপর দলের প্রত্যেককে একখণ্ড কাপড় দিতে হবে।

আর এক জাতের নাম উল্লটন। আমি এদের কুমীর শিকার করতে দেখেছি। কী অদ্ভুত দক্ষতা! বঁড়শি ফেলে কুমীর ধরে। মাছ গাঁথতে আর তীর ছুঁড়তে এদের জুড়ি নেই। এদের বিবাহটাও বড় অদ্ভুত। কারও কোন হাত নেই। যে মেয়ের বিয়ে, সে বসবে একটা তালপাতার কুঁড়ের ভিতর। যারা পাণিপ্রার্থী তারা সেই কুঁড়ের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে নাচবে, আর হাতের বাঁশের লাঠি ঢোকাবে কুঁড়ের ভিতর। এমনি নাচ অনেকক্ষণ ধরে চলবে। তারপর কনে একটা লাঠি হাত দিয়ে ধরলেই নাচ শেষ। যার লাঠি ধরল, তাকেই সে বিয়ে করবে।

ভারি মজার তো!

মুদ্রণদের বিবাহের স্বাধীনতা এর চেয়েও বেশি।

নাম্বুদ্রির কথায় আমি আরও কৌতূহলী হলুম।

ওরা পৃথিবীর যে কোন সভ্যদেশকে হারিয়ে দিয়েছে। ছেলেমেয়ের বাপ-মায়ে কোন বিবাহ ঠিক করলে দুজনকেই ছেড়ে দেওয়া হয়। তারা কোন গুহায় গিয়ে কিছুদিন একাকী বাস করবে। পৃথিবী

থেকে বিচ্ছিন্ন একেবারে নিজেদের জগৎ। কয়েক সপ্তাহ পরে বেরিয়ে এসে মতামত জানাবে। বিয়ে করতে যদি রাজী না হয়, কেউ কিছু বলবে না। নতুন করে আবার সব ব্যবস্থা হবে।

আমি বিস্মিত হলুম অপরিমিত। পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ যে এমন সহজ হতে পারে, আগে জানা ছিল না। লেখাপড়া শিখে আমরা সভ্য হয়েছি। তাই আমাদের এত শঙ্কা, এত সঙ্কোচ। মেয়েরা পুরুষকে ভয় পায়, আর পুরুষের ভয় পরিণামের। আদিম প্রকৃতির কথা প্রতিক্ষণ আমাদের মনে থাকে। থাকে বলেই এত ভয়, এত ভাবনা।

আজকের পৃথিবী দিনের আলোয় সভ্যতার ভান করে। অন্ধকারে তার আত্মপ্রকাশ। নেপথ্যে মানুষের আদিম প্রবৃত্তি দিনে দিনে যেন বেশি বন্য হচ্ছে।

এক রকমের অদ্ভুত আক্রোশে আমি অস্থির হয়ে উঠলুম।

৬

শোরান্নুরে গাড়ি বদল নিয়ে মামার দুশ্চিন্তা ছিল। ম্যাঙ্গালোর থেকে মাদ্রাজ মেল আসবে বিকেল পাঁচটায়। আমাদের ট্রেন কয়েক মিনিট আগে পৌঁছবার কথা। দেরি হলে সর্বনাশ। না হলেও দুর্ভাবনার কারণ আছে। একখানি কোচ ম্যাঙ্গালোর থেকে ব্যাঙ্গালোর যায়। তাতে তিনটি শ্রেণী। জায়গা যে পাওয়া যাবেই তার কোন স্থিরতা নেই। না পেলেই বিপদ। শেষরাতে জলারপেটে আবার গাড়ি বদল করতে হবে। রাগতভাবে মামা বলেছিলেন : তোমার বুদ্ধি শুনেই এই বিপদে পড়লুম।

ভয় পাচ্ছেন কেন, 'তার' তো করে দেওয়া হয়েছে। জায়গা পাওয়া যাবে বলে আশ্বাসও দিয়েছে।

সে সবই তো অনুমানের কথা।

অনুমান হলেও মিথ্যে আশ্বাস দিত না।

বিরক্তভাবে মামা বললেন : এই তোমাদের দোষ। খাবাপ দিকটা কিছুতেই দেখতে পাও না।

দোষ আমার আছে। আমি শুনেছিলুম, কোচিন থেকেও ব্যাঙ্গালোরেব জন্য থ্রু গাড়ি আছে। ব্যাঙ্গালোর থেকে নাকি এমন একখানা ট্রেন ছাড়ে যার চারটে ভাগ। এক ভাগ ত্রিচি যাবে, এক ভাগ নীলগিরি, এক ভাগ ম্যাঙ্গালোর আর চতুর্থ ভাগ কোচিন। মাদ্রাজ থেকে যে কোচিন এক্সপ্রেস ছাড়ে, জলারপেটে তার সঙ্গে গোটা ট্রেনখানা জুড়ে দেওয়া হয়। দুখানা ইঞ্জিন লাগে। তার পর ইরোডে কাটে ত্রিচির গাড়ি, কোইম্বাতুরে নীলগিরির। এই শোরান্নুর থেকে ম্যাঙ্গালোর আর কোচিনের গাড়ি আলাদা হয়। শোরান্নুর চৌরাস্তা। চতুর্থ রাস্তা গেছে অঙ্গদিপুরমের দিকে। কোচিন স্টেশনে

এসে আমরা হতাশ হলুম। শুনলুম, আমাদের খবর ঠিক নয়। ভবিষ্যতে এই রকমের ট্রেন নিশ্চয়ই চলবে।

ব্যাঙ্গালোরে 'তার' করে দিয়েও রেলের কর্মচারীটি আমাদের উপদেশ দিলেন: শোরান্নুরে জায়গা না পেলেও ঘাবড়াবেন না। নীলগিরি থেকে যে কোচ যায়, কোইম্বাতুরে তাতে চাপবার চেষ্টা করবেন। মহিসুরের দশেরা তো শেষ হয়ে গেছে, এখন আর ব্যাঙ্গালোরের গাড়িতে ভিড় হবে না।

মামাকে এই আশ্বাসের কথাও শুনিয়েছিলুম। বলেছিলুম: আপনি কিছু ভাববেন না, শোরান্নুরে আমি সব ব্যবস্থা করব।

সেই শোরান্নুর পৌঁছতে আরও কিছু দেরি আছে। প্যাসেঞ্জার ট্রেন, বড় ঢিমে চালে চলে। ভাবলুম, নাম্বুদ্রিকে এবারে কী জিজ্ঞাসা করি। মালয়ালাম সাহিত্যের গল্প শুনেছি পিল্লাইয়ের কাছে। ত্রিবেন্দ্রামের পথে ভদ্রলোক অনেক কিছু শুনিয়েছেন। একটি কথা শুধু জেনে নেওয়া হয় নি। এ দেশের ভাষার কথা। সংস্কৃতের ব্যবহার দেখে সন্দেহ হয়, এ ভাষার উৎপত্তি হয়তো সংস্কৃত থেকেও হতে পারে। নাম্বুদ্রিকে আমার সন্দেহের কথা বললুম।

নাম্বুদ্রি বলল: সাহিত্য আমার বিষয় নয়, তবে পরীক্ষা পাসের জন্য কিছু পড়তে হয়েছে।

তার চেয়েও কম জানলে আমার চলবে। আমি পরীক্ষা দেব না।

নাম্বুদ্রি বলল: তবে নির্ভয়ে বলতে পারি। উল্লুর পরমেশ্বর আইয়ার নাকি এই মত প্রচার করেছেন যে বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে ছিল এক ভাষা। তিনি সেই দ্রাবিড় ভাষাকে বলেন পঝমতামিল। এর থেকেই দক্ষিণের চারটি প্রধান ভাষার জন্ম—তামিল তেলগু কান্নাডিগ এবং মালয়ালাম। তেলগু ও কান্নাডা গোড়াতেই আলাদা হয়ে যায়। চোল চের পাণ্ড্য রাজ্যে তখনও এক ভাষা ছিল। সঙ্গম সাহিত্যে চের রাজ্যের প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীন কালের চের রাজাই তো বর্তমানের কেরালা।

বললুম ঃ আমার প্রশ্ন একটু অন্যরকম ছিল। মালয়ালাম ভাষার জন্মের ইতিহাসে সংস্কৃতের নামগন্ধ নেই। অথচ এখন শুনতে পাই যে এ ভাষায় সংস্কৃত শব্দের ছড়াছড়ি। কী করে এমন হল ?

বুঝেছি, আপনি মণিপ্রবালের কথা জানতে চাইছেন। এর জন্য আমরা নাম্বুদ্রিরাই দায়ী। পুরাকালে আমাদের পরিবারে সংস্কৃত ভাষার খুবই প্রচলন ছিল। প্রতিদিনের কথার ভিতর যত মালয়ালাম কথা তার চেয়ে বেশি সংস্কৃত শব্দ। দিনে দিনে এই মিশ্র ভাষা এমনই জনপ্রিয় হয়ে উঠল যে নাম্বুদ্রিরা ভাবলেন যে এই ভাষাই সাহিত্যের ভাষা হবার উপযোগী। এঁরা নিজেরা ভাল মালয়ালাম জানেন না, আর জনসাধারণ জানে না সংস্কৃত। তাই সেদিনের কেরালায় এই মিশ্র ভাষাই চালু হয়ে গেল।

ইতিহাসে এই আন্দোলনকে মণিপ্রবাল স্কুল বলে। কবিরা সংস্কৃতকে অনুসরণ করলেন অন্ধভাবে। সংস্কৃত ছন্দ ভাব রীতিনীতি সবই এসে গেল। কিন্তু দেশের নিজের জিনিস তো যেতে পারে না। পত্তু নামে যে প্রাচীন গান সর্বজনপ্রিয় ছিল, কালক্রমে সেই পত্তুর সঙ্গে মণিপ্রবালেব মিলন হল। এ একদিনে হয় নি, চার শো বছর ধরে ধীরে ধীরে হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমরা নতুন ভাষা পেয়েছি।

আমি আরও কিছু শোনবার জন্য তাব মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলুম। নাম্বুদ্রি বলল ঃ সেই যুগে নাকি কয়েকজন ধুরন্ধর কবি ছিলেন, যাঁদের চেষ্টায় নতুন মালয়ালাম ভাষার ও সাহিত্যের জন্ম হল। কিন্তু তাঁদের নাম আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। ইতিহাসে খুব ফলাও করে বলেছে, আর আমি ভুলেছি নির্বিকারে।

বলে হাসতে লাগল।

আমি কিছু বলবার আগেই বলল ঃ আমাকে খুব বোকা ভাবছেন তো ?

কেন ?

নিজের দেশের সাহিত্য সম্বন্ধে কিছুই জানি নে।

অনেকেই তো জানে না, কিন্তু সবাই কি বোকা!

সত্যি বলছি, বই আমার ভাল লাগে না। আমি ভালবাসি মানুষ। নতুন নতুন মানুষ নিয়ে আমি আমার জীবন কাটিয়ে দিতে পারি।

আর পুরনো মানুষ নিয়ে?

নাম্বুদ্রি বোধ হয় এ রকম প্রশ্নের আশা করে নি, তাই সহসা উত্তর দিতে পারল না।

হেসে বললুম: পুরনো মানুষ নিয়েও জীবন কাটাতে হয়। তাব অভ্যাস রাখা দরকার।

নাম্বুদ্রি আমাব রসিকতা যে বুঝতে পেরেছে তার প্রমাণ পেলুম তার কানের দিকে চেয়ে। কান দুটো একটু লাল হয়েছে। কোন উত্তর দিল না।

নাম্বুদ্রি ত্রিচুরে নেমে গেল। বলল: তার বাড়ি ত্রিচুরে। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসে তাকে আমি ধন্যবাদ জানালুম। উত্তরে সে একটু হেসে গেল।

আমি লক্ষ্য করে দেখলুম, নাম্বুদ্রি শুধু তার বেশভূষাতেই সাদাসিধে নয়, ব্যবহারেও সরল। জীবনযাত্রা নিশ্চয়ই এদের অনাড়ম্বর। লেখাপড়া শিখেও এ যুগের মানুষ কী করে সরল ও নিরভিমান থাকে, সেই ভেবে বিস্ময় জাগে।

আমি আমার ঝোলার ভিতর থেকে গাইড বইখানা বার করলুম। পাতা উল্টে উল্টে আবার সব দেখলুম। একটা নাচেব ছবি চোখে পড়ল। কৈকট্টিকলি। এ সম্বন্ধে স্বাতিকে কিছু বলা হয় নি। এব কোন বিবরণ লেখা নেই বলেই বোধহয় এর নাম ভুলে গিয়েছিলুম.

আর একটি ছবি দেখলুম, বল্লম কালি। ইংরেজীতে লেখা বোট রেস। অন্যত্র নাম দেখেছি স্নেক-বোট রেস। বর্ষার পর খালে যখন জল থৈ থৈ করে, তখন এই খেলা। সরু সরু লম্বা নৌকো

জলে নামবে। অসংখ্য লোক চড়বে এক একটা নৌকোয়। আর গান গেয়ে গেয়ে দাঁড় টানবে। সে কী উল্লাস! সে কী প্রতিযোগিতা! ছবি দেখেই আমি সেই দৃশ্য কল্পনা করলুম।

আরও অনেক ছবি দেখলুম। দেশকে সুজলা সুফলা করবার জন্য হাইডেল বাঁধ-পরিকল্পনা। নারকেলের ছোবড়া দিয়ে দড়ি ও কার্পেট বোনার দৃশ্য, হাতির দাঁতের মূর্তি। সোনারূপোর কিংখাব তৈরি হচ্ছে, লেস আর অরনমুলা গ্রামের কন্নডি। কাচের নয়, ধাতুর তৈরি আয়না।

বিকেল পাঁচটায় আমরা শোবানুর পৌঁছলুম। আমি চায়ের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছিলুম। মামা বললেন ঃ চা এখন থাক গোপাল, নতুন গাড়িতে উঠেই চা খাওয়া যাবে।

মামী হাসলেন। আমি জানি মামার দুর্ভাবনা দেখেই মামী হাসলেন।

বললুম ঃ তাই হবে। প্রয়োজনটা শুধু জানিয়ে আসি।

ট্রেন যখন এল, তখন মামার আনন্দ আর ধরে না। একটি গোটা কম্পার্টমেণ্ট খালি এসেছে। কারও সাহায্যের অপেক্ষা না করেই আমরা দখল করে ফেললুম।

দরজায় দাঁড়িয়ে মামা বললেন ঃ তোমার চা কোথায় গোপাল?

আমি সব জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখছিলুম, বললুম ঃ দেখছি।

কিন্তু গাড়ি থেকে নামতে পারলুম না। মামা তাঁর বিপুল বপু নিয়ে ছোট দরজাখানা সম্পূর্ণ আগলে রেখেছেন। ওখান থেকে তিনি সরে না এলে পাশ দিয়ে গলে নামবার কোন আশা নেই! মামার মুখ দেখে মনে হল, তিনি পরম কৌতুক বোধ করছেন। প্রথমটা আমি কিছু বুঝতে পারি নি, বুঝলুম গাড়ি ছাড়বার সময়। দরজা আগলে আমায় তিনি নামতে দিলেন না। ইতিমধ্যে নিজের হাতে চায়ের সরঞ্জাম নিয়েছেন বেয়ারার কাছ থেকে। আর রেলের

এক কর্মচারীকে ডেকে আমার তৃতীয় শ্রেণীর টিকিটটা বদলে নেবার ব্যবস্থাও করেছেন। গাড়ি ছাড়বার পর মামা এসে গদিতে বসলেন। মুখ তাঁর প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত।

স্বাতি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল : গোপালদাকে কেন নামতে দিলে না বাবা ?

এ রকম প্রশ্নের আশা মামা নিশ্চয়ই করেন নি। বললেন : সে কি রে !

সারারাত ইতিহাস শোনালে বাবা মরে যাব।

মামা অট্টহাস্য করে উঠলেন। স্বাতির গাম্ভীর্য গেল ভেঙে। মামী মুখ নিচু করে চা তৈরি করছিলেন। তাঁর ভাবান্তর লক্ষ্য করতে পারলুম না।

মামা বললেন : বুঝলে গোপাল, আমার পূর্বপুরুষ প্রজা ঠেঙিয়ে খেয়েছে। আর আমি কি এমনই অপদার্থ যে নিজের ভাগনেকে শায়েস্তা করতে পারব না !

এ কথাটি বোধ হয় আর একবার তাঁর মুখে শুনেছি। একটু বেশি স্নেহে একটু বাড়িয়ে বলছেন মাত্র। আমি যে তাঁর নিজের ভাগনে নই, সে কথা আমার জানা ছিল। কিন্তু সম্বন্ধটা যে একেবারে পাতানো, সেকথা শুনেছি তাঁরই মুখে। তবু কোন প্রতিবাদ করলুম না।

হাসতে হাসতে মামা বললেন : এ হল রাজনীতি। বুঝলে গোপাল, দেশ স্বাধীন হবার পর রাজনীতি শিখেছি। নীতির বালাই নেই, শুধু রাজদণ্ড। দল পাকাও, আর দরকার হলে গায়ের জোর। দল পাকিয়ে তোমায় কাবু করতে পারলুম না কিনা, তাই গায়ের জোর খাটাতে হল।

বলে হাসতে লাগলেন তরল আনন্দে।

রায়সাহেব উপাধি তো মামা বর্জন করেছেন, মন্ত্রী হতে কি পারবেন না !

৭

মনে মনে স্থির করেছিলুম, গাড়িতে আর কোন কথা কইব না। কেউ কিছু প্রশ্ন করলেও উত্তর যাব এড়িয়ে। এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমি মামীর হাত থেকে চায়েব পেয়ালা নিয়েছিলুম। মামা বললেন ঃ গোপাল একেবারে চুপ করে রইলে ?

উত্তর না দিয়ে আমি চায়ের পেয়ালায় ঠোঁট চেপে রেখেছিলুম। কিন্তু আড়চোখে স্বাতির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, কৌতুকে তার দুচোখ যেন নাচছে। ভাবি বিপদ তো !

মামী কথা বলে আমাকে উদ্ধাব কবলেন। তাঁর হাতের কাজ শেষ হয়েছিল। বললেন ঃ দেশে ফিবেও গোপালের কাছে আমাদেব অনেক সাহায্য নিতে হবে।

কী বকম ?

প্রশ্নটা মামাই করলেন বলে আমাকে আর কিছু বলতে হল না। কিন্তু স্বাতিকে দেখলুম, কাগজপত্র নিয়ে হঠাৎ ভাবি ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

অঘ্রাণের তো আর দেবি নেই, মাঝে মাত্র একটি মাস। তুমি কি একা সব সামলাতে পাববে !

মামার মনে পড়েছে বটে, অগ্রহায়ণে স্বাতির বিয়ে। কিন্তু আগ্রহ দেখলুম না একেবাবে। উত্তব সংক্ষেপে দিলেন ঃ হুঁ।

তুমি তো হুঁ বলেই খালাস। কাজটাও তো কাউকে করতে হবে।

তা হবে বৈকি।

তোমাব তো কোনই মাথাব্যথা দেখছি না।

সময়মতো হবে।

আশ্চর্য মানুষ ! কন্যাদায়ে লোকে পাগল হয়ে যায়। অথচ তুমি কী করে নিশ্চিন্ত আছ তাই ভাবি।

মামা ততক্ষণে তাঁর পাইপ ধরিয়ে ফেলেছিলেন। খানিকটা ধোঁয়া মুখে নিয়ে বললেন: মেয়ের বিয়েকে দায় ভাবতে পারিনে বলেই নিশ্চিন্ত আছি।

মেয়ের বিয়ে তাহলে অঘ্রাণে দেবে না?

কেন দেব না! তবে কোন বাঁদরের সঙ্গে যে দেবনা সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

একখানা বই-এর পাতা স্বাতি এলোমেলো ভাবে ওল্টাচ্ছে। আমার হঠাৎ কালীকেষ্ট হালদারের কথা মনে পড়ল। সে লোকটা দেখছি মিথ্যে খবর দেয়নি। স্বাতির এই বিয়েতে যে মামার সম্মতি নেই, সে কথা সত্যি দেখছি। সত্যি হলেই মঙ্গল। স্বাতি রক্ষা পাবে। না জেনে একটা অপছন্দের মানুষ বিয়ে করাব মধ্যে খানিকটা সান্ত্বনা আছে। মানিয়ে নেবার একটা চেষ্টা করা যায়। কিন্তু জেনে শুনে তা হয় না। ঘৃণা থেকে প্রেমের জন্ম হয় না স্বাভাবিক পরিবেশে। বই-এর পাতাগুলো স্বাতি খুব তাড়াতাড়ি ওল্টাতে লাগল।

মামী ফোঁস করে উঠলেন: অমন ছেলেকে তুমি বাঁদর বলছ?

সবটুকু দেখলে তুমিও বলবে।

আমার মাথা এখনও বেগড়ায়নি বুঝলে, মেয়ের বিয়ে আমি অঘ্রাণেই দেব।

বেশতো।

মামাকে উপেক্ষা করে মামী এবারে আমাকে বললেন: তুমি বাবা আমাকে একটু সাহায্য ক'রো। তুমি সঙ্গে থাকলে আমি একাই সব ব্যবস্থা করতে পারব।

আমি কিছু বলবার আগেই মামা বললেন: গোপাল না থাকলেও পারবে।

মামী এ কথার উত্তর দিলেন না। আমার দিকে চেয়ে বললেন: আমাদের সমাজে পাত্র কী দুর্লভ জান তো! কারও তো চালচুলো নেই, ভাল বংশপরিচয়ও নেই।

ইচ্ছে হল বলি আমার মতো। কিন্তু তখুনি নিজেকে সামলে নিলুম। যেচে কেন পাত্রের তালিকাভুক্ত হই! কিছু না চাইলে তো লোকে আমার চালচুলোর প্রশ্ন তুলবে না।

গম্ভীরভাবে মামা বললেন : শুধু চালচুলো আর বংশপরিচয় যদি চাও তো ভাল পাত্রের অভাব তো ভারতবর্ষে হবে না। অযোধ্যার নবাবের বংশধরেরা শুনেছি লক্ষ্ণৌ-এর আমিনাবাদে শিক কাবাব তৈরি করছে। যেমন বংশ, তেমনি গরম চালচুলো। চাই কি চেষ্টা করলে দিল্লীতে বাদশাহ বাহাদুর শাহর বংশধরও মিলবে।

আমি হাসতে সাহস পেলুম না। কিন্তু স্বাতির দিকে চেয়ে বুঝতে দেরি হল না যে তার মন হেসে উঠেছে করুণ কৌতুকে। সহজ লজ্জায় তার মুখের হাসি চাপা রইল ঠোঁটের আড়ালে।

মামী উত্তর দিলেন না। উত্তর দেবার কীইবা আছে! কিন্তু মামা তাঁকে ছেড়ে দিলেন না। এমন একটা মন্তব্য তাঁর ব্যর্থ হবে! বললেন : চুপ করে রইলে যে!

মেয়ের কপালে অনেক দুঃখ আছে, তা না হলে তোমার মেয়ে হয়ে জন্মেছে!

ভাবনা কিসের, তোমার মেয়ে হয়ে জন্মাবার সুখটাও তো ভোগ করবে।

এমনই গল্প বোধহয় আরও কিছুক্ষণ চলত। কিন্তু স্বাতি কথা কইল আচম্বিতে, বলল : আচ্ছা গোপালদা, ব্যাঙ্গালোর আমরা যাবার পথে দেখব, না ফেরার পথে?

স্বাতির যে কথা বলার প্রয়োজন ছিল, তা স্বীকার করি। প্রিয় হোক অপ্রিয় হোক, প্রসঙ্গটা প্রকাশ্যে উপাদেয় বলা চলে না। তাই সে অন্য কথা বলতে চায়। আমি তাকে সাহায্য করবার জন্য বললুম : সেটা ভেবে দেখবার কথা।

স্বাতি হেসে উঠল। সে হাসি যেন আর থামতে চায় না।

মামী বিস্মিত হলেন, বললেন : এমন হাসবার কী হল?

হাসবার কথা আগে হয়েছিল। আমার মনে হল, স্বাতি সেই হাসি পুষিয়ে নিচ্ছে। ইচ্ছে হল, আমিও তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাসি। কিন্তু তার আগেই স্বাতি খানিকটা সংযত হয়ে বলল : গোপালদার কথা শুনলে না, ব্যাঙ্গালোর আমরা কখন দেখব তাও ভেবে দেখতে হবে। না ভেবে কোন কিছু ভাবাও উচিত নয়, কী বল গোপালদা ?

ঠিক বলেছ। এই পৃথিবীটার জন্ম তো ভাবনা থেকেই।

কী রকম ?

ভগবান ভাবলেন, আলো হোক। আলো হল। ভগবান ভাবলেন, পৃথিবী হোক, মানুষ হোক। পৃথিবী হল, মানুষ হল।

তুমি বিশ্বাস কর এ সব কথা ?

না।

তবে বলছ কেন ?

সত্য কথাটা জানা নেই বলে।

সত্য জান না বলে কি মিথ্যা বলবে ?

মিথ্যা তো প্রমাণ করতে পারিনি। নতুন সত্যের আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত পুরনো সত্যকেই সত্য বলে মানতে হবে।

তবে যে বললে বিশ্বাস কর না ?

সে কথাও সত্যি। বিশ্বাস করি যে এই সৃষ্টির ব্যাপারে আরও কোন বড় সত্য আছে। তাও একদিন ধরা পড়বে।

মামা বললেন : ভগবান বিশ্বাস কর তো ?

করি।

কেন কর ?

ঐ নামটি উচ্চারণ করে বড় সান্ত্বনা পাই। ভগবানকে অস্বীকার করলে দুঃখ বাড়বে।

মামী আমার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন। আমি কিছুতেই তাঁর মনের নাগাল পেলুম না।

স্বাতি বলল : ভগবানকে তাহলে তুমি নিজের স্বার্থেই বিশ্বাস কর।

মানুষ সবকিছুই করে নিজের স্বার্থে। পরার্থে যে কিছু করে, তাকে আমরা অতিমানুষ বলি। আমাদের ধর্মবিশ্বাস মতে দেবতারা অনেকের জন্য অনেক কিছু করেন, আর সকলের জন্য সবকিছু করেন স্বয়ং ভগবান।

মামা ঘনভাবে পাইপ টানছিলেন। এবারে পাইপটা সরিয়ে বললেন : কথাটা গোপাল ঠিকই বলেছ।

স্বাতি বলল : গোপালদা আজ মুডে আছে।

বললুম : মেজাজ আমার এই রকমই। শুধু অবিচার দেখলে একটু ক্ষেপে যাই, এই যা। তবে হাতে ক্ষমতা থাকলে ক্ষেপতুম না, মেরে টিট করে দিতুম। দুর্বল বলেই ক্ষেপে যাই, আর হাত কামড়াই।

ক্ষমতার লোভ আছে ?

লোভ ?

হ্যাঁ লোভ।

লোভ নেই। যখন ক্ষেপে উঠি, তখন হয়তো লোভ হয়। সে নিতান্তই সাময়িক।

ওটা স্থায়ী হলেই কি মঙ্গল ছিল না ?

কেন ?

লোভ কথাটা ধিক্কৃত হতে পারে। কিন্তু ওটা না থাকলে কিছুই অর্জন করা সম্ভব হত না। লোভ আছে বলেই কি আমরা উন্নতি করছি না ?

বন্যও হচ্ছি। এক পা এগিয়ে দুপা পিছিয়ে আসছি। যেখান থেকে আমরা শুরু করেছিলুম, সেখানেই প্রায় ফিরে এসেছি। লোভ বর্জন করতে পারলেই সমাজের কল্যাণ হবে।

স্বাতি এ কথার উত্তর খুঁজে না পেয়ে বলল : তুমি ব্যাঙ্গালোরের

কথা বল। সকাল বেলায় স্টেশনে নেমে আমরা শহর দেখব, না মাইসোরের গাড়িতে উঠব।

উত্তর মামা দিলেন, বললেন: সকাল বেলাতেই যখন পৌঁছচ্ছি, তখন দেখে নেওয়াই ভাল।

স্বাতি আমার দিকে একখানা গাইড বই এগিয়ে দিল। বলল: কত সময় লাগবে হিসেব করে বল।

বই না খুলেই আমি বললুম: যদি কলকারখানা দেখতে চাও, তাহলে একদিনে দেখা অসম্ভব।

এখানে আবার কিসের কারখানা?

আমি বিনির কাপড়ের কলের নাম করলুম। হিন্দুস্থান হাওয়াই জাহাজ, টেলিফোন আর ভারি কলকব্জার কারখানা। যা তৈরি হয়নি তাও বিরাট ব্যাপার হবে।

মামীর মুখের দিকে চেয়ে মামা বললেন: দেখবে?

মামী নাক সেঁটকালেন।

মামা তাড়াতাড়ি বললেন: তবে ওসবে কাজ নেই। আর যা দেখবার আছে তাই দেখিও।

আর কী দেখবার আছে! গাইড বই খুলে দেখলুম, লালবাগের একটা ছবি আছে। আর কিছুই নেই। বিপদের কথা। সোনার খনি আছে কোলারে। কিন্তু সে তো শহরে নয়, শহরের কাছেও নয়। ব্যাঙ্গালোর পৌঁছবার মাইল পঞ্চাশেক আগে বঙ্গারাপেট নামে একটি স্টেশন আছে। সেখান থেকে শাখা লাইনে আট মাইল গেলে সোনার খনি। একবার লিলুয়ার রেলের কারখানার জনকয়েক জানাশুনো ছেলে এই খনি দেখে গিয়েছিল। তাদের মুখে গল্প শুনেছি।

স্বাতি বলল: কী ভাবছ?

বললুম: সোনার খনির কথা।

মামা বললেন: তাই তো, এইখানেই তো কোথায় সোনার খনি আছে।

এখানে নয়, কোলারে।

স্বাতি বলল : আমরা সোনা তৈরি দেখব।

মামী বললেন : সোনা কি তৈরি হয়?

মামা বললেন : দেখবার বাধা আছে কোন?

আমি শুনেছিলুম, লিলুয়ার ছেলেরা চিঠি লিখে অনুমতি এনেছিল। এখানে লিখে আনাবার সময় নেই, নিজেরা গিয়ে চেষ্টা করতে হবে। তাকিয়ে দেখলুম যে তিনজনেই আমার মুখেব দিকে চেয়ে আছেন। সোনার মানই এইরকম। সোনার নামে কে মুগ্ধ হয় না আমার জানা নেই। বললুম : ভেতরে যেতে হলে অনুমতির দরকার।

বাইরে আবার কী দেখব?

মাঠ আর ঘরবাড়ি।

স্বাতি বলল : সোনার খনি কি কয়লার খনির মতো?

তাহলে দুঃখ ছিল না। সোনার গয়নাও তোমরা পরতে চাইতে না।

তারপরে তাকে সোনার খনির গল্প শোনালুম। পাথরের গায়ে সোনার মতো সরু সরু দাগ চিক চিক করে। খনির ভিতর কুলিরা সেই পাথর কাটে, উপরে তোলে। সেই পাথর গুঁড়ো করে সোনা বার করে চেলে চেলে। একদিকে পাথরের গুঁড়ো, অন্য দিকে সোনার কণা। তাল তাল সোনা। সোনা চুরি না হয় তার কত ব্যবস্থা। কিছুতেই কি চুরি হয় না! চুরির শিক্ষা যে আমাদের রক্তে ঢুকে গেছে। নিজেদের জিনিস আমরা নিজেরাই চুরি করি। যে দেশ সোনায় ভরে যেতে পারত, সে দেশে আজ খাদ্য নেই। দুমুঠো খেতে দেবার আশ্বাস কেউ দিতে পারছে না। চব্বিশ হাজার মানুষ এই সোনার খনিতে কাজ করে, তারাও কি দুবেলা পেট ভরে খেতে পায়!

এ সংবাদে কারো প্রয়োজন নেই।

ব্যাঙ্গালোরে নেমে নতুন বিপদের উৎপত্তি হল। রাত্রিবাস করতে হবে না বলে স্থির করা হয়েছিল, ওয়েটিং-রুমেই মুখহাত ধুয়ে আমরা বেড়াতে বেরব। মামা বাথ-রুমে ঢুকেছিলেন, মামী গিয়েছিলেন মেয়েদের ওয়েটিং-রুমে। খানিকক্ষণ পরেই ফিরে এসে নোটিশ দিলেন, নরককুণ্ড। মানুষ ওখানে ঢুকতে পারে না।

তর্ক অবান্তর। আমি উপর তলায় ছুটলুম রিটায়ারিং-রুমের চেষ্টায়। ডাকাডাকি করে খবব পেলুম স্থানাভাব। তাহলে কি কোন হোটেলে যেতে হবে?

ওধারের ঘর থেকে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। দীর্ঘ বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য, বয়সে প্রৌঢ়, বিলাতি পোষাক। ইংরেজীতে বললেন: কী হয়েছে?

আমি বলতে যাচ্ছিলুম, ও কিছু নয়। কিন্তু তার আগেই তিনি বললেন: জায়গা নেই! আসুন আমার সঙ্গে।

বলে আমাকে একবকম টেনেই নিয়ে গেলেন নিজের ঘরে। একটি বেডের ছোট ঘর। বললেন: এই নিন। আপনার জিনিস-পত্র কোথায়? ওয়েটিং-রুমে? চলুন নিয়ে আসি।

কী আশ্চর্য! চেনা নেই, পরিচয় নেই, কোন জিজ্ঞাসাবাদ পর্যন্ত নেই। এই ভদ্রলোক আমায় জোর করে ধরে এনে নিজের ঘরে স্থান দিচ্ছেন। আমাকে ইতস্তত করতে দেখে বললেন: ও ভয় হচ্ছে বুঝি! আজকের দিনে তা কিছু আশ্চর্যের নয়।

বলে পকেট থেকে তাঁর কাগজপত্র বার করলেন, বললেন: কান্তিনাথ, দিল্লীর বড় দপ্তরে ছোট চাকুরে।

তাঁর আইডেন্টিটি কার্ড দেখে আরও বিস্মিত হলুম। রীতিমত

পদস্থ কর্মচারী। সাধারণ লোকের ধরা ছোঁয়ার বাহিরে। আমি তাঁর অমায়িক ব্যবহার দেখে আরও বিস্মিত হলুম। বললুম: ভয় নয়, আমার অন্য ভাবনা।

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে তাকালেন।

বললুম: আমার নিজের কিছুরই প্রয়োজন নেই। সঙ্গে মামা মামী আছেন, তাঁদের মেয়ে আছেন

ভদ্রলোক এক মুহূর্ত ভাবলেন, বললেন: রাতে থাকবেন?

না।

তবে কুছ পরোয়া নেই। আমি ঘর ছেড়ে দিচ্ছি।

সে কী!

আসুন আমার সঙ্গে।

বলে হাত ধরে আমায় হিড় হিড় করে টেনে নামালেন। আমি তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে অভিভূত হলুম। মামা মামীকে রাজী করতে তাঁর এক মুহূর্তও সময় লাগল না। কুলি ডেকে জিনিসপত্র নিয়ে সবাইকে উপরে তুলে আনলেন।

ভদ্রলোকের হাঁকডাকে বেয়ারা এল। তাকে বললেন: বাইরের বারান্দায় একখানা চেয়ার দাও।

মামী আমাকে বললেন: বাইরে বসবার কী দরকার! গোপাল একটু বুঝিয়ে বলনা।

হিন্দীটা মামী বুঝতে শিখেছেন, কিন্তু বলতে পারেন না। বাঙলায় বললে কান্তি নাথ বুঝবেন না। কাজেই আমার সাহায্যের দরকার। আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললুম। ভদ্রলোক বললেন: আমার জন্য আবার ভাবনা কেন! আপনারা আরাম করে বসুন, মুখহাত ধোন। তারপর বেড়াতে যাবেন তো?

ঠিক বলেছেন।

কান্তি নাথ যেন আর্তনাদ করে উঠলেন: ইস, আপনারা যদি কাল আসতেন তো কী ভালই হত।

কেন ?

কাল সারাদিন আমার কাছে একখানা গাড়ি ছিল। বেশ বড় গাড়ি। ব্যাঙ্গালোরের সব কিছু আপনাদের দেখিয়ে দিতে পারতুম।

একটু ভেবে বললেন ঃ আচ্ছা দাঁড়ান, একবার চেষ্টা করে দেখি।

ভদ্রলোক দরজার দিকে পা বাড়িয়েছিলেন।

মামা ললেন ঃ গাড়ির জন্যে কেন ভাবছেন! একটা ট্যাক্সি নিলেই তো হবে।

শুধু শুধু কেন ট্যাক্সিকে পয়সা দেবেন!

ভদ্রলোক আর দাঁড়ালেন না, তরতর করে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন।

মামীও এই সুযোগে কাপড় গামছা নিয়ে স্নানের জন্য গেলেন।

একখানা শোবার ঘরের ভিতর পাশাপাশি দুখানা ছোট ঘর। তার একটায় স্নানের ব্যবস্থা। শোবার ঘরেই বসবার আসবাব—টেবিল চেয়ার আরাম চৌকি। চারিধারে তাকিয়ে মামা বললেন ঃ কী বুদ্ধি দেখ!

বুঝতে না পেরে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

মামা বললেন ঃ দেখতে পাচ্ছনা কাণ্ডখানা? ঘরের ভেতর ঘর করেছে, কিন্তু দেওয়াল আধখানা। পুরো দেওয়াল তুললে যে দুর্গন্ধ আসবে না।

স্বাতি হেসে উঠল।

কান্তি নাথ যে এরই মধ্যে ফিরে এসেছেন আমরা জানতে পারি নি। বাহিরে থেকে বলে উঠলেন ঃ আমার কাণ্ড দেখে হাসছেন তো!

স্বাতি লজ্জা পেল। আমি তাঁকে হাসির কারণটা বুঝিয়ে দিলুম।

কান্তি নাথ বললেন ঃ আমাকে দেখে অনেকে হাসেন কিনা, তাইতেই সন্দেহ হয়েছিল। যাক গাড়ির ব্যবস্থা করে এলুম। একটা ফ্যাক্টরি থেকে গাড়ি আসছে। তাদের কাছে আমার কাজ আছে, সেই কথা জানিয়ে দিলুম।

মামা আশ্চর্য হয়েছিলেন। ভদ্রলোক বললেন ঃ গভর্নমেন্টের

চাকরি করে এইটুকু যদি ব্যবস্থা করতে না প্যারি তো তিরিশ বছর কি ঘাস কেটেছি!

সত্যি কথা। লোকে জমিজমা কিনছে, ঘর বাড়ি তুলছে, চাকরি ছেড়ে অনেকে কলকারখানাও খুলছে। চোখে না দেখে থাকলেও লোকের মুখে শুনছি আর কাগজেও দেখছি কিছু কিছু। ইনি তো শুধু পরের মোটর চেয়ে নিচ্ছেন কয়েক ঘণ্টার জন্য।

হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বললেন: ব্যবসা আছে কলকাতায়?

আমি মাথা নাড়লুম।

তবে?

ব্যবসাদারের চাকরি করি।

আমার কথাটা ঠিক ধরতে না পেরে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

বললুম: ফার্মের কেরানী।

কান্তি নাথ যে অনেকখানি মুসড়ে পড়লেন, আমার চোখে তা এড়াল না। ছি ছি করে উঠলেন না বটে, বললেন: আহা আপনার মতো প্রমিসিং ইয়ংম্যান পেলে আমাদের সরকার বর্তে যেত।

স্বাতি চেয়ে দেখল, মামী ঘরে নেই। বলল: ডুবে যেত বলুন।

কান্তি নাথ রহস্যটা বোঝেন নি। স্বাতি বুঝিয়ে বলল: গোপালদা যাতে হাত দেয়, তাই তো ডুবে যায় দেখছি।

বুঝেছি বুঝেছি।

বলে কান্তি নাথ হেসে উঠলেন।

আমি নিচের ওয়েটিং রুম থেকে তৈরি হয়ে এলুম। স্বাতি উপরেই তৈরি হচ্ছিল। ইতি মধ্যে কান্তি নাথ মামার সঙ্গে জমিয়ে বসেছেন। নিজের নোটবুকে কী টুকে রেখে বললেন: গরীবের কুটিরে আপনার পায়ের ধুলো না পড়লে আমি ভারি দুঃখিত হব। এই যে গোপালবাবু এসে গেছেন দেখছি, চলুন এবারে, চায়ের চেষ্টা করি।

স্বাতির জন্য আমাদের বেশি দেরি করতে হল না।

দরজা বন্ধ করে ভদ্রলোক চাবিটা আমার হাতে দিলেন। বললেন : এটা আপনিই রাখুন। যা দেশকাল, ফিরে এসে যদি দেখেন সব ফাঁক হয়ে গেছে, নিশ্চয়ই ভাববেন, হতভাগা কান্তি নাথের কারবার। তা না হলে—

চলতে চলতেও ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে পড়লেন, বললেন : রেলের চাবিতে বিশ্বাস নেই। সঙ্গে তালা আছে আপনার ?

বলে মামীব দিকে তাকালেন।

মামী বললেন : আছে।

তবে তাই দিন।

দরজায় মামীর তালা পড়ল, চাবিও উঠল মামীর আঁচলে। নিশ্চিন্ত মনে কান্তি নাথ বললেন : আর আমার ভাবনা নেই।

রিফ্রেশমেণ্ট-রুমেব দরজায় কান্তি নাথ দাঁড়ালেন, বললেন : আমি আব কেন, আপনারা খেয়ে নিন। ব্রেকফাস্ট আমি সকাল বেলাতেই সেরে নিয়েছি।

মামা বললেন : এক যাত্রায় কি পৃথক ফল হয়! আসুন আসুন, আপনাকেও কিছু খেতে হবে।

এক পেয়ালা চায়ের বেশি কিন্তু আর কিছু না।

আমাদের একটা টেবিলে বসিয়ে দিয়ে কান্তি নাথ বেয়ারাকে ডেকে আনলেন মামার কাছে। মামা বললেন : কী খাবেন ?

আমাব জন্য কেন ভাবছেন ? আপনারা কী খাবেন বলুন।

মামা পাঁউরুটি মাখন আর ডিমের ফরমাশ করে কান্তি নাথের দিকে চাইলেন। কান্তি নাথ বেয়ারাকে বললেন : কুছ নহীঁ। ওঁদের চা থেকে আমি এক পেয়ালা ঢেলে নেব। বেয়ারা চলে যাচ্ছিল। তাকে আবার ডেকে বললেন : দাঁড়াও দাঁড়াও, বেশি চায়ে আবার লোকসান করতে পারে। তার চেয়ে তুমি এক প্লেট পরিজ দাও।

পরিজ এল, রুটি মাখন ডিম। গল্প করতে করতে কান্তি নাথ দ্বিতীয়বার ব্রেকফাস্ট করলেন।

ব্যাঙ্গালোর স্টেশনটি আমাদের ভারি ভাল লাগল। একধারে বড় লাইন, আর এক ধারে ছোট লাইন। মাঝখানে স্টেশন। শহর থেকে আসতে হলে ওভারব্রিজের উপর দিয়ে স্টেশনে নামতে হয়। ভিতরে মোটরও আসে। বড় লাইনের প্ল্যাটফর্মের ধারে অনেক গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে—মোটর ট্যাক্সি আব অটো রিক্স। এই গাড়িগুলো আজকাল খুব চলছে। মোটর বাইকের মতো গাড়ি, পিছনে দুটো চাকা। দুজন মানুষ স্বচ্ছন্দে বসতে পারে। কান্তি নাথের সঙ্গে আমবা এইখানে এলুম।

তাঁব গাড়ি এসে দাঁড়িযে ছিল। গাড়িও চেনেন না, ড্রাইভারও না। কিন্তু খুঁজে খুঁজে ঠিক বার করে ফেললেন। হিন্দীতে কিছু কথাও বলে নিলেন। তারপর আমাদের সবাইকে ঠেলে তুলে দিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর নিজের বসবার জায়গা নেই। আমি সামনে বসেছিলুম, বললুম: এবারে?

কুছ পরোয়া নহীঁ, একটু সরে বস্থন।

বলে আমাকে ঠেলে উঠে পড়লেন।

মামা জিজ্ঞাসা করলেন: আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

কান্তি নাথ হেসে বললেন: ডাকাতি রাহাজানির ভয় পাবেন না। শহরটাই দেখিয়ে দেব। দেখবার আর কী আছে? লাল বাগ আর কুব্বন পার্ক, তার ভিতর সবকারী অফিস। গোটাকতক বড় রাস্তা আর বাজার।

আপনার দেরি হয়ে যাবে না?

দেরি! আমি এমন কেউ-কেটা লোক নই যে দু ঘণ্টা আপনাদের সঙ্গে ঘুরলে আমার মহাভাবত অশুদ্ধ হয়ে যাবে।

পরিচ্ছন্ন প্রশস্ত পথ বেয়ে আমরা লালবাগে এলুম। বিরাট

বাগান, তার ভিতরে মোটরের রাস্তা। গাড়ি থেকে নামবার প্রয়োজন নেই, তবু আমরা এক জায়গায় নামলুম। কান্তি নাথ বললেন : এইখেনটাই সবচেয়ে ভাল মনে হচ্ছে। এই কাচের ঘর, আব এই ফোয়াবা।

স্বাতির খুব বেশি ভাল লাগল না। বলল : এত বড় বাগানে কোথাও ফুল দেখছিনে।

সত্যি কথা। বড় বড় গাছে চারিদিকটা ছেয়ে আছে। মাঠেব ঘাস বেড়ে উঠেছে অযত্নে। ফুলেব বেড এখনও তৈরী হয় নি। শবৎ শেষ হয়ে হেমন্ত শুরু হয়েছে অনেক দিন। এখন তো ফুলেব চাষে শৌখিনরা মেতে উঠেছে। এখানে গরম নেই, সকালে একটু ঠাণ্ডাই ছিল। এই আবহাওয়ায় শীতের ফুল ফোটানোও বোধ হয় সম্ভব হত।

স্বাতিব কাঁধে ক্যামেবা ছিল। কান্তি নাথ বলল : আমাদেব একটা ছবি তুলুন।

বলে আমার হাত ধবে ফোয়ারাব কাছে টেনে আনলেন। মামা মামীকেও ডাকলেন।

স্বাতি বলল : গোপালদাকে ছেড়ে দিন। ওর ছবি বড্ড বিশ্রী ওঠে।

বিশ্রী লোকেব ভাল ছাবি কী কবে উঠবে বল!

আমি সবে দাঁড়াচ্ছিলুম, কিন্তু কান্তি নাথ আমায় টেনে রাখলেন। স্বাতি আড়চোখে তাকিয়ে মুচকি হাসল।

কুব্বন পার্কেব ভিতব এ বাজ্যের সমস্ত সরকাবি অফিস। বিরাট জায়গা জুড়ে এই অফিসগুলো। অনেকদিন পবে খববেব কাগজে গল্প পড়েছিলুম বিধান সৌধেব। কত অর্থ অপব্যয় হয়েছে আর প্রধান মন্ত্রী কেন পদত্যাগ কবলেন। এসব নিয়ে আমবা মাথা ঘামাই নি। কান্তি নাথ বললেন : এবাবে কোথায় যাবেন ?

তা জানিনে।

আমিও যে কিছুই জানিনে। আচ্ছা এক কাজ করি। বাজারের ভেতর আপনাদের নামিয়ে দিয়ে যাই। বাজারটা দেখে আপনারা ফিরুন। বিকেল বেলায় আর কারও গাড়ি ধরব।

মামা বললেন: আবার গাড়ি কেন! একটা ভাল জায়গায় আমাদের নামিয়ে দিন। আমরা সব দেখে শুনেই ফিরব।

আমরা বাজারে নেমেছিলুম। খানিকটা হেঁটেই মামী ক্লান্ত হয়ে পড়লেন: আর হাঁটতে পারিনে বাবা। এবারে ফের।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল: আমাদের ব্যাঙ্গালোর দেখা হয়ে গেল।

ইচ্ছে করে আমি উত্তর দিলুম না। মামা বললেন: এ তোমার কান্তি নাথের কর্ম নয়। গোপাল না দেখালে দেখাটাই যেন জমছে না।

স্বাতির দৃষ্টিতে আমি কৌতুক দেখলুম। আর আমাকে নীরব দেখে মামা আবার বললেন: একখানা ট্যাক্সি ধর, আমরা উঠে বসি। তারপর তুমি আমাদের ভার নাও।

মামীর মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারছিলুম যে হাঁটতে তাঁর সত্যিই কষ্ট হচ্ছে। লোকে ভাবে এমন সরল সুন্দর রাস্তায় কেন কষ্ট হবে। বলবে, এতটা বাড়াবাড়ি। কিন্তু মামা মামীকে দেখবার পর আমি এ কথা বলি না। তাঁদের পায়ে হাঁটার অভ্যাস নেই, কষ্টের ভিতর ভান নেই এতটুকু। তবে এই অক্ষমতার জন্য মায়া হয় তাঁদের উপর। নিজেদের কত অশক্ত কত পরমুখাপেক্ষী করে তুলেছেন!

খানিকক্ষণ চেষ্টা করে আমি একখানা ট্যাক্সি ধরে ফেললুম। গাড়িতে উঠে মামীই প্রথম কথা কইলেন। বললেন: এবারে বেশ নিশ্চিন্ত মনে হচ্ছে।

কেন বলত?

যাই বল, অমন গায়ে-পড়া ভাব আমার ভাল লাগে না।

ভাল না লাগলে চিন্তার কী আছে?

তোমার তো কিছুতেই চিন্তা নেই। ওর অমন মাথাব্যথা কিসের?

ব্যস্তভাবে আমি বললুম: গভর্নমেন্টের বড় অফিসার। আমি তাঁর কাগজপত্র দেখে নিয়েছি।

গভর্নমেন্টের বড় অফিসারের আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, আমাদের সঙ্গে নাচতে বেরবে! ওসব কাগজপত্র তো অন্যেরও হতে পারে, জালও হতে পারে। যা করেছ করেছ, সন্ধ্যেবেলায় আর ওর গাড়িতে চ'ড়ো না।

মামা কিছু মর্মাহত হলেন, বললেন: মানুষকে তুমি বড় বেশি সন্দেহ কর।

ত্রিচিনপল্লীর ঘটনা আমার মনে পড়ল। মামীর এই সন্দেহের জন্য ড্যানিয়েলের উপর কী অবিচার আমরা করেছি। সে ভদ্রলোক বোধ হয় কোন দিন আমাদের ক্ষমা করতে পারবেন না। অন্তত তাঁর দীর্ঘদিনের বিশ্বাসে যে গভীর আঘাত লেগেছে তাতে সন্দেহ নেই।

মামী বললেন: অকারণে করি না।

এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি?

স্বাতি জানতে চাইল।

ড্রাইভারের সঙ্গে আমি সে কথা ঠিক করে নিয়েছিলুম। সে আমাদের ক্যান্টনমেন্টের দিকে নিয়ে যাবে। সেখানে কমার্সিয়াল স্ট্রীট আর রাসেল মার্কেট। মামীকে একবার ভাল একখানা শাড়ির দোকানে পৌঁছে দিলেই এ জায়গাটা তাঁর ভাল লেগে যাবে। বলে দিয়েছিলুম, আস্তে আস্তে গাড়ি চালাবে আর বড় বড় বাড়িগুলো চিনিয়ে দেবে। কিন্তু স্বাতির কাছে সত্য কথাটা আমি ভাঙলুম না। বললুম: দেখি, কোথায় গিয়ে পৌঁছই।

পিছন থেকে স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : আচ্ছা গোপালদা, ব্যাঙ্গালোর নামটা কেন হল ?

ভাগ্য ভাল। একটা গাইড বইএ এ নামের কথা দেখেছিলুম। তাতে গল্পটা বলে নি, কিন্তু একটা গল্প যে আছে তা জানিয়েছে। বললুম : ব্যাঙ্গালোর কথাটার মানে হল সেদ্ধ বীনের শহর। বীন ইংরেজী কথা, মানে শিম বরবটি জাতীয় সব্জি। সে সব রাজা রাজড়ার পুরনো গল্প, তোমার বিশ্বাস হবে না।

গল্পটা শুনতে চাইলেই মুস্কিল। স্বাতি আমার জ্ঞানের পরীক্ষা নিচ্ছে। বলতে না পারলেই হার। কিন্তু স্বাতি যতটুকু শুনেছিল তাতেই প্রচুর আশ্চর্য হল। ব্যাঙ্গালোরের মতো একটা নামের যে কোন মানে থাকতে পারে এ তার বিশ্বাস হল না। বলল : বানিয়ে বলছ।

বানিয়ে বলতে বেশি ক্ষমতার দরকার। সাহিত্যিকদের দেখ, প্রায় সব কথাই তাঁরা বানিয়ে বলেন, অথচ সবাই সব সত্যি ভাবে।

আমি তা ভাবিনে। এত যে বই পড়ছি, সবই তো গল্প বলেই মনে হয়।

সেই জন্যেই তো আমার সত্যি কথাটাও গল্প বলে মনে হয়েছে। এ শহরে পুরনো কিছুই নেই, তাইতেই তো বিপদে পড়েছি। শুধু একটি দুর্গ আছে। চারশো বছরেরও বেশি তার বয়স। ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কেম্পে গৌদা নামে এক সর্দার এখানে কাদার একটা দুর্গ তৈরি করেছিলেন, আর শহরের চার সীমায় চারটি চৌকিঘর করে এই শহরের প্রতিষ্ঠা করেন। দুশো বছর পর হায়দর আলি এই দুর্গ পাথরে তৈরি করলেন, টিপু সুলতান আরও উন্নতি সাধন করলেন। মুসলমান স্থাপত্যের এই একটি নিদর্শন এ শহরে আছে।

ততক্ষণে আমরা কমার্সিয়াল স্ট্রীটে পৌঁছে গেছি। দুধারে চমৎকার দোকান। মামী বললেন : একটু দাঁড়ালে হয় না ?

আর কোন কথা নয়। আমি একখানা শাড়ির দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিলুম।

গাড়ি থেকে নামবার সময় মামা বললেন: তোমার মনে এই ছিল গোপাল?

একথার উত্তর আমি মামীকে দিলুম: মাইসোরে দশেরার একজিবিসন এখনও চলছে। সেখানেও ভাল জিনিস পাওয়া যাবে।

আড়ালে স্বাতিকে বললুম: কলকাতার কাজ কমিয়ে রাখছি।

এখানে কয়েকরকমের শাড়ির খুব প্রচলন দেখলুম। মাইসোরের খাঁটি সিল্ক, কলে বোনা ও তাঁতে তৈরি তুরকমই আছে। রঙ একটু গাঢ়, পাড়ে ও আচলে জরি আছে, কিন্তু নানা রঙের সুতোয় ঝকঝকে নয়। সরুপাড় ও পাড়হীন শাড়ির নাকি বেশি চল। এ ছাড়া কলের জর্জেট ও ক্রেপ শাড়ি আছে নানা জাতের। রঙের যেমন বৈচিত্র্য, তেমনি পাড় ও আঁচলের বর্ণাঢ্যতা। স্বাতি বলল, এগুলো পুরনো হয়ে গেছে। নূতনত্ব দেখা গেল নকল সিল্কের শাড়িতে। মাইসোর সিল্ক মামীর পছন্দ হল। কলে বোনার দাম একশো টাকার বেশি, কিন্তু তাঁতের জিনিস পঞ্চাশ ষাট টাকাতেই পাওয়া যাচ্ছে। রঙ কিছু গাঢ় বলে স্বাতির আপত্তি ছিল, মামী মানলেন না, বললেন: তবে কি আমার বয়সে পরবি?

এই সঙ্গে ব্লাউস পিসও নিলেন। দশ থেকে কুড়ি টাকা দাম। বার গিরের টুকরো তারা কেটে রেখেছে। হোক বেশি মহর। তবু আমাদের দেশের দর্জি ও কাপড়ে ব্লাউস কাটতে বোধহয় পারবে না। এক গজ কাপড় থান থেকে কেটে নেয়া যায়, সে সবই তো এক রঙের। জরির কাজ করা ঝকঝকে কাপড় চোদ্দ গিরের টুকরো পাওয়া গেল তুএকটা। মামী তাই নিলেন। বেশ খুশী খুশী মন। বললেন: আর কী পাওয়া যায় গোপাল?

বললুম: চন্দনের আর হাতির দাঁতের জিনিস, আতর—

আমি শেষ 'করবার আগেই মামা বললেন: ওসব মাইয়োত্রে ভাল।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন: বেলার খেয়াল কিছু আছে?

আমরা সোজা স্টেশনেই ফিরে এলুম।

৯

খেয়ে দেয়ে মামা মামী বিশ্রাম করবেন। আমি ভেবেছিলুম, ত্রিচিনপল্লীব মতো স্বাতির সঙ্গে আমি স্টেশন দেখব, কিংবা গল্প করব কোথাও কাছাকাছি বসে। সেবারে সে নিজেই আমার সঙ্গে বেরিয়েছিল, এবারে সেই আপত্তি কবল। বলল: আমিও এই ঘরে থাকব।

ঘরে থাকব বললেই থাকা যায় না। একখানা ছোট খাট, আর একখানা আরাম চৌকি। সারা দুপুর কাঠের চৌকিতে বসে থাকাব কোন মানে হয় না। বিব্রতভাবে মামা ঘরেব চারিদিকে চাইলেন। আমি বললুম: লেডিজ ওয়েটিংরুমে ভাল চেয়াব আছে।

মামী স্বাতির মুখেব দিকে তাকালেন। স্বাতি বলল: সেইখানেই ভাল।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে স্বাতি বলল: তুমি লেডিজ ওয়েটিং-রুমের নাম কেন করলে?

আমার সঙ্গে থাকতে তোমার আপত্তি আছে দেখে।

কে বললে আপত্তি আছে?

ত্রিচিনপল্লীর কথা তো ভুলে যাইনি।

কী করেছিলাম সেখানে?

আমাকে টেনেছিলে

হাত ধরে?

হাত ধরে টানার কি আর জোর আছে! তোমার টান ছিল আরও শক্ত—

স্বাতি বোধহয় ভয় পেয়েছিল। আমি কোন আলগা কথা বলে ফেলব। তাই জবাব দিল তাড়াতাড়ি: বুঝেছি।

তবেই দেখ, এবারে তুমি নিজেকে লুকিয়ে রাখছ। কেন রাখছ, তাও জানি।

ছাই জান।

বলব ?

বলতে হবে না।

আমি যে জানি, সে কথা তুমিও জান দেখছি। খুশী হলুম।

প্ল্যাটফর্মে পা দিয়ে স্বাতি বলল : লেডিজ ওয়েটিংরুমটা কোন্ দিকে ?

চল পৌঁছে দিচ্ছি।

তুমি কোথায় থাকবে ?

এখানে তোমাব মালঞ্চ তো নেই যে মালাকব হব, দরজার পাশে প্রহবী হয়েই থাকব।

তামাসা ভাল লাগে না।

তবে কী কবব বল ?

চল এই স্টেশনটা ভাল কবে দেখি।

হেসে বললুম : তাই দেখি চল।

হাসলে যে ?

সত্যি কথা বললে যদি রাগ না কর, তবেই বলি।

সত্যি কথা তোমায বলতে হবে না।

ভয় নেই, কোন অসম্মানেব কথা বলব না।

স্বাতি আব আপত্তি করল না। বললুম : একটা মনের আয়নায় আব একটা মনের ছায়া একবাব পড়েছিল। মন টুকবো টুকরো হয়ে গেলেও সে ছায়া কোনদিন মুছে যাবে না।

কেন ?

এই নিয়ম। এই লোহা লক্কড় ধোঁয়া ধুলো আব ইঞ্জিনেব শব্দের ভেতব আমার কথাটা হয়তো বেয়াড়া শোনাবে, কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় লালবাগে কিংবা বৃন্দাবন গার্ডেনে তা মনে হবে না। ফাঁকি থাকলে তো ফাঁক থাকবে !

তোমার কথা আজ হেঁয়ালির মতো মনে হচ্ছে।

সহজভাবে বললে তুমি লজ্জা পাবে।

পাব না।

সেই লজ্জাতেই তো তুমি আমার সঙ্গে আসছিলে না।

আমি লজ্জাবতী লতা নই যে তোমার কথাতেই বুঁজে যাব।

তবে কি আমি ছুঁলে তুমি পাপড়ি মেলবে?

সে উত্তাপ কি তোমার আছে?

আগুনের উত্তাপে হল্কা লাগে, দেহ ঝলসে যায়। পাপড়ি মেলার উত্তাপের জন্যে তার সারারাত্রির সাধনা।

তুমি কবিতা লেখ না কেন গোপালদা?

তোমার বিয়ের পরে লিখব।

অতদিন অপেক্ষা করে থাকবে?

অঘ্রাণের আর দেরি নেই। জামাকাপড়ও কেনা হয়ে গেল।

স্বাতি হাসল। আমি গভীর ভাবে তাকিয়েও সেই হাসির অর্থ খুঁজে পেলুম না। বিষণ্ণ তো নয়। তবে কি কৌতুক প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে কোনখানে! বলল: কোথাও বসবে না?

বসবার জায়গা আপাতত একটাই দেখছি—ওয়েটিং রুম। রিফ্রেশমেণ্ট-রুমের বেয়ারারা নিশ্চয়ই বিশ্রাম করছে। সেখানে ঢুকলে তারা বিরক্ত হবে।

কাজেই আমরা ওয়েটিং রুমে এলুম। কোণার দিকের দুখানা চেয়ার দখল করে দুজনে পাশাপাশি বসলুম। স্বাতি বলল: এইবারে তোমার হেঁয়ালির মানে বল।

প্রসঙ্গটা সে ভোলেনি দেখে আমি খুশী হলুম। বললুম: কার্তিকের মতো রাজপুত্তুর পক্ষীরাজে চড়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে এল। প্রাসাদের অলিন্দ থেকে রাজকন্যা তাকে দেখছিল। বলে উঠল, রাজপুত্তুরের যে খোঁড়া পা। পক্ষীরাজের পিঠ থেকে নামিয়ে

দিলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। রাজবৈদ্য দেখে বললেন, সর্বনাশ। পায়ে যে কুষ্ঠ হয়েছে। নিচে থেকে পচছে।

আর্তস্বরে স্বাতি বলল : কী বলছ এসব ?

সে কথার উত্তর না দিয়ে বললুম : উল্টোধার থেকে একটা জোয়ান আসছে চাষাড়ে গোছের, শক্ত সমর্থ সবল চেহারার পুরুষ। দুপদাপ করে নেমে পড়ল তেপান্তরের মাঠে। কী করে পার হবে! তার পক্ষীরাজ কোথায়! নাই বা থাকল! সুস্থ দেহ আছে, সাহসী মনও আছে। তেপান্তরের মাঠ কি সে পেরতে পারবে না ? দেখতে পেয়ে রাজা বলল, সাবাস। রাণী বলল, ওর একটা পক্ষীরাজ নেই ? আর রাজকন্যা কী বলল বলতো ?

লোকটা বেদম বোকা।

ঠিক বলেছ। রাজকন্যা অমন করে চেয়ে আছে অথচ তাকে দেখতেই পেল না!

রাজকন্যার যেন খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই।

তবে বোকা বললে কেন ?

আমার পক্ষীরাজ ঘোড়াটার পাশ দিয়ে গেল, খোঁড়ার কাছ থেকে ঘোড়াটা কেড়ে নিতে পারল না ?

রাজপুত্রের সেপাই শান্ত্রী যে বল্লম হাতে পাহারা দিচ্ছে। হাত বাড়ালেই পেট ফুটো করে দেবে!

স্বাতি বলল : হুঁ।

সেই সঙ্গেই যেন একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ পেলুম। স্বাতি কি দুঃখ পেল! হেসে বললুম : লোকটা বড়ই বেরসিক। রাজকন্যার দিকে একবারটি তার চাওয়া উচিত ছিল। কী বল ?

চায় নি আবার! খানিকটা এগিয়েই সুড় সুড় করে ফিরে আসবে।

আর তারপর—

তোমার কি আর কিছু বলার নেই ?

না।

আমার কী মনে হচ্ছে জান? তুমি আজ কোন নেশা করেছ।

আজ নয়, দিন কয়েক আগে। মনে হচ্ছে, এ নেশার ঘোর সহজে কাটবে না।

প্রহারে সব নেশাই ছুটে যায়। তোমার তাই দরকার হয়েছে। বাবাকে বলব?

কেন নেশা হল সেটাও বুঝিয়ে ব'লো।

তুমি ব'লো।

তাহলে মামা উল্টো বুঝবেন। ভাববেন তাঁর মেয়েই নেশা করেছে।

স্বাতি উঠে দাঁড়াবার ভান করে বলল ঃ আমি চললাম।

যেতে চাইলেই কি যাওয়া যায়? তার চেয়ে এস, আমরা অন্য কথা বলি।

স্বাতি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল, বলল ঃ আর কোনদিন তোমার সঙ্গে বেরব না।

আমাকে হাসতে দেখে বলল ঃ কান্তি নাথকে তোমার কী রকম মনে হয়?

পাকা লোক। বিনে পয়সায় ও পৃথিবী ঘুরে আসতে পারবে। ও যদি আমাদের সঙ্গী হয়, তাহলে আর কোন ভাবনা থাকবে না।

আর কিছু তোমার মনে হয় নি?

আর কী মনে হবে?

তবে থাক। আমার ধারণার কথা তোমার ওপরে চাপাব না। তোমার নিজের কিছু মনে হলে ব'লো।

তথাস্তু।

বাহিরে মনে হল, কান্তি নাথের গলা শুনতে পেলুম। কাউকে ধমকাচ্ছেন। আমার সঙ্গে স্বাতিও উঠে দাঁড়াল। বেরিয়ে দেখি সত্যিই কান্তি নাথ। চটে মোড়া বড় বড় দুটো বোঝা কুলির মাথায়

চাপিয়ে উপরে তাঁর ঘরে নিয়ে যেতে বলছেন। কুলি দুটো বুঝতে পারে নি বলেই দাঁড়িয়ে বকুনি খাচ্ছে। আমাকে দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন : এই যে গোপালবাবু, দুখানা কার্পেট কিনেছি। আমাদের ঘরে কোথাও রাখিয়ে দিন। আমি এখুনি আসছি।

বেশ তো।

ব'লে আমরা দুজনে কুলিদের সঙ্গে উপরে এলুম। মামা তখন ঘুমিয়ে উঠে পাইপ ধরাচ্ছেন, মামী শুয়ে আছেন। ঘরের ভিতর স্থানাভাব, তবু কোন রকমে কার্পেট দুটো রাখা হল। স্বাতি মামাকে বোঝাতে লাগল যে জিনিস আমাদের নয়, তা কান্তি নাথের। আর আমি তাঁর দেখা না পেয়ে নিজের পকেট থেকেই কুলির পয়সা বার করে দিলুম।

কান্তি নাথ এলেন অনেকক্ষণ পরে। বললেন : ঘরের বাইরে বেরলে সব দিকে সমান নজর দরকার।

মামা বললেন : তা দরকার বৈকি।

আপনাদের রিজার্ভেশনটাও দেখে এলুম। চার বার্থের একটি কামরা দিচ্ছে। বলে এলুম, চাকার ওপরে যেন না দেয়। একে ছোট লাইনের গাড়ি, তাতে চাকার ওপরে হলে রাতে একেবারেই ঘুমতে পারবেন না।

মামা অভিভূতের মতো আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমি বললুম : এ একটা নতুন শিক্ষা দিলেন।

হাসতে হাসতে কান্তি নাথ বললেন : চা খেয়েছেন ?

কোথায় আর খেলুম !

কান্তি নাথ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন : এইখানেই পাঠিয়ে দিই। চায়ের সঙ্গে আর কী দেবে ? কাটলেট ?

উত্তরের অপেক্ষা না করেই আবার বেরিয়ে গেলেন। মামা আর একবার আমার মুখের দিকে তাকালেন।

কান্তি নাথ একটু দেরিতেই ফিরলেন। সঙ্গে দুজন বেয়ারা।

তারা চা এনেছে। মামা ব্যস্ত হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই ভদ্রলোক বললেন : গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, চা খেয়ে আমরা বেড়াতে বেরব।

মামী উঠে এসেছিলেন, বললেন : ওমা, এত সব কে খাবে!

বলে কান্তি নাথকেই প্রথমে এগিয়ে দিলেন।

ভদ্রলোক যেন শিউরে উঠলেন। বললেন : না না, আমাকে না। আমাব দুপুরের খাওয়া আজ বেশি হয়ে গেছে।

তারপব খাওয়াটা কেন বেশি হল, সেই গল্প আমাদের শোনালেন। যেখানে গিয়েছিলেন, সেখানকার বড় সাহেব তাঁকে লাঞ্চে ডেকে-ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর এক পুবনো বন্ধুকে নেমন্তন্ন করেছিলেন। বড় হোটেল, প্রচুর খাদ্য। অথচ বন্ধুটি যে ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার রুগী, তা তাঁর জানা ছিল না। কাজেই—

চা তৈরি কবে স্বাতি কান্তি নাথকেই প্রথমে দিল। ভদ্রলোক নির্লিপ্তভাবে বললেন : আবাব চা! চা বড় লোকসান করে।

স্বাতি কাটলেটের প্লেটও একখানা এগিয়ে দিল।

খেতে খেতে কান্তি নাথ কার্পেটের গল্প আমাদের শোনালেন। ব্যাঙ্গালোরে ভাল কার্পেট তৈরি হয়। সস্তাও বেশ। তাঁর মেয়ের ফরমায়েশ ছিল। মেয়ে-জামাই বড় শৌখিন। তাই ভাল জিনিসই কিনতে হয়েছে।

মামীব যে আবও কিছু জানবাব ইচ্ছে হয়েছে, তা তার মুখ দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম। জিজ্ঞাসা করলুম : কোথায় কিনলেন?

দোকানে নয়, একেবারে ফ্যাক্টরি থেকে। আমার বন্ধুটিই জুটিয়ে দিলেন। বাজারেব চেয়ে অনেক সস্তা পড়ল।

কী রকম

এই ধরুন, একশো টাকার কমে আমি যা নিলুম, বাজারে তাব দাম সোয়া শো টাকার বেশিই হবে।

সাইজ ?

নয় বাই বারো।

গল্পে গল্পে কান্তি নাথ কাটলেটের প্লেটখানা শেষ করে ফেললেন। তিনখানা কাটলেট। সঙ্গে দু পেয়ালা চা।

কিন্তু মামী রসভঙ্গ করলেন। কিছুতেই বেরতে রাজী হলেন না। তাঁর চোখের দিকে চেয়ে মামাও জোর করতে সাহস পেলেন না। হতাশ ভাবে কান্তি নাথ বললেন ঃ গাড়িটা তবে ছেড়েই দিই।

মামা আমাকে বললেন ঃ ড্রাইভারকে কিছু বকশিস দিয়ে দিও।

না না, সে আমার কাজ, আপনাদের নয়।

বলে কান্তি নাথ বেরিয়ে গেলেন।

স্বাতি আমাকে ইশারা করল। বুঝতে পারলুম যে তাঁকে লক্ষ্য করবার দরকার আছে। নিঃশব্দে আমি তাঁকে অনুসরণ করলুম।

কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হল। ভদ্রলোক ঘনিষ্ঠভাবে ড্রাইভারের কাছে গেলেন, তার পিঠে হাত রেখে কিছু বললেন, তারপর দরজা খুলে ভিতরে বসিয়ে দিলেন।

গাড়ি চলে যাবার পর ভদ্রলোক হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেলেন এবং নিশ্চিন্ত মনে পায়চারি করতে লাগলেন। ভাবলুম এবারে ফিরে যাই, কিন্তু পা আমার সরল না। চোখের দৃষ্টি তাঁরই দেহে আটকে রইল। কান্তি নাথ একবার তাঁর নোটবুক বার করলেন পকেট থেকে। কী যেন দেখলেন, মনে হল হাসলেনও একটুখানি। কিন্তু স্টেশনে ফিরলেন না।

এক সময় অন্ধকার হল। স্টেশনের বাতি উজ্জ্বলতর হল। ভদ্রলোক ফিরলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করে উপরে এলুম।

মামা ব্যস্ত হয়েছিলেন, কিন্তু কিছু বলবার সুযোগ পেলেন না। কান্তি নাথ বললেন, মাইসোরে আপনার থাকবার ব্যবস্থা করে দিলুম। ভাল রিটায়ারিং-রুম আছে। দুখানা ঘর নেবেন। ভাল ব্যবস্থা।

মামী বললেন ঃ এ রকম ঘর নয় তো ?

বাঙলায় প্রশ্ন করেছিলেন আমার দিকে চেয়ে। আমি তাঁর উত্তর দিলুম বাঙলায়ঃ এ রকম হলে কোন ভাল হোটেলে উঠব।

মামী বোধহয় কিছু আশ্বস্ত হলেন।

এই কান্তি নাথের সঙ্গে আমরা আর অল্প সময় আছি। রাত নটায় উনি মাদ্রাজ মেলে উঠবেন। তারপর গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক এক্সপ্রেসে চড়ে দিল্লী। দুদিনের পথ। আমরা রাত দশটার পরে প্যাসেঞ্জার ট্রেনে চড়ে ভোরবেলায় মহিসুর পৌঁছব। তার আগে আমাদের খেয়ে নিতে হবে। সময়মতো কান্তি নাথই আমাদের এই কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

আটটার আগেই মামা বললেন ঃ ও ল্যাটা চুকিয়ে ফেলা ভাল।

মামী বললেন ঃ তোমরা গেলো।

এ রাগের কথা। কারণটা স্বাতি বোধহয় অনুমান করেছে। তাই মুখ টিপে হাসল।

কান্তি নাথ বলল ঃ আর দেরি করবেন না। স্টেশনের ব্যাপার।

টেবিলে বসে মামা বললেন ঃ আপনি কী খাবেন বলুন।

না না, আমাকে আর খেতে বলবেন না। আমি তাহলে মরে যাব।

সে কি কথা। কিছু একটু খান।

ভদ্রলোক আর আপত্তি করলেন না, বললেন ঃ নিতান্তই যখন বলছেন, তখন একটু স্যুপ, আর এক পেয়ালা কফি।

কান্তি নাথের স্যুপ এল, তারপর চিকেন রোস্ট আর ফ্রাইড ফিশ। পুডিংএর পর দু পেয়ালা কফি খেয়ে ডিনার শেষ করলেন। মামী আজ দূরে বসে ছিলেন। তাঁর ক্ষিধে নেই। মামা বলেছিলেন ঃ টেবিলে মুর্গি উঠেছে, ক্ষিধে আর কী করে হয় বল।

তিনি খেতে বসলে আমরা নিশ্চয়ই মুর্গি খেতুম না।

কান্তি নাথের ইচ্ছায় উপর থেকে মালপত্র আমাদের একসঙ্গেই নামল। বড় লাইনের গাড়িতে তাঁর মাল উঠল। আমাদের উঠল ছোট লাইনের গাড়িতে। কুলিরা দুবারে তাদের কাজ সারল। মামা যখন তাদের পয়সা মেটাচ্ছেন, আমি দেখলুম, কান্তি নাথ তখন আমাদের গাড়ি পরিষ্কার করাবার জন্য একজন লোক ধরতে গেছেন।

খুব আস্তে আস্তে স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: ভদ্রলোক শুনেছিলাম সরকারের পদস্থ কর্মচারী!

ঠিকই শুনেছ। চাবির রিঙে একটি মোহরের মত চাকতি আছে। রেলওয়ে বোর্ডের কোন অফিসারের। ঘরের ভাড়াও লাগছে না, গাড়ি ভাড়াও না।

স্বাতি হেসে উঠতে পারল না। সেই চেষ্টায় আমি বেদনার সঙ্কেত পেলুম।

১০

ব্যাঙ্গালোর একটা অদ্ভুত জংসন স্টেশন। শুধু বড় লাইন নয়, ছোট লাইন আছে দুরকমেব। মিটার গেজ ও ন্যারো গেজ। যে সব ছোট গাড়ি পাহাড়ে ওঠে, তাও আছে ব্যাঙ্গালোবে। এখান থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত বড় লাইন। খানিকটা দূরে বঙ্গারাপেট জংসন। ব্যাঙ্গালোর থেকে বঙ্গাবাপেট পর্যন্ত একটা খেলনার মতো গাড়ি খানিকটা ঘুরে কোলারের সোনার খনির উপর দিয়ে নিয়মিত যাতায়াত করে। এ ছাড়াও আরও তিনটে দিক আছে—মহিস্নুরের দিক, পুণার দিক আর সেকেন্দ্রাবাদের দিক। এই লাইনগুলো শিরার মতো দক্ষিণ থেকে উত্তরে উঠেছে। আমরা দক্ষিণে যাচ্ছি মহিস্নুরেব দিকে।

সবাই এক গাড়িতে উঠেছি। নিশ্চিন্ত মন। পাইপ ধরিয়ে মামা বললেন ঃ গোপাল খুব ফাঁকি দিচ্ছ।

ফাঁকি দিচ্ছি!

দিচ্ছ না! ঐ কান্তি নাথকে এগিয়ে দিয়ে নিজে কিছুই করলে না।

উত্তরে আমি হাসলুম।

মামা বললেন ঃ হাসি নয় গোপাল, এত কষ্ট করে এত দূরদেশে এসেছি। তোমাব লালবাগের হাওয়া খেয়ে আর সিল্কের শাড়ি কিনে দেশে ফিরতে চাইনে। কিছু দেখতে শুনতেও চাই।

স্বাতি বলল ঃ মহিস্নুবেব ইতিহাসই গোপালদা এখনও শোনায় নি।

মহিস্নুরের আর ইতিহাস কী, মহিস্নুরের হল গল্প। হায়দর আলি আর টিপু সুলতানের গল্প। ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক মানচিত্রে

মহিসুরের নাম দেখি অষ্টাদশ শতাব্দীতে। শ্রীরঙ্গপত্তন প্রসঙ্গে সে গল্প বলা যাবে।

এই দেশটার তো একটা নাম ছিল!

ছিল বৈকি। কিন্তু দেশটাব আকার আকৃতি ঠিক একই রকম ছিল না। কখনও নাম আছে, কখনও নেই।

স্বাতি বাধা দিল, বলল: দেশের একটা নাম নেই, এও কি হ'তে পাবে!

কেন পারে না? ১৯৪৭-এব আগে পাকিস্তান নাম কোথায় ছিল?

মামা ইশাবায় আমাকে বলবার নির্দেশ দিলেন। বললুম: খ্রীষ্টের জন্মেব আগে বিদর্ভ নামে একটা দেশ ছিল। বিন্ধ্য ও সাতপুরাব দক্ষিণে, তাপ্তি ও গোদাববীব উপত্যকায়। পশ্চিমে মহাবাষ্ট্র। অন্ধ্র ও কলিঙ্গ ছিল দক্ষিণ পূর্বে, তুঙ্গভদ্রাব উত্তবে। একেবাবে দক্ষিণে দেখি কেরল পাণ্ড্য ও চোল। কাবেবী ও তুঙ্গভদ্রার মধ্যে আজকের মহিসুবেব কোন নাম দেখতে পাইনে। মৌর্যযুগে চোল রাজ্য এই ভূখণ্ডকে গ্রাস করেছিল। গুপ্ত বাজাদেব সময়েও তাদের আধিপত্য ছিল অপ্রতিহত। ভারতের মানচিত্রে তখন নতুন কয়েকটি নাম ছিল— বাকাটক রাষ্ট্রিক কদম্ব বেঙ্গী। এ সবই ছিল তুঙ্গভদ্রার উত্তরে। নিচে গঙ্গা। ইতিহাসেব ছাত্র এই অজ্ঞাত যুগ নিয়ে গবেষণা কববে।

ইতিহাসের যুগে দাক্ষিণাত্যে তুটি বাজ্য পবাক্রান্ত হয়ে উঠল। উত্তবে চালুক্য ও দক্ষিণে পল্লব। ক্ষমতার জন্য তাদেব যুদ্ধের শেষ ছিল না। অবশেষে গোদাববী ও কৃষ্ণাব সীমানা পর্যন্ত অধিকার করে চালুক্যরা ক্ষান্ত হল। অষ্টম শতাব্দীতে আবও অনেক বাজ্য দেখা দিল। রাষ্ট্রকূট যাদব কদম্ব ও কাকতীয়রা চালুক্য রাজ্যে ক্ষমতাশালী হযে উঠল। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল রাষ্ট্রকূটেব সঙ্গে চালুক্যদের। উত্তরে মালব থেকে দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা পর্যন্ত তারা আধিপত্য বিস্তাবের চেষ্টা কবেছিল। কিন্তু তাদের ক্ষমতা স্থায়ী হয় নি।

পল্লবরা শক্তিহীন হল নবম শতাব্দীর মধ্য ভাগে। চোলরা এরই অপেক্ষায় ছিল। দেখতে দেখতেই মহিসুর মালভূমি পর্যন্ত তাদের রাজ্য বিস্তার করে ফেলল।

আলাউদ্দীনের সেনাপতি মালিক কাফুর যখন দাক্ষিণাত্য বিজয়ে এল, এ দেশ তখন ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে গেছে। যা একটু শক্তি ছিল তা দেবগিরির যাদব ও ওরঙ্গলের কাকতীয়দের। তবু তারা মুসলমান বিজয় ঠেকাতে পারল না।

চোল রাজ্য ধ্বংস হয়েছিল দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে। মহিসুর মালভূমিতে নতুন রাজ্য হল হয়শাল। আর কাবেরীর দক্ষিণ থেকে উত্তর পেন্নার পর্যন্ত পাণ্ড্য রাজ্যের অধিকার বিস্তৃত হল। কিন্তু এরাও পারল না মালিক কাফুরকে বাধা দিতে। সেই দিগ্বিজয়ী বীর দিল্লী থেকে মাদুরা পর্যন্ত সমস্ত দেশ তার মালিকের পদানত করে গেল।

মুসলমান সাম্রাজ্যের পতন শুরু হল চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে, এবং শতাব্দী শেষ না হতেই এই পতন সম্পূর্ণ হয়ে গেল। দক্ষিণে অভ্যুত্থান হল দুটি রাজ্যের—বাহমনি ও বিজয়নগর। উত্তরে বিন্ধ্য ও দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা হল বাহমনি রাজ্যের সীমা। আর বিজয়নগর তার দক্ষিণের সমগ্র ভূখণ্ড। দু'দেশে অবিরত যুদ্ধ হত রায়চুর দোয়াবের অধিকার নিয়ে। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে বাহমনি রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল—বিদর বিজাপুর গোলকুণ্ডা আহমদনগর ও বেরার। এরাই আবার নিজেদের শত্রুতা ভুলে বিজয়নগরের বিরুদ্ধে সমবেত হল তালিকোটের মাঠে। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগর ধ্বংস হয়ে গেল। মহিসুরের মালভূমি এল বিজাপুরের কবলে।

এর পর নিজাম ও মারাঠা শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এদের দক্ষিণে কর্ণাট ও মহিসুর। ভারতের উপকূলে তখন ইংরেজ ও ফরাসীর পদার্পণ ঘটেছে।

স্বাতি হঠাৎ একটা হাই তুলল।

বললুম ঃ ঘুম পাচ্ছে ?

মামা হেসে বললেন ঃ ইতিহাসের নাম শুনলে ওর দিনের বেলাতেও ঘুম পেত।

বললুম ঃ এটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ। রাতে ঘুম না পেলে একখানা ইতিহাসের বই টেনে নিও।

আর ঘুম পেলে ?

খুকু ঘুমলো পাড়া জুড়লো, বর্গী এল দেশে।

বর্গী তো সারাক্ষণই সঙ্গে আছে।

মামা হেসে উঠলেন। কিন্তু মামী হাসলেন না। এই রকমের অন্তরঙ্গ আলাপকে যে তিনি ভয় পান, তার পবিচয় তিনি অনেকবার দিয়েছেন। আমি উত্তব দেব না ভেবেছিলুম, কিন্তু স্বাতি বলল ঃ চুপ করলে যে ?

বললুম ঃ আমার কথাটি ফুরলো।

কিন্তু নটে গাছটি যে মুড়োয় নি।

মামা বললেন ঃ তোমরা কি আজকাল হেঁয়ালিতে কথা বল ?

বললুম ঃ স্বাতি বলে, এতে বুদ্ধির দরকার। আমাব বুদ্ধির পরীক্ষা করছে।

স্বাতি আপত্তি জানাল ঃ পরীক্ষা আমি করছি, না তুমি ?

মামা বললেন ঃ বুঝেছি। সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলি।

খিলখিল করে স্বাতি হেসে উঠল।

ভেবেছিলুম আমি পরিত্রাণ পেয়েছি। আর আমাকে ইতিহাস শোনাতে হবে না। কিন্তু এ যে কত বড় ভুল তা পরের মুহূর্তেই বুঝতে পারলুম। মামা বললেন ঃ ইতিহাসটা তুমি গোপাল নমো নমো করেই সারলে।

বললুম ঃ বাদ তো কিছুই দিই নি !

তা হয়তো দাও নি। কিন্তু এত সংক্ষেপে সারলে যে রস পুরো পেলুম না। এই ধর, রামায়ণ মহাভারত পুরাণের কথা কিছুই বলো নি।

কিছুই যে জানি নে। শুধু এইটুকু জানি যে এই দেশটা সুগ্রীবের রাজ্য ছিল। বালির রাজ্য কিষ্কিন্ধ্যা যে বর্তমান হায়দ্রাবাদ রাজ্যে পড়েছে, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। রামায়ণে বর্ণিত অনেক স্থান খুঁজে পাওয়া গেছে। পম্পা নদী হল আজকের তুঙ্গভদ্রা, তারই কাছে পম্পা সরোবর। অঞ্জনা পাহাড় মতঙ্গ পর্বত।

মামী হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন ঃ এসব আমরা দেখতে পাব ?

একটা গোটা দিন সময় লাগবে।

মামা বললেন ঃ কেমন ?

আমরা হায়দ্রাবাদের পথে ফিরব। গুন্টাকলে নেমে হস্পেট যেতে হবে। সেখানে শুধু কিষ্কিন্ধ্যা নয়, বিজয়নগরের ধ্বংসস্তূপও আছে। রুইন্স্ অব হাম্পি।

স্বাতি বলল ঃ নামটা যেন শোনা শোনা লাগছে।

লাগবেই তো। ঐ ধ্বংসস্তূপ পড়ে না থাকলে বিজয়নগরের কথা আমরা ভুলে যেতুম। হিন্দুর সেই স্বর্ণযুগের মহিমা ইতিহাসের পাতায় ধরা পড়ে নি। শুধু কিছু ভাঙা ইঁট পাথর আজ তার সাক্ষী দিচ্ছে।

ভাঙা ইঁট পাথর ব'লো না, বল ভাঙা মন্দির আর সৌধ।

এই মন্দির আর সৌধ আছে বলেই দক্ষিণ ভারতের রাজবংশগুলি উজ্জ্বল হয়ে বেঁচে আছে। কী অপূর্ব সৌন্দর্যচেতনা! কী গভীর ধর্মানুরাগ! স্থাপত্যেব এমন উৎকৃষ্ট উদাহরণ ভারতের আর কোনখানে নেই।

স্বাতির চোখের দিকে চেয়ে আমি থেমে গেলুম। আমার উচ্ছ্বাস সে বুঝি উপভোগ করছিল।

চিন্তিতভাবে মামা বললেন ঃ ঠিকই বলেছ। উত্তর ভারতেও তো অনেক মন্দির আছে, কিন্তু ঠিক এমনটি বোধ হয় কোথাও দেখি নি। বৈদ্যনাথ বল, বারাণসী বল—

কথার মাঝখানেই স্বাতি বলল: কেন, কোনারকের ভুবনেশ্বরের মন্দির!

মাথা নেড়ে মামা বললেন: তা বটে।

বললুম: এবারে হয়শাল রাজবংশের তৈরি তিনটি মন্দির দেখুন, সোমনাথপুর বেলুর আর হালেবিদে। তারপরে তুলনা করবেন।

স্বাতি বলল: আবু পাহাড়ে দিলওয়ারার মন্দির না দেখে বিচারের রায় দেওয়া উচিত হবে না।

সব দেখেই দিও। ফার্গুসন সাহেবও তাঁর রায় দিয়েছেন। সেটাও মিলিয়ে নিও।

ঠিক এই সময়ে যেন একটুখানি ঝাঁকি লাগল। মনে পড়ল যে আমরা এতক্ষণ ট্রেনের কামরার ভিতর বসে গল্প করছি। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মেই ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। এইবারে বুঝি চলতে শুরু করল।

মামী বললেন: আর গল্প নয়, রাত অনেক হয়েছে।

তা সাড়ে দশটা হবে। ভোর সাড়ে পাঁচটায় মহিসুর। শুয়ে পড়বার সময় হয়েছে বৈকি। মামার পাইপে আগুন ফুরিয়ে গিয়েছিল। ঠুকে ঠুকে ছাইটা ঝেড়ে ফেললেন। বললেন: সেই ভাল। কাল আবার কথা হবে।

স্বাতি আমার দিকে তাকাল। তার দৃষ্টিতে কি কোন কথা নেই।

১১

পৃথিবীটা যে ছোট নয়, ঘরের বাহিরে পা না দিলে তা বোঝা যায় না। আর বোঝা যায় না মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তার কথা। ইটের দেওয়াল ঘেরা ঘর আর বারান্দায় ঘুরে আপনজন মনে হয় শুধু স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে। পরিবারের আর পাঁচজনকেও অনেক সময় অবান্তর মনে হয়। গ্রামের ভাঙা বাড়িতে শুনেছি আত্মীয়তাব গণ্ডি এমন সংকীর্ণ নয়। পথে বেরিয়ে আত্মীয়ের সংখ্যা বাড়ে, আর বিদেশে বেরিয়ে দেখি বসুধৈব কুটুম্বকম্। মনে হয় পৃথিবীটাই নিজের ঘর, আর মানুষ মানেই আত্মীয়।

তাই মহিসুরের রিটায়ারিং-রুমে স্বাতি যখন তাপ্তির সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলল, আমি একটুও আশ্চর্য হই নি। তাপ্তি কুর্গের মেয়ে। মার্কারা থেকে মহিসুর এসেছে বাসে, দিন তিনেক এখানে কাটিয়ে অন্য কোথাও যাবে। হোটেলে উঠতে পারত, কিন্তু স্টেশনটা তার কাছে বেশি নিরাপদ মনে হয়েছে। আগে ভাগে মাদ্রাজের একখানা টিকেট কেটে রিটায়ারিং-রুমের একখানা বেড দখল করেছে।

আমরা একখানা ঘর খালি পেয়েছি, তাতে দুখানা বেড। মেট্রন বললে, স্বাতিকে একখানা বেড দিতে পারে পাশের ঘরেব মেয়েটির সঙ্গে।

মামা বললেন : গোপালের কী হবে ?

ব্যবস্থা একটা হবেই। সারাদিন আর কিছু খালি না হলে একটা অতিরিক্ত বিছানা দেওয়া যাবে এক টাকায়। মাটিতে শোওয়া সম্ভব হবে।

বললুম : চমৎকার।

স্বাতি গেল পাশের ঘরের মেয়েটির সঙ্গে ভাব করতে। আমি

বলেছিলুম ঃ একটু পরে যেও। এত সকালে তাকে বিরক্ত করা উচিত হবে না।

স্বাতি ফিরেই আসত, কিন্তু মেয়েটিকে বারান্দায় দেখে এগিয়ে গেল।

মামী স্নানের আর প্রসাধনের ঘর দেখে ফিরে আসছিলেন। বললেন ঃ ঘর দোর খারাপ নয়, কিন্তু ব্যবস্থাটা ভাল হল না।

মামা একখানা বেতের আরাম চেয়ারে বসে পাইপ ধরাচ্ছিলেন, বললেন ঃ কেন?

স্বাতি অন্য ঘরে শোবে। তাও অন্য মানুষের সঙ্গে।

সে তো পাশের ঘরেই, আর একটা মেয়ের সঙ্গে। ও মেয়েটা তো একাই আছে।

ওদের আলাদা কথা।

আলাদা কেন?

আমাদের সমাজে—

বাধা দিয়ে মামা বললেন ঃ এও তো আমাদেরই দেশ!

মামার কথায় আমি আশ্চর্য হলুম।

বাঙলা দেশ থেকে এত দূরে এসেও যদি আমরা এস্থানকেও নিজের দেশ ভাবি, তাহলে মন আর আমাদের খাঁচার মধ্যে বন্ধ থাকবে না। প্রাদেশিকতার ক্লেদ থেকে আমরা অনায়াসে মুক্তি পাব। ভারতের কল্যাণের জন্যই আজ এই মুক্তির প্রয়োজন।

মামী উত্তর দিলেন মামার কথার, বললেন ঃ তবে আর কী! ঘরবাড়ি করে এদেশেই থেকে যাও।

মামা বললেন ঃ সে কিছু নতুন হবে না। এ-দেশেও অনেক বাঙালী আছে।

তারপরে আমার দিকে ফিরে বললেন ঃ বুঝলে গোপাল, দিল্লীতে দেখছি কালনেমির লঙ্কা ভাগ হচ্ছে। সবই স্বার্থের ব্যাপার। দেশের জন্যে প্রাণ কাঁদে, এমন মানুষ আর কটা আছে! মুখে কাঁদলেই

হল। বড় গোঁফ রেখে ঠোঁটের হাসিটি শুধু আড়াল করতে হবে। ভাল করে দল পাকাও, তাদের লোভ দেখাও পয়সা আর প্রতিপত্তির। বড় বড় প্রদেশগুলো দুভাগ হবে তোমার জন্যে। উঁচু উঁচু গদি পাবে, খাতির খেতাব খেয়ে ফুরবে না। আর কী চাই!

এ নিশ্চয়ই আপনার রাগের কথা।

বেশ তো, নিজের চোখে দেখেই বিশ্বাস ক'রো। দিল্লীতে এলে আমি তোমায় সবই দেখাব।

একটু থেমে বললেন: আমার কথাই ধর না। কোন কালে আমি দেশসেবা করেছি, না আমার বাপ পিতামহ করেছে! দেশসেবার নামে তো প্রজা ঠেঙিয়েছি, আর—

কথাটা মামা শেষ করলেন না।

জিজ্ঞাসা করলুম: আর কী?

থাক সে কথা। যা বলছিলুম সে হল অন্য কথা। আজ আমিও জুটেছি দিল্লীর দরবারে। কোন্ গৌরবে জান? মোটা চাঁদা দিই, পিছনে দল আছে। ভেবেছ বোকার মতো খরচ করছি! তাহলে তুমি অঘোর গোস্বামীকে চেন না।

মামার মুখে একরকমের অদ্ভুত হাসি দেখলুম। পরম ঘৃণায় মানুষ এমনি করে তাকায়, কিন্তু হাসে না। মামা হেসে বললেন: বাণিজ্যের সুবিধা হয় গোপাল, দালালের কাজটা নিজেই করতে পারি। দরবারের টিকিট হল সরকারের ছাড়পত্র। অঘোর গোস্বামী এম.পি.র পারমিট সরকারী দপ্তর থেকে সুড়সুড় করে বেরোয়। আড়ালে ওরা বলে, গান্ধীটুপিকে বিশ্বাস নেই। কে কার কুটুম বেরিয়ে পড়বে, শেষটায় চাকরি নিয়ে টানাটানি। দিয়ে দাও পারমিট। কালোবাজার তো আমরাই বাঁচিয়ে রেখেছি।

মামী বিরক্ত হচ্ছিলেন, বললেন: যা-তা কী বলছ এসব?

উত্তর না দিয়ে মামা পাইপের ধোঁয়া টানতে লাগলেন।

মামার ক্ষোভের কারণ আমার অজ্ঞাত। মনে হল, খুব ধাক্কা-

খাওয়া মানুষ। সমাজটাকে তাই বাঁকা চোখে দেখছেন। বাঁকা চোখে আজকাল অনেকেই দেখে। বাঁকা দৃষ্টি নিয়েই তারা জন্মায়। কিন্তু মামার কথা স্বতন্ত্র বলেই আমি বিস্মিত হলুম।

কাপড় গামছা নিয়ে মামী স্নানের ঘরে চলে গেলেন। মামাও মুখ থেকে পাইপ নামালেন। বললেন: ঐ মেয়েটা কি কখনও আমাদের সমাজে মিশতে পাবরে? কখন না! ও যাতে কারও সঙ্গে মিশতে না পারে, তার জন্যে সকলেই সতর্ক আছে। লেখাপড়া শিখলেও ওকে ওরই সমাজে বিয়ে দিয়ে দেবে। চাকরি করতে চাইলে বলবে, নিজের দেশে কর। আব এই নিজের দেশ তো ভারতবর্ষ নয়, মহিসুরও নয়। একটুখানি দেশ কুর্গ। শৈশব থেকেই ওকে শেখানো হচ্ছে যে তার নিজের দেশ হল কুর্গ। এই দেশেতেই জন্ম, যেন এই দেশেতেই মরি। ইংরেজরা যখন এই শিক্ষা দিত, তখন তার একটা অর্থ ছিল। ভাবতবর্ষ নামে একটা বিবাট দেশ গড়ে উঠলে, তেত্রিশ কোটি লোক সামলাবে কে! তার চেয়ে যত পার গণ্ডি টানো, বিবাদ বাধাও, লাঠালাঠি দাঙ্গা-হাঙ্গামা। হিন্দু-মুসলমানে, বাঙালী-বিহারীতে, কমুনিষ্ট আব কংগ্রেসীতে। ভুলিয়ে দাও যে তারা এক দেশের লোক।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মামা বললেন: আজও আমরা ভুলে আছি। ভুলে থাকতেই হবে। তা না হলে অনেকের স্বার্থে যে বড় আঘাত লাগবে।

মামা খানিকক্ষণ পাইপে ধোঁয়া টানলেন, তারপব বললেন: আচ্ছা গোপাল, দেশ স্বাধীন হবার পর কোন বড় স্বার্থত্যাগের কথা তুমি কাগজে পড়েছ?

চট করে আমার কোন উত্তর মনে পড়ল না। কিন্তু মামা বললেন: আমি পড়ি নি। কেউ বলে নি যে আমাব গদিটার দরকার নেই, পাশের ভদ্রলোকই আমার কাজটা চালাতে পারবেন। গদিটার তো অনেক দাম, দেশের নেংটে লোকের ট্যাক্স কিছু কমবে।

মামা হয়তো আরও অনেক কিছু বলতেন। কিন্তু তার সুযোগ হারালেন। নিচের রিফ্রেশমেন্ট-রূম থেকে দুজন বেয়ারা অনেক জিনিসপত্র এনে টেবিলে রাখল। স্নানের ঘর থেকে মামীর বেরতে যে সময় লাগবে, মামা তা জানতেন। তাই স্বাতির খোঁজ করলেন: মেয়েটা কী করছে?

বললুম: ডেকে আনি।

কিন্তু আমাকে উঠতে হল না। স্বাতি নিজেই এল। বোধহয় সে চায়ের সরঞ্জাম দেখতে পেয়েছিল। বলল: বাবা, একজন ভাল সঙ্গী পাওয়া গেল।

সত্যি নাকি!

হ্যাঁ বাবা, ঐ মেয়েটাকে আমরা সঙ্গে নিয়ে বেরব। আমি বলে এসেছি। একা যে ওর অসুবিধা হচ্ছিল, তা কিছুতেই স্বীকার করবে না। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি।

মামা বোধহয় মামীর কথা ভেবে সম্মতি দিতে পারছিলেন না। সন্দেহ করে স্বাতি বলল: হিন্দু মেয়ে বাবা, মা রাজী হবেন।

জাতিভেদ যে হিন্দুদেরই, সে কথা আমি মনে করিয়ে দিলুম না। খ্রীষ্টান ও মুসলমান সমাজে অস্পৃশ্য নেই, অস্পৃশ্য হিন্দুসমাজের গৌরব। গান্ধীজী সেই অহংকার ভাঙতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ কি সফল হয়েছেন! কুসংস্কারে মানুষের আদিম অভিরুচি, প্রবৃত্তি তার সংস্কারবিরোধী। প্রবৃত্তিকে যে জয় করে সে তো মানুষ নয়, অতিমানুষ। পুরাণে সে দেবতা। ভারতবর্ষে একদিন তেত্রিশ কোটি দেবতা ছিল, আজ কি একটিও নেই!

মামা আমার দিকে চেয়ে বললেন: গোপাল কী বল?

স্বাতি আমাকে উত্তর দিতে দিল না। বলল: বুঝলে গোপালদা, মেয়েটা অদ্ভুত ভাল আর ভদ্র। লেখাপড়াও অনেক করেছে। বলছিল, এদেশের স্থাপত্য নিয়ে পড়াশুনো করছে। টেবিলের ওপর ওর বইগুলো দেখলে তুমিও ভয় পাবে।

গম্ভীরভাবে বললুম : আমরা স্বাধীন দেশের লোক ... পেলে কোন কাজ করি না। আমার সমর্থন যদি পেতে ... বইগুলো আমাকে দেখাতে হবে।

তাই হবে।

মামা বললেন : বখরার ব্যবস্থাটা আড়ালে করতে হয়, তুমি এখনও কাঁচা আছ।

স্বাতি তখন চা ঢালতে বসেছে। বলল, তাপ্তি বলছিল, ও এখান থেকে হাসান নামে একটা স্টেশনে যাবে। সেখান থেকে বেলুর আর হালেবিদের মন্দির দেখবে, আর দেখবে শ্রবণবেলগোলার জৈনমূর্তি। এখান থেকেও নাকি মোটরে যাওয়া যায়। বাসও যায়। আমরা কী করব ?

মামা বললেন : ট্রেনে আর ভাল লাগছে না, মোটরে যদি হয় তো ঘুরে আসি।

স্বাতি বলল : তাপ্তিকে আমি তাই বলছিলাম। আজই যেন হাসান চলে না যায়। আমরা হয়তো মোটরেই যাব। অনায়াসে সে আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে।

আমার মনের প্রশ্নটি মামার মনেও জাগল। বললেন : একটা অজানা অচেনা মেয়ের জন্য তোর এত দরদ কেন রে ?

ভাবছ কোন মতলব আছে।

কী আছে তাই ভাবছি।

আমার বয়সী একটা মেয়ে একা আছে, তাই ভাবছি। আমিও তো কোনদিন একা হতে পারি !

স্বভাবত স্বাতি কৈফিয়ৎ দেয় না। এই কৈফিয়ৎ শুনে মনে হল, সে ফাঁকি দিল। কিন্তু ফাঁকি কিসের জন্যে ! কাকে ফাঁকি !

চা খেতে খেতে মামা বললেন : ভাল একটা প্রোগ্রাম কর।

সরকারী বইপত্র স্বাতি আমার দিকে এগিয়ে দিল।

[illegible] দেখেই বললুম ঃ আজ আমরা শহর দেখব, কাল যাব দূরে।

বেলুর যাবে তো ?

যাব বৈকি, মাইসোরে তো মানুষ মন্দির দেখতেই আসে। হয়শাল রাজাদের মন্দির, পৃথিবীর কোথাও তার তুলনা নেই। মন্দির না দেখে আমরা ফিরব না।

স্নান সেরে মামী বার হচ্ছিলেন। আমার শেষের কথাটি শুনতে পেয়ে খুশী হলেন, বললেন ঃ আজই কি মন্দির দেখাবে ?

আমার সব কথাটি শুনলে যে তিনি মোটেই খুশী হতেন না, আমি জানি। আমি মন্দিরের কথাই বলছিলুম, মন্দিরের দেবতার কথা নয়। বেলুর আর হালেবিদে লোকে মন্দির দেখতে যায়। সে মন্দিরের স্থাপত্য, কারুশিল্প। মন্দিরে দেবতা আছে কিনা জানি না। এ সব কথা মামীকে জানালুম না। ভাল ছেলের মতো বললুম ঃ আজই মামীমা।

মামা আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন। স্বাতিও বিস্মিত হল। বললুম ঃ আজ আমরা চামুণ্ডি মার দর্শনে যাব। জাগ্রত দেবতা।

স্বাতি আমার ছল বুঝল, বোধহয় মামাও বুঝলেন। মামা কথা কইলেন না, কিন্তু স্বাতি বলল ঃ যাই, তাপ্তিকে খবরটা দিয়ে আসি।

তাপ্তি কে ?

মামী ফিরে দাঁড়ালেন।

উল্লসিত ভাবে স্বাতি বলল ঃ আলাপ করবে মা ? খুব ভাল মেয়ে। যাই ডেকে আনি।

মামীর সম্মতির অপেক্ষা স্বাতি করল না। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তাপ্তিকে সে ঘরের ভিতরে টেনে আনল। আমি চমকে উঠেছিলুম। মনে হয়েছিল, এক ঝলক রূপোলি রোদ এসে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল। সবচেয়ে আশ্চর্য তার শাড়ি পরবার ধরনটি। পরে দেখে নিয়েছিলুম

যে শাড়ির এক প্রান্ত তার পিঠের কাছে জড়ো ক[illegible] [illegible] তলা দিয়ে ডান দিকে টেনে তুলেছে। গিঁট বেঁধেছে [illegible]। আর এক খণ্ড কাপড় দিয়ে মাথার চুল জড়ানো। শ[illegible] সোনা রূপোর জরি দেওয়া কাপড়ও মাথায় বাঁধতে দেখেছি।

মামীর মুখের দিকে চেয়ে আমার কষ্ট হল। তিনি এগিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু কথা কইতে পারলেন না। বাঙলায় কথা কইলে যে কাজ হবে না, তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বলেই নীরবে তাকে কাছে ডাকলেন। স্বাতি সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। আমি তার ইংরেজী বলার ধরন দেখে হাসছিলুম বলে আমার উপরে চটেই উঠল। বলল: তুমিই কথা বল, আমার কর্তব্য আমি সেরে ফেলেছি।

এটি সে বাঙলাতেই বলল। তাপ্তি বুঝতে না পেরে করুণ চোখে চাইল আমার দিকে। বললুম: এবারে আমাকে কথা কইতে বলছে।

তাপ্তি কিছু বলবার আগেই মামা বললেন: বস, চা খাও।

চা মামীই ঢেলে দিলেন।

মেয়েটিকে তাঁদের যে খারাপ লাগে নি, তা বুঝতে পারছিলুম। কিন্তু তাদের ভাললাগাটুকু হয়তো বোঝাতে পারবেন না, পারলেও তা সময়সাপেক্ষ। মামী ইংরেজী জানেন না। মামা জানেন, কিন্তু কথা বলার ভাল অভ্যাস নেই। শুধু ভদ্রতা রক্ষা করতে পারেন। কাজেই তাপ্তি যদি আমাদের সঙ্গী হয় তো স্বাতি ও আমাকে কথা কইতে হবে। স্বাতি সরে দাঁড়ালেই আমি একেবারে একা। স্বাতির হাসি দেখে মনে হচ্ছে যে তার কোন অভিসন্ধি আছে।

মামা বললেন: তোমার প্রোগ্রাম কী?

তাপ্তি বলল: আমি মন্দির দেখতে এসেছি।

মামা বললেন: বেশ তো, তাহলে আমাদের সঙ্গেই চল। গোপাল কী ব্যবস্থা করেছ?

ট্রেন থেকে নেমে এখানে আসতেই সময় বয়ে গেল। নিচে নামবার সময় এখনও পাই নি। বললুম : আপনাবা তৈরি হোন্। আমি ব্যবস্থা করে ফেলছি।

মামা বললেন : একটা ট্যাক্সি নাও। যা কিছু দেখবার আছে, সেই হতভাগাই দেখাবে।

আমাব চা খাওয়া শেষ হয়েছিল। আমি বেবিযে যাচ্ছিলুম। মামা বললেন : একেবাবে স্নানটা সেবেই নাম। আবাম পাবে।

স্নান সেবে যখন বাহিবে বেবলুম, স্বাতি বলল : তাপ্তিকেও সঙ্গে নিযে যাও না, সে তোমাকে সাহায্য কববে।

বাঙলায কথা। বুঝতে না পেবেও তাপ্তি উঠে দাঁডিযেছিল। ইংরেজীতে বলল : চলুন, আমি আপনাকে সাহায্য কবব।

স্বাতি হাসল।

আমরা দুজনে এক সঙ্গে বেবিযে এলুম।

১২

ঘর থেকে বেরিয়ে এসেও নিচে নামা হল না। তাপ্তি বলল : এখানে দেখবার জায়গার একটা ধারণা নিশ্চয়ই আপনার আছে।

স্বীকার করতে লজ্জা হল না যে আমার কোন ধারণাই নেই।

তাপ্তি বলল : আপনি দু মিনিট দেরি করতে পারেন ?

নিশ্চয়ই পারি।

তবে আসুন আমার সঙ্গে।

বলে নিজের ঘরের ভিতর ডেকে আনল।

আমি একটা টেবিলের উপর খান কয়েক মোটা মোটা বই দেখতে পেলুম। স্বাতি ঠিকই বলেছে। ভারতীয় স্থাপত্যের উপর কয়েকখানা মূল্যবান বই। পাতা ওল্টাবার সময় পেলুম না। তাপ্তি কিছু কাগজপত্র এগিয়ে দিল। বলল : এখানকার মানচিত্র দেখুন।

প্রথমে সে মহিসুরের মানচিত্র খুলল। দ্রষ্টব্য স্থানগুলো ছবি এঁকে দেখান হয়েছে। রেলপথ ও রাজপথ আছে আঁকা। পশ্চিমের একটা বিন্দু দেখিয়ে তাপ্তি বলল : এই মারকারা থেকে আমি বাসে এসেছি পেরিয়াপাটনা হয়ে।

এই মুহূর্তে আমার ইচ্ছা হল তার দেশ সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইবার। কিন্তু তখুনি নিজেকে সম্বরণ করে নিলুম। একথা জানতে চাইবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে, তার জন্য ব্যস্ত হওয়া উচিত হবে না। মানচিত্রে আমি মনোযোগ দিলুম।

দক্ষিণে নাঞ্জনগুড। পশ্চিমে সোমনাথপুর আর শিবসমুদ্রম। উত্তরে বাম হাতে কৃষ্ণরাজসাগর আর দক্ষিণে শ্রীরঙ্গপাটনা।

উত্তর-পশ্চিমে গেলে ব্যাঙ্গালোর, তার পশ্চিমে কোলার স্বর্ণখনি, উত্তরে নন্দী হিল। ব্যাঙ্গালোর থেকেই আমরা এসেছি।

মহিসুর থেকে সোজা উত্তরে উঠলে মেলকোট আর শ্রবণ-বেলগোলা। পশ্চিমে বেলুর আর হালেবিদ। আরও পশ্চিমে শৃঙ্গেরী আর জোগ ফল্‌স্। এ ছাড়াও আছে শিমোগা ভদ্রাবতী আর চিতলদুর্গ।

উদ্বিগ্নভাবে আমি বললুম : এসব আপনার দেখা হয়ে গেছে?

তাপ্তি হেসে বলল : না।

তারপরেই প্রশ্ন করল : কদিন থাকবেন আপনারা?

তিন চার দিন।

তবে আর ভাবনা কী! একদিন শ্রবণবেলগোলা বেলুব আব হালেবিদ, আর একদিন শ্রীরঙ্গপাটনা সোমনাথপুব শিবসমুদ্রম, তৃতীয় দিন এই শহর আর নাঞ্জনগুড।

বাধা দিয়ে বললুম : আজ আমাদের চামুণ্ডি পাহাড় যেতে হবে। মামীমা পূজো করবেন।

তাপ্তি লজ্জা পেয়ে বলল : নিশ্চয়ই করবেন। আজই আমরা শহর দেখব। সময় থাকলে নাঞ্জনগুড।

বলে আর একখানি মানচিত্র খুলে ধরল। মহিসুর শহরের মানচিত্র। প্রধান দ্রষ্টব্য স্থানগুলির নাম স্পষ্ট অক্ষরে লেখা। স্টেশন থেকে বেরিয়ে রেলওয়ে অফিস, একজিবিশন বিল্ডিং, কৃষ্ণরাজেন্দ্র হাসপাতাল, শ্রীচামরাজেন্দ্র টেকনিকাল ইনস্টিটিউট। জগন্মোহন প্যালেস, ললিতা মহল, রাজবাড়ি। চিড়িয়াখানা, গির্জা আর মসজিদ! সিল্ক আর স্যাণ্ডালউড ফ্যাক্টরি। পাহাড়ের উপর নন্দী চামুণ্ডি মন্দির আর রাজেন্দ্র বিলাস প্যালেস। বৃন্দাবন গার্ডেন আর স্যানাটোরিয়াম।

আশ্চর্য হয়ে আমি বললুম : সবই দেখতে হবে?

তাপ্তি এবারেও হাসল, বলল : মাইসোরে তো সবই দেখবার

জিনিস। ছবির মতো শহর। ভারতবর্ষে এমন শহর আর আছে কিনা জানি নে।

ঘরের বাহিরে এসে তাপ্তি আবার ফিরে দাঁড়াল। বলল: চাবিটা দিয়ে যাই। তাহলে আর ওপরে আসতে হবে না।

তার ঘরের চাবি তাপ্তি স্বাতির হাতে দিয়ে এল। আমরা নিচে নামলুম।

স্টেশনের সামনে তখন একটাও ট্যাক্সি নেই। একজন রেলের কর্মচারীর কাছে জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে ট্রেনের সময় ট্যাক্সি আসে, আর তারপরেই ফিরে যায়। একটু পরে তারা আসবে।

একটু পরে মানে?

বেলা এগারটার পরে ট্রেন।

বললুম: তার আগে একটা ব্যবস্থা হয় না?

কোথায় যাবেন?

এখন চামুণ্ডি পাহাড়, তারপর বেলুর হালেবিদ শ্রবণবেলগোলা।

ভদ্রলোক যে উৎসাহী তাতে সন্দেহ নেই। এইসব নাম শুনেই বললেন: তাহলে তো আপনাদের একটা ভাল ট্যাক্সি চাই। জানাশুনো লোক।

তাপ্তি তাদের দেশের ভাষায় কিছু বলল। উত্তরও পেল সেই ভাষায়। আমাকে বলল: আমি কয়েকটা ট্যাক্সিকে খবর দিচ্ছি টেলিফোনে।

কয়েকটা কেন, একটাই তো যথেষ্ট।

কয়েকজন না এলে দরে তো সুবিধে পাবেন না। বাজারে গেলে আরও সুবিধে পেতেন।

ভদ্রলোক যখন ট্যাক্সি ডাকতে গেলেন, আমরা ভাবলুম এবারে কী করি। রেলের সেই কর্মচারীটির চোখেও আমি বিস্ময় দেখেছি। তাপ্তির বেশে তার দেশের পরিচয় আছে। এমন অভিনব বেশ

পৃথিবীর আর কোথাও নেই। আমার বেশেই আমার দেশের পরিচয় আছে। ধুতি পাঞ্জাবী বাঙালীর পোষাক। অন্য যারা পরে, তাদেব আমরা চিনতে পারি। এরা সঠিক না পারলেও কিছু অনুমান করতে নিশ্চয়ই পারে। যা অনুমান করতে কিছুতেই পারবে না, সে আমাদের যোগাযোগের কথা। কী করে আমরা একত্র হলুম, কেন আমবা একসঙ্গে বেড়াব—সেই কথা। ভদ্রলোক মুখে কিছু জানতে না চাইলেও চোখে তাঁর প্রশ্ন দেখেছি।

তাপ্তি বলল: কাল আমরা দূবেব পাল্লায় বেবব। একটু বেশি সকালে, যাতে সন্ধ্যেবেলাতেই ফিবে আসতে পারি।

তাব ভাবনাব ধাবা আমার ভাল লাগল। আমবা তো বেড়াতে বেবিয়েছি। তাই আমাদেব একমাত্র ভাবনা হোক। আমি অন্য কথা ভাবছিলুম বলে মনে মনে লজ্জা পেলুম। বললুম: ওসব জায়গাব দূবত্ব সম্বন্ধে আমাব কিছু জানা নেই।

তাপ্তি বলল: এসব সংবাদ আমি কাল সন্ধ্যেবেলায সংগ্রহ করেছি; সবচেয়ে কাছে শ্রীবঙ্গপাটনা, দশ মাইল পথ। আব একদিকে বৃন্দাবন গার্ডেন বাবো মাইল। নাঞ্জনগুড পনব মাইল।

এ জায়গাটাব নাম আমি শুনি নি।

শোনেন নি? তেমন বিখ্যাত নয বলেই বোধহয় শোনেন নি। কপিলা নামে একটা ছোট নদীব তীবে শ্রীকান্তেশ্বরেব মন্দিব। স্থানীয় তীর্থ বলেই পবিচিত। দেখতে না পেলে দুঃখ করবার মতো কিছু নয।

তাবপব?

তাবপবে সোমনাথপুব আব শিবসমুদ্রম তিবিশ আর পঁয়তাল্লিশ মাইল। একই পথে কিনা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। তবে শুনেছি সোমনাথপুব দেখে শিবসমুদ্রম যাওয়া যায়।

সোমনাথপুরের বিখ্যাত মন্দিরের কথা কিছু শুনেছি।

তাপ্তি প্রচুর খুশী হল, বলল: শুনবেন [illegible] সব মন্দিরের কথা সকলকেই শুনতে হবে।

সেই সঙ্গেই যোগ করল: শিবসমুদ্রম দেখবার জন্যে আমার বিশেষ আগ্রহ নেই।

কেন?

কাবেরীর দুটো ধারা এখানে গড়িয়ে গড়িয়ে দুশো ফিট নিচে নেমেছে। আমরা জলপ্রপাত বলি। জোগ ফল্‌স্ এর চেয়ে অনেক সুন্দর। এই শহরের বিদ্যুৎ ঐখান থেকেই আসছে। কারখানা দেখার শখ আমার নেই।

আপনার শখের পরিচয় আমি পেয়ে গেছি।

পেয়েছেন!

ভারতের প্রাচীন স্থাপত্যে আপনার অনুরাগ। আপনি বেলুর আর হালেবিদ দেখতে পেলে আর কিছু দেখতে চাইবেন না।

তাপ্তি হেসে বলল: আমার দুর্বলতা আপনি ধরে ফেলেছেন দেখছি।

কী করে তার মনের কথা জানলুম তাপ্তি হয়তো সে কথা জানতে চাইত। কিন্তু তার আগেই সেই রেলের কর্মচারীটি এলেন, বললেন: খান কয়েক ট্যাক্সি এখনি এসে পড়বে। কিন্তু পয়সা তারা অনেক চাইছে। ছ আনা মাইল।

আমাদের কত মাইল পথ?

তা কম নয়। বেলুর-হালেবিদ বোধ হয় একশ বারো মাইল, শ্রবণবেলগোলা পঞ্চান্ন। তবে একই পথে বলে সুবিধে আছে। বেলুরের রাস্তা থেকে আট দশ মাইল ভিতরে গেলে শ্রবণবেলগোলা।

তা হলে প্রায় আড়াই শো মাইল হল।

তারপর সোমনাথপুর শিবসমুদ্রম।

বেশিক্ষণ আমাদের হিসেব করতে হল না। প্রায় একই সঙ্গে চার পাঁচখানা ট্যাক্সি হুড়মুড় করে এসে পড়ল। খানিকটা এগিয়ে

যাবারও আমরা সময় পেলুম না, ড্রাইভাররা এসে আমাদের ছেঁকে ধরল। রেলের ভদ্রলোক আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন : আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

দেশীয় ভাষায় কথা, আমি কিছুই বুঝতে পারিনে। এইটুকু বুঝেছি যে ছ আনা মাইল নয়, দ্রষ্টব্য সব কিছু দেখিয়ে মোট একটা টাকার ব্যবস্থা করছেন। তিন দিন গাড়ি আমাদের কাছে থাকবে টাকার অঙ্ক শুনে তাপ্তি আমাকে বলল : এরা বাড়াবাড়ি করছে। এর চেয়ে হাসানের রেস্ট হাউসে থেকে বাসে ঘোরা ভাল। বেলুর আর হালেবিদ দশ-বারো মাইল তফাতে, একদিনেই দেখা যাবে। আর একদিন শ্রবণবেলগোলা। এর জন্য দুশো টাকা খরচ করবার মানে হয় না।

এরা আর কিছু দেখাবে না?

সবই দেখাবে। সোমনাথপুর আর শিবসমুদ্রমেও বাস যাচ্ছে। বাকি রইল শহর আর আশেপাশের জায়গাগুলো।

মামা মামীকে আমি দেখতে পাই নি। স্বাতির হাসি শুনে ফিরে তাকালুম। তাপ্তিকে বলল : এ ভদ্রলোককে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তো?

কেন?

তাপ্তি সত্যিই আশ্চর্য হল।

স্বাতি বলল : তাহলে এখনও হন নি, হলে বলবেন।

মামা বললেন : তোমার গাড়ি ঠিক হল গোপাল?

এরা বেয়াড়া দাম চাইছে।

তোমার বেয়াড়ার ধারণাও আবার বেয়াড়া কিনা। কত চাইছে?

দুশো।

মামী তাঁর চোখ কপালে তুললেন, বললেন : দুশো!

তাইতেই তো আমরা পিছিয়ে এসেছি।

তাপ্তি বলল : দেড়শো টাকায় নেমেছে দেখছি, আরও নামবে।

মামা বললেন : কোন্ কোন্ রাজ্য জয় হবে ?

আমি সংক্ষেপে তিনদিনের হিসেব দিলাম। মামা চমকে উঠলেন, বললেন : বল কি গোপাল, তিনদিনে যে কোমর ভেঙে যাবে।

তবে ?

আপাতত দুদিনই রাখ। ভবিষ্যৎ বহাল থাকলে তৃতীয় দিন বেরনো যাবে।

রেলের ভদ্রলোককে আমি মামার অভিপ্রায় জানালুম। তিনি চট করে সোমনাথপুর আর শিবসমুদ্রমকে বাদ দিয়ে দিলেন। ভাড়া একশো তিরিশ থেকে একশো কুড়িতে নামল। শুনে মামা বললেন : একশো টাকাই যথেষ্ট, ঠিক নয়কি ?

এই গাড়ি, এই গাড়ি !

বলে ড্রাইভাররা নিজের নিজের গাড়ির দিকে ছুটে গেল। সবাই রাজী, সবাই চায় তার গাড়িতেই আমরা উঠি। সেও এক বিপদ।

মামী বললেন : তোমারও যেমন, একটু সবুর করলে দর আরও নামত।

একটা লোক অনেকক্ষণ থেকে ঘুর ঘুর করছিল। সে বলল : বাজারে গেলে সত্তর আশিতেই পাওয়া যেত।

মামা তাকে একটা ধমক দিলেন। লোকটা পালিয়ে বাচল।

রেলের ভদ্রলোকই আড়ালে ডেকে আমাদের একটা গাড়ি নিতে বললেন। লোকটা নাকি খুবই বিশ্বস্ত, অনুগতও বটে। সে সঙ্গে থাকলে গাইডেরও দরকার হবে না। আমরা তারই গাড়ি পছন্দ করলুম।

আবার বিপদ হল ওঠবার সময়। সামনে দুজন ওঠার অসুবিধা আছে, পিছনেও চারজন বসার অসুবিধা। মামাকে সামনে দিলে পিছনে আমরা চারজন বসতে পারি, কিন্তু কে কার পাশে বসবে ! তাপ্তি আমাদের রক্ষা করল, আমাকে বলল : আসুন না, আমরা দুজনেই সামনে বসি।

বলে নিজেই আগে উঠে বসল।

পাতলা ছিপছিপে মেয়ে, আমার দেহও ভারি নয়। কাজেই অসুবিধা একটুও হল না। শুধু স্বাতি একটুখানি হাসল।

রেলের ভদ্রলোক পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন : কোন অসুবিধা হলে আমাকে বলবেন।

ড্রাইভার বলল : আমি থাকতে অসুবিধা কেন হবে!

সে তো ঠিক কথা।

সবাই উঠে বসতেই গাড়ি এগিয়ে চলল।

১৩

তাপ্তি চুপি চুপি বলল : এখানে আপনারা এই প্রথম এলেন, তাই না ?

বললুম : হ্যাঁ। আপনি ?

আমি প্রথম না হলেও নতুন বটে। শৈশবে বাবা মার সঙ্গে এসেছিলাম, এখন সবই নতুন ঠেকছে।

ড্রাইভারকে বলা ছিল, সে আমাদের সব চিনিয়ে দেবে। স্টেশন থেকে বেরিয়েই সে তার কাজ শুরু করল। রাস্তার ওপারেই রেলওয়ে অফিস, তারপর একজিবিশন বিল্ডিং। এখনও প্রদর্শনী জমজমাট আছে। দশেরার আসল রাতটা পেরিয়েছে। কিন্তু উৎসব এখনও চলছে। দশেরাই তো মহিস্সুরের জীবন। সারা বছর ধরে সমস্ত মানুষ এই পর্বের অপেক্ষা করে থাকে।

আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলুম : দশেরার উৎসব আপনি দেখেছেন ?

তাই দেখতেই আমরা এসেছিলাম।

কেমন লেগেছিল ?

ভাল বলব, না বলব মনে নেই ! প্রচুর আলো, প্রচুর লোকজন, আর প্রচুর গোলমাল, এইটুকুই শুধু মনে আছে। দশেরা আপনাদের দেশে নেই ?

আছে। বাঙলা দেশে আমরা দুর্গোৎসব বলি। দুর্গার পূজো। তিনদিন পূজোর পরে চারদিনে বিসর্জন। বাঙালীর প্রাণের পূজো।

তাপ্তি আমার মুখের দিকে চাইল।

বললুম : উত্তর ভারতে চলে রামলীলা। দশেরার রামলীলা। রামের জীবন নিয়ে বিরাট অভিনয়। এর গোড়ার কথা একই। দুর্গা

মহিষাসুর বধ করলেন, আর রাম রাবণকে বধ করলেন, সেই একই সত্য প্রমাণিত হচ্ছে। অধর্মের উপর ধর্মের প্রাধান্য।

তাপ্তি বলল: এদিকে শুনেছি কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধও অভিনীত হয়। সেও তো একই সত্য।

ড্রাইভার তখন মেডিক্যাল কলেজ আর হাসপাতাল চিনিয়ে দিচ্ছে। কৃষ্ণরাজেন্দ্র হাসপাতাল আর শ্রীছামরাজেন্দ্র টেকনিকাল ইনস্টিটিউট। ছাত্রদের এখানে নানা রকমের শিক্ষা দেওয়া হয়। রোজ ও চন্দন কাঠের কাজ, হাতির দাঁত ও ধাতুর জিনিস, আসবাব ও খেলনা তৈরির শিক্ষা। ড্রাইভার বলল: সময় করে এর শো-রুমটা একবার দেখবেন।

বাজারে আমরা নামলুম না, জগন্মোহন প্যালেসও দেখলুম না। সোজা চলে গেলুম চামুণ্ডি পাহাড়ের দিকে। দেবতার দর্শনের সময় সকালেই প্রশস্ত। মামী খুশী হবেন, প্রসন্ন থাকবেন সারাদিন। সেইটুকুই আমার লাভ। গাড়িতে উঠবার আগে এই কথাই ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছি। চামুণ্ডেশ্বরীর পূজার পর যেখানে খুশী নিয়ে যেও, যতক্ষণ খুশী ঘুরিও। খাবার সময় ইন্দ্রভবন। বেলের ভদ্রলোকটি বলে দিয়েছেন ইন্দ্রভবনের খাবার এখানে সবচেয়ে ভাল। তারা উত্তর ভারতের লোক। দক্ষিণ ভারতের হলেও ক্ষতি ছিল না। ভারত একটা হলেই আমরা বেশী খুশী হই।

আস্তে আস্তে তাপ্তি বলল: আপনার দেশের সঙ্গে এখানকার দেবীর তাহলে মিল আছে। চামুণ্ডি দেবীও নাকি এদেশের দানব রাজা মহিষাসুরকে বধ করে এই রাজ্য স্থাপন করেছেন। বর্তমান রাজবংশ দেবীরই প্রতিষ্ঠিত।

এ কথা আমিও শুনেছি।

শুনেছেন বুঝি।

তাপ্তি লজ্জিত হল।

তার মুখের দিকে চেয়ে আমি বললুম: আপনি লজ্জা পেলেন কেন?

এও আপনি লক্ষ্য করেছেন! মাঝে মাঝে আমি ভুলে যাই যে অন্য মানুষও কিছু জানে।

স্বাতি একথা শুনতে পেলে খুশী হত অপবিমিত। বললুম : আমি তো সারাক্ষণই এ কথা ভুলে থাকি। এর জন্য আমার ভারি বদনাম।

তাপ্তি আমার মুখের দিকে চাইল।

বললুম : ঠিকই বলছি। স্বাতিকে কোন সময় জিজ্ঞাসা করবেন। যতটুকু জানি তার সবটুকু না বলা পর্যন্ত আমি আনন্দ পাইনে। শুধু অনুযোগ নয়, লোকে নিন্দাও করে। নিজেকে সবজান্তা বলে জাহিরের চেষ্টা নাকি করছি। এ আমাব স্বভাবের দোষ, কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারি না।

তাপ্তির দৃষ্টিতে আমি বুঝি বেদনা দেখতে পেলুম। লজ্জা পেলুম। একটা নতুন মেয়েব কাছে এসব কথা বলা বোধ হয় উচিত হল না। কেন বললুম!

তাপ্তি একটু ভেবে বলল : এ বোধ হয় জানবাব ইচ্ছা থেকে জন্মে। যে কিছু জানে তাব আরও জানবার শখ। সেই শখ তাকে অসতর্ক করে।

তাপ্তির কথায় আমি বুঝি অন্যমনস্ক হয়েছিলুম। তাব কথাতেই আবাব চেতনা ফিরে এল। বলল : এই নিয়মেব ব্যতিক্রম আমাদের সাধু-সন্ন্যাসীরা। তাঁদের জানবাব ইচ্ছা যত প্রবল হয়, তত তাঁরা নির্বাক হন। শেষে মৌন হয়ে তপস্যা কবেন হিমালয়েব নির্জন গুহায়।

ড্রাইভার বলল : পাহাড়ের গায়ে ছ মাইল পথ। দিনরাত একরকম। দিনে সূর্যেব আলো, রাতে বিজলিব। এক হাজার সিঁড়ি ভেঙেও উপরে ওঠা যায়।

আমরা বাঁধানো প্রশস্ত পথ বেয়ে উপবে উঠতে লাগলুম।

ড্রাইভার বলল : পাহাড় খুব নিচু ভাববেন না। প্রায় সাড়ে তিন হাজাব ফুট উঁচু।

পিছন থেকে মামা বললেন : তাহলে তো প্রায় আবু পাহাড়ের সমান হল।

স্বাতি বলল : সে তো শুনেছি চার হাজারের বেশি। তাই না গোপালদা ?

আমি খুব আস্তে আস্তে তাপ্তিকে বললুম : দেখলেন তো, সব কিছু জানাব দায়িত্ব আমাব।

বাঙলার একটা কথাও যে তাপ্তি বুঝতে পারে নি, তা পরক্ষণেই বুঝতে পারলুম। সেটুকু ইংরেজীতে বুঝিয়ে দিতেই সে হাসল। তার হাসিতে কোন শব্দ নেই।

স্বাতি বলল : ঘুমিযে পড়লে নাকি ?

এ নিশ্চয়ই তাব দুষ্টুমি। আমাদেব কথা সে যে একেবারেই শুনতে পাচ্ছেনা, তা বিশ্বাস হয না। পুবোপুবি শুনতে না পেলেও দুজনে যে কথা কইছি তা তাব বোঝা উচিত। বললুম : জাগিযে দিয়েছ।

স্বাতি বলল : পীঠস্থানেব বর্ণনা কব।

ড্রাইভাব বলল : আজ বিকেল বেলায় মস্ত মেলা বসবে।

কিসের মেলা ?

ড্রাইভাব যা বোঝাল তাব মানে হল, টেপ্পাকুলম সবোববে দেবীর নৌকা বিহাব। মন্দিব থেকে দেবী আসবেন পাল্কীতে চেপে। নৌকায় উঠে বিহাব করবেন। সে নাকি এক অপূর্ব দৃশ্য। এমন আলোব মেলা পৃথিবীব আর কোথাও নেই। একবাব দেখলে সারাজীবন মনে থাকবে। আজ সন্ধ্যেবেলায় যদি আবার আমরা পাহাড়ে না উঠি, তাহলে জীবন আমাদেব ব্যর্থ থাকবে। দুদিন আগে এলে বথযাত্রা দেখতে পেতুম।

নববাত্রিব উৎসব শেষ হয়েছে। দশেবাব শোভাযাত্রা দেখতে পাব না। কিন্তু উৎসবের শেষ এ রাজ্যে নেই। এখনও অনেক কিছু দেখতে পাব। অনেক ফুল, অনেক আলো, অনেক উৎসব, অনেক প্রদর্শনী।

এক সময় আমবা পাহাড়ের মাথায় এসে পৌঁছে গেলুম।

দক্ষিণের পথে গেলে মহারাজার বিশ্রামগৃহ রাজেন্দ্র বিলাস প্রাসাদ। রাজপরিবারবর্গ চামুণ্ডি দেবীর পূজায় এলে এই প্রাসাদে স্নান প্রসাধন ও বিশ্রাম করেন। আজ বিকেলে মহারাজা আসবেন।

চামুণ্ডি দেবীর মন্দির বামে। পথের উপর দণ্ডায়মান মহিষাসুরের মূর্তি দেখে আমরা মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলুম। অল্প দূরে মন্দিরের বিরাট গোপুর দেখা যাচ্ছে। স্বাতি বলে উঠল: ঠিক একরকম।

সত্যিই একরকম। দক্ষিণের যত জায়গায় মন্দিরের গোপুর দেখছি, সর্বত্র একই রকম মনে হচ্ছে। কারুকার্যের প্রভেদ হয়তো আছে, তা সহজে চোখে পড়ে না।

মন্দির খোলা ছিল। সবাই মিলে আমরা ভিতরে গেলুম। মামা মামী যখন পূজার ব্যবস্থা করছিলেন, আমি দেবীর মূর্তি আবিষ্কারে যত্ন নিচ্ছিলুম। মনে হল, দেবীর মর্মর মূর্তি, অষ্টভুজা সিংহবাহিনী। অসুরের নরাকৃতি মহিষমূর্তি, তার বক্ষস্থল ত্রিশূলবিদ্ধ। বাঙলাদেশের মতো লক্ষ্মী-সরস্বতী ও কার্তিক-গণেশ সেখানে অনুপস্থিত।

তাপ্তি বলল: শুনেছি দক্ষিণ ভারতে এরকম মূর্তি আর নেই।

এ কথা মেনে নিয়ে বললুম: আমরা কোথাও দেখি নি। যা দেখতে পেয়েছি, তা হয় শিব নয় বিষ্ণু। কার্তিক গণেশ দেখেছি, দেখেছি মীনাক্ষী ও কন্যাকুমারী। কিন্তু মহিষমর্দিনী দেবী দেখি নি। এতো আমাদের দেশের দেবতা।

সত্যি!

একটি শব্দে তাপ্তি তার বিস্ময় প্রকাশ করল।

স্বাতি আজ মামীর কাছে ঘেঁষে আছে। আমাদের দুজনকে বেরিয়ে আসতে দেখে মুখ টিপে হাসল, কিন্তু নিজে বেরিয়ে এল না। তাপ্তিও তার হাসি দেখতে পেয়েছিল। লজ্জা পেয়েছিল কিনা, আমি তা দেখতে পাই নি।

বাহিরে বেরিয়ে বলল: একখানা ছবি নেব।

এতক্ষণ আমি লক্ষ্য করি নি যে তার কাঁধে ক্যামেরা ছিল। ছোট ক্যামেরা, তার চামড়ার ব্যাগের আড়ালে ঢাকা ছিল। তাপ্তি গোপুরের একটা ছবি নিল।

আজ মন্দিরের রাস্তায় পুলিশের প্রহরা আছে। তাপ্তি তাদেরই একজনকে বলল: টেপ্পাকুলমটা কোন দিকে।

লোকটা পাশের একটা রাস্তা দেখিয়ে দিল।

রাস্তাটা প্রশস্ত নয়। দুধারে ছোট ছোট বাড়ি। খানিকটা এগিয়ে দেখলুম, পথ আর সমতল নয়। ধাপে ধাপে নেমে গেছে। অনেকটা নেমে গেলে সেই সরোবর। সেখানে আজ রাতে দেবীর নৌকা বিহার। বললুম, ওখানে যাবেন?

তাপ্তিব দৃষ্টিতে উৎসাহ ছিল, কিন্তু উত্তর দিল: থাক। ওঁরা খুঁজবেন।

বললুম: যাব আর আসব।

তাপ্তি হেসে বলল: তাতেও অনেক সময় লাগবে। তার চেয়ে আসুন, এই ছায়ায় একটু দাঁড়াই।

হেসে বললুম: আপনি খুব ভদ্র।

কেন বলুন তো?

ওঁদের দেরি হতে দিতে চান না, এই তো?

আপনার মতো অধিকার থাকলে আপত্তি করতাম না।

আমার অধিকারের কথা শুনে হাসি পেল। কেন জানি না সত্য কথাটুকু গোপন করতে ইচ্ছা হল না। বললুম: আপনার চেয়ে আমার অধিকার একটুও বেশি নয়।

তাপ্তির বোধহয় এ কথা বিশ্বাস হল না। তাই তার বড় বড় চোখ আমার মুখের উপর তুলে ধরল।

বললুম: সত্য কথাই বলছি। আজ স্বাতি আপনাকে সঙ্গী হতে ডেকেছে। কয়েক দিন আগে এঁরা সবাই আমাকে ডেকেছিলেন। সেদিন আমাকে তাঁদের প্রয়োজন হয়েছিল।

আপনি তো এঁদের আত্মীয়!

বললুম না যে দুপুরুষ আগে রক্তের সম্বন্ধ ছাড়াই আত্মীয়তা হয়েছিল! তারপর সবাই ভুলে গিয়েছিলেন। এবার আবার নতুন পরিচয় সেই আত্মীয়তার সূত্র ধরে। তাপ্তির প্রশ্নের উত্তরে আমি শুধু হাসলুম।

তাপ্তি কী বুঝল সেই জানে, আর কিছুই জানতে চাইল না। সৌজন্যের অভাব ঘটবে বলে কিছু প্রশ্ন করা চলে না। নিজে থেকে বেশি কিছু বলার সময়ও এখনও আসে নি।

পথের পাশে একটি ছোট গাছের ছায়া। সংকীর্ণ। দুজনে সেই ছায়ায় দাঁড়িয়ে নিচের সরোবর দেখলুম। অনেক জল, অনেক গাছ, অনেক আয়োজন। উপর থেকে স্পষ্ট কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ভাল করে দেখতে হলে আরও নিকটে যেতে হবে। সব কিছু জানতে হলে একেবারে কাছে যেতে হবে। তাপ্তি আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি তাকালুম পিছনের দিকে। স্বাতিকে যে পিছনে ফেলে এসেছি।

তাপ্তি বলল: সে আমাদের দেখে গেছে।

কে?

স্বাতি।

আমার বিস্ময়ের আর অবধি নেই। স্বাতি তো নিজেই এল না, তবু সে আমাদের নজরে রেখেছে!

তাপ্তি বলল: ওকে ডেকে আনব?

না না, তার কী দরকার আছে!

একসঙ্গে থাকলে আমাদের বেশি ভাল লাগত।

বলে তাপ্তি উপরে উঠতে লাগল। আপত্তি না করে আমি তার অনুসরণ করলুম।

পূজো সেরে মামী যখন বাহিরে এলেন, আমি তাঁর প্রসন্নতা

দেখে আশ্চর্য হলুম। আমার সঙ্গেই প্রথমে কথা কইলেন, বললেন: গোপাল, একবার জয়পুরে আমাদের নিয়ে চল।

এত তীর্থ থাকতে জয়পুরের কথা কেন মনে পড়ল বুঝতে পারলুম না। মামাও পারেন নি। জিজ্ঞাসা করলেন: জয়পুর কেন?

জয়পুরে নাকি এমনি দেবতা আছেন।

মামা স্মরণ করবার চেষ্টা করলেন। বললেন: অনেকদিনের কথা, ভাল মনে নেই।

স্বাতি বলল: সামনের পূজোতেই আবার বেরব। রামখেলাওন থাকলে গোপালদার আর দবকার হবে না।

মামী তাকে ধমক দিলেন।

আমার মনে হল। স্বাতিব দৃষ্টিতে আমি কৌতুক দেখি নি, দেখেছি বেদনা। এই বেদনার কথা সে বোধহয় কাউকে বলবে না। আমরা গাড়িতে ফিরে এলুম।

পাহাড় থেকে নামবার পথে ড্রাইভার আমাদের নন্দী দেখাল। একখানা বিরাট পাথর থেকে কেটে বার করা নন্দী। ষোল ফুট উঁচু। রাস্তার ধারে মোটর থামিয়ে ধাপ বেয়ে খানিকটা উঠতে হয়। পাহাড়ে উঠবার পথে আমরা দেখতে পাই নি। পরে বুঝতে পেরেছিলুম যে এখানে হুটো পথ আছে। এই রাস্তাটা খানিকটা এগিয়েই আবার অন্যটার সঙ্গে মিলে যাবে। মূর্তিটা আমরা খানিকক্ষণ ধরে দেখলুম। একদিকে পাহাড়, অন্য দিকে আকাশ। পাহাড়ের গায়ে এত বড় মূর্তি বোধহয় আমরা কোথাও দেখি নি। নন্দীর গলায় সারি সারি মালা। মাথার উপরেও মালা, এক কান থেকে আর এক কান পর্যন্ত বাঁধা। শুধু পাথরেব উপর কারুকার্য করা মালা নয়, ভক্তদের দেওয়া ফুলের মালাও আছে অগণিত। নন্দী এখানে পাথরের মূর্তি নয়, শিবের বাহন দেবতা। নন্দীর পূজা না হলে শিবপূজা যে অসম্পূর্ণ থাকে।

ফেরার পথে ড্রাইভার আমাদের ললিতা মহল দেখাল। মহা সম্মানিত অতিথির জন্য বিরাট একটি প্রাসাদ। ভিতরের সব কিছু শ্বেত মর্মরের। আমাদের সঙ্গে প্রাসাদ দেখার অনুমতিপত্র ছিল না। দ্বারী সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু বাধা দেয় নি। তার পুরস্কারের লোভ আছে। উপর ও নিচের ঘরগুলি আমরা ঘুরে ঘুরে দেখলুম। একটি প্রশস্ত নাচের ঘর, আর একটি ভোজের। প্রচুর আসবাব, রাজকীয় ব্যবস্থা।

হার্ডিঞ্জ সার্কল ও নিশাতবাগের ভিতর দিয়ে আমরা চিড়িয়াখানায় এলুম। অনেকক্ষণ ধরে দেখলুম পশু পাখী আর সরীসৃপগুলো। সেই সঙ্গে ফুলও দেখলুম। মহিসুরের পথে ঘাটে ফুলের অভাব কোথাও দেখি নি। নানাবর্ণে শহরের পথঘাট আলো হয়ে আছে।

জগন্মোহন প্রাসাদে আমরা চিত্রশালা দেখলুম। কত শিল্পীর কত চিত্র। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রবি বর্মার ছবিরও শেষ নেই। ত্রিবেন্দ্রামের চিত্রশালা দেখে আনন্দ পেয়েছিলুম, এখানেও পেলুম। এরই সঙ্গে একটি ছোট জাদুঘর আছে। সেখানে কত প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রের নমুনা, হায়দার আলি ও টিপু সুলতানের সময়ের কত চিত্র, কত যত্নে কত সুন্দর করে সব সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল, এবারে আমরা একজিবিশন দেখব, না সিল্ক আর স্যাণ্ডাল অয়েল ফ্যাক্টরি দেখতে যাব।

মামা বললেন: এখন আর অন্য কিছু নয়। কী ভবন তোমাদের—বলে আমার দিকে তাকালেন।

তাঁকে মনে করিয়ে দিলুম: ইন্দ্রভবন।

মামা বললেন: ইন্দ্রভবনে কেউ খেতে যায় এই প্রথম শুনছি। দেবতারা তো উর্বশীর নৃত্য দেখতে যেতেন।

মামী বললেন: এখন খেতে যাও ক্ষতি নেই। এ দেশ ছাড়বার আগে সিল্ক আর চন্দন দুই সঙ্গে নিতে হবে। এখানকার আতর শুনেছি বিখ্যাত।

মামা বললেন: একজিবিশনে গেলে আরও অনেক বিখ্যাত জিনিস দেখতে পাবে। বোঝার কথা একটু মনে রেখো, এই নিবেদন। এখনও অনেক পথ বাকি আছে।

পথ ফুরোয় না।

১৪

বিকালে আমাদের বৃন্দাবন গার্ডেনে যাবার কথা ছিল। কিন্তু শোনা গেল যে আজ সন্ধ্যায় সেখানে বাতি জ্বলবে না। রঙীন আলোয় আজ সেখানে স্বপ্নপুরী নির্মাণ হবে না। সপ্তাহে তিন দিন বৃন্দাবন হয় নন্দন কানন—বুধ শনি রবি। কাল হয়েছিল। দুদিন পরে আবার হবে। মামা বললেন : আজ থাক, দুদিন পরেই যাব।

স্বাতি বলল : বিকেলটা তাহলে কী করে কাটবে?

মামী বললেন : এখন তো একটু গড়িয়ে নাও। বিকেলের কথা পরে ভাবা যাবে!

গাড়ি চাই কি?

চাই না। যাবার জায়গা নেই। প্রদর্শনী তো স্টেশনের গায়েই। মাঝখানে রেলের অফিসটা।

ড্রাইভার জানিয়ে গেল যে সে ভোর ছটায় আসবে। ভোর বেলায় না বেরলে দুপুরে কষ্ট হবে। অতগুলো দেখবার জায়গা ভাল করে দেখাও হবে না।

মামা বললেন : অত সকালে কি সবাই তৈরি হতে পারবে?

মামী বললেন : কেন পারবে না! শেষ রাতেই আমি সবাইকে জাগিয়ে দেব।

খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা?

মামী বললেন : গোপালের হাতে ছেড়ে দাও। পারবে না বাবা?

পারতেই হবে। নিজের জন্যে যা পারি নে, পরের প্রয়োজনে তা করতেই হবে। বললুম : সে জন্য ভাববেন না।

মামা-মামী নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রামে গেলেন। স্বাতিও গেল। তাপ্তি একবার আমার দিকে চেয়ে বলল : আপনি কী করবেন?

একটু ঘুরে বেড়াব।

স্বাতি তার হাত ধরে টানল, : বলল : চল না, আমরাও একটু গড়িয়ে নিই।

গড়াবার ইচ্ছা হয়ত তাপ্তির ছিল না। তবু যেতে হল। আমি গেলুম স্টেশনের ওয়েটিং রূমের দিকে।

জীবনের অনেক সমস্যার মধ্যে এও এক সমস্যা—মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহার। এড়িয়ে গেলে অভদ্র নাম। সহজ হলে হ্যাংলা। এ তো অন্য লোকের কথা। মেয়েরা নিজেরা কী ভাবে তা জানা নেই। স্বাতির সঙ্গে আমার মেলামেশা দেখে এতদিন কে কী ভেবেছে আমি ভেবে দেখি নি। কিন্তু এবারে তাপ্তির সঙ্গে আমার ব্যবহার স্বাতি দেখছে ঈগল পাখির মতো। তার ভাবনাকে আমি ভয় করি, তার অবজ্ঞা আমার সইবে না। সম্মান হারানোর চেয়ে মৃত্যু আমার শ্রেয় মনে হয়। শুধু তার কাছে কেন, জগতের যে কোন লোকের কাছে।

পিছনে হঠাৎ ডাক শুনে আমি থমকে দাঁড়ালুম। দৃঢ় বলিষ্ঠ চেহারার ভদ্রলোক। মালকোঁচা মারা ধুতির উপর লম্বা টেনিশ সার্ট ঝুলিয়েছেন। বললেন : চিনতে পারছেন ?

সেই ভদ্রলোক। মাদরার ওয়েটিং রূমে শিকারের গল্প শুনিয়েছিলেন। কিশতোয়ার থেকে ফিরছেন। মেরেছেন সিবিম স্ট্যাগ ক্লাউডেড লেপার্ড মুস আর মাস্ক ডিয়ার। হিমালয়ে মেরেছেন মার্কহর আইবেক্স ইয়াক শাপু ভারল, কাশ্মীরে সেরো। কুমায়ুনে টাইগার। তরাইয়ে মেরেছেন বাঘ প্যান্থার স্লথ বিয়ার শম্বর, স্পটেড সোয়াম্প হগ আর বার্কিং ডিয়ার, চার শিং-ওয়ালা অ্যান্টিলোপ আর নীল গাই। পাঞ্জাবে ব্ল্যাক বাক আর র‍্যাভাইন ডিয়ার। আসামে মেরেছেন পাগলা হাতি আর মাইসোরে আসছেন বাইসনের লোভে। বললুম : চিনতে আর পারব না! আপনার বাইসন শিকার হল ?

ভদ্রলোক খুশী হয়ে বললেন : সব মনে আছে দেখছি।

নিজে সিগারেট খাচ্ছিলেন। আমার দিকেও একটা বাড়িয়ে দিলেন। নিলুম না দেখে বললেন : সরি, আপনি যে ভাল ছেলে মনে ছিল না।

নিজেই আর একটা ধরালেন। ভদ্রলোক যে দেশলাই ব্যবহার করেন না সেকথা আমার মনে আছে।

কোথায় বসবেন আসুন।

বলে আমায় ওয়েটিং রুমে টেনে আনলেন।

প্রশ্ন করলুম : কোথায় উঠেছেন?

ব্যাঙ্গালোরে এক শিকারী বন্ধুর বাড়ি।

এখানে?

এই আপনার মতো। আজ রাতের গাড়িতে ফিরব। ভাল কথা, আপনারা নিশ্চয়ই ট্রেনে এসেছেন!

আর কিসে আসব!

দোহাই আপনার, ফেরার সময় অন্তত মোটরে ফিরবেন। একটা অভিজ্ঞতা হবে।

অভিজ্ঞতার কথা আমি জিজ্ঞাসা করলুম না। ভদ্রলোক নিজেই বললেন : ব্যাঙ্গালোর থেকে মাইসোর মাত্র পঁচাশি মাইল পথ। পঁচিশ মাইল এসে দেখবেন ক্লোজ পেট, নতুন নাম হয়েছে রামনগর। গ্রামের স্বাস্থ্যের কী করে উন্নতি করা যায় তারই চেষ্টা হচ্ছে।

বলে নিজের স্বাস্থ্যের দিকে একবার দেখলেন।

আরও পনর মাইল এগিয়ে চেন্নাপাটনা। সিল্ক খেলনা আর ল্যাকার ইণ্ডাস্ট্রির জন্য বিখ্যাত। সেখান থেকে ষোল মাইল এগোলে মাণ্ডার চিনির কল। রাজ্যের প্রায় সমস্ত চিনি এইখান থেকে যাচ্ছে। ফরাসী সৈন্যের প্রথম ঘাটি শ্রেঞ্চ রক দেখতে পাবেন। একটু ভেতরে এগোলে দুটো প্রাচীন শহর টোণ্ডুর আর মেলকোট। রামানুজের নাম শুনেছেন?

বৈষ্ণব আচার্য রামানুজ ?

অত শত জানি নে মশাই। বললে, এক রামানুজ ও অঞ্চলে বারো বছর কাটিয়েছেন, সে প্রায় হাজার বছর আগে, তাঁরই স্মৃতি এখনও সজীব আছে। এখান থেকে বেশি দূর নয়, মাইল ত্রিশেক। দেখে নেবেন। ভাঙা মন্দির আর ঠাকুর দুই-ই আছে। টোন্নুরের পুরনো নামটা ভুলে গেলুম—যাদবগিরি না ঐ রকম কিছু—সেখান থেকে মেলুকোট আধঘন্টার রাস্তা—পাহাড়ের নাম বোধ হয় যদু গিরি। দুটো পুকুর আছে—মোতি তালাও আর কল্যাণী—একটা টোন্নুরে আর একটা মেলুকোটে। ফরাসীর ইতিহাস রামানুজের ধর্ম-বিশ্বাস ভাঙা কেল্লা আর জাগ্রত দেবতা—সবই পাবেন। ভ্রমণ আপনাদের সার্থক হবে।

ভদ্রলোক যে নিজে এসমস্ত দেখতে বার হন নি, সেই কথাটাই আজকে ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন। বললুম: আপনার শিকারের গল্প বলুন।

ভদ্রলোক উৎসাহিত হয়ে বললেন: শিকার এখনও হয় নি, তবে আর একটা শখ মিটেছে। হাতি ধরা দেখে এলুম। এরা বলে খেদা অপারেশন। এখান থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কারাপুর জঙ্গলে গিয়েছিলুম বন্ধুদের সঙ্গে। সে মশাই এক অদ্ভুত দৃশ্য। আপনি ভাবতে পারবেন না কী করে তারা একটা গোটা দল বুনো হাতীকে একসঙ্গে বন্দী করে ফেলছে। এসব আমাদের ধারণার অতীত।

ভদ্রলোক পকেট থেকে আর একটা সিগারেট বার করে পুরনোটার আগুনে ধরিয়ে নিলেন। বললেন: বিশ্বাস করুন প্রায় হাজার দুই জংলী লোক। এই কাজের জন্যই নাকি তাদের ভর্তি করা হয়। সরকারী লোকের সঙ্গে তারাও কাজ করে। শেখাতে কিছুই হয় না, কেননা প্রতি বছরই তারা এই কাজ করছে। কোমরে কাড়া নাকাড়া খালি টিন ক্যানেস্তারা বেঁধে তারা এগিয়ে আসে।

হাতির সঙ্গে কি তারা লড়াই করবে ?

তা না হলে আর রঙ্গ কিসের !

ভদ্রলোক বেশ খানিকটা ধোঁয়া নিলেন মুখে, তারপর বললেন : মহিস্থরের হাতি দেখেছেন তো, কেমন সুশ্রী সুন্দর গড়ন !

স্বীকার করতে লজ্জা হল না যে হাতির সৌন্দর্য আমি কোনদিন লক্ষ্য করি নি।

করেন নি ! আরে ছি ছি, তাহলে করেছেন কী ! রূপ কি ভেবেছেন মানুষেরই একার

আমি ভয় পেলুম, এবারে হয়তো তিনি জানোয়ারের রূপ বর্ণনা শুরু করবেন। তাহলে আর রক্ষা থাকবে না। তাড়াতাড়ি বললুম : না না, তা ভাবব কেন। মহিস্থরের হাতি তো খুবই সুন্দর। তা না হলে কি এ দেশের রাজা সেই হাতির পিঠে চড়ে দশেরার শোভা-যাত্রায় বেরোন।

দশেরা দেখেছেন বুঝি ?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললুম : কোথায় আর দেখতে পেলুম।

আমি দেখেছি। সে গল্পও আপনাকে বলব।

হাতির গল্পটা আগে শেষ করুন।

হাতি এরা কেন ধরে জানেন তো ?

বোধহয় পোষবার জন্যে।

ভদ্রলোক হাহা করে হেসে উঠলেন। অট্টহাস্য। তারপর বললেন : বড় লোকের মতো উত্তর দিলেন দেখছি।

বোকার মতো যে বলেন নি, এই আমার ভাগ্য।

বললেন : যে যুগে মানুষের পেট চলে না, সে যুগে এত আড়ম্বর করে হাতী ধরবে পোষবার জন্যে ! বেশ বলেছেন আপনি।

তবে কি চিড়িয়াখানায় বিক্রি করবে ?

চিড়িয়াখানা, সার্কাস পার্টি, এদেশের মন্দিরেও চাই। তার উপর রাজা মহারাজাদের দরকার শিকারের জন্যে। হাতি ধরবার

আরও একটা কারণ আছে, সেইটেই প্রধান। দলে দলে বুনো হাতি এসে ধান আর আখের ক্ষেতের বড় ক্ষতি করে। দেশের গরীব প্রজাকে তো হাতির উৎপাত থেকে রক্ষা করতে হবে।

ভদ্রলোক বলে চললেন: কারাপুরের জঙ্গলে গাছের চেয়ে হাতি বেশি। বাঁশের পাতা খেয়ে তারা বাঁচে, আর মাঝে মাঝে লোকালয়ে নেমে আসে মুখ বদলের জন্যে। হাতি ধরার ওস্তাদেরা সব ওৎ পেতে আছে, শয়ে শয়ে বুনো লোক রোজ তাদের লক্ষ্য করছে। কোথা থেকে লক্ষ্য করবে, তাও ছকে বাঁধা। হাতির দলের সন্ধান যেই পাওয়া গেল, অমনি দেওয়া হল সংকেত। আর কথা নেই, চারিদিক থেকে সেই বুনো লোকগুলো বীভৎস আওয়াজ করে হাতির দিকে এগোতে লাগল। ঢাক ঢোল কাড়া নাকাড়া টিন ক্যানেস্তারা, সঙ্গে অমানুষিক চীৎকার। এ যে কী শব্দ, কানে না শুনলে কল্পনা করা যায় না। ভয়ে হাতিরা পালাবার চেষ্টা করে। তার জন্যে একটি মাত্র পথ। সেই পথে গিয়ে তারা খোঁয়াড়ে আটকা পড়বে। চারিদিকে খাল কাটা, তার একটি গেট। ঢুকলে আর বেরবার পথ নেই। লক্ষ্য রাখতে হয় ওদের দলপতির উপর। সে বেচারা কাবু হলেই আর সবাই কাবু। তাকে অনুসরণ করে সবাই একদিকে যাবে।

তারপর?

ভদ্রলোক নতুন সিগারেট ধরিয়ে বললেন: তারপরেই সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ব্যাপার। হাতির গলায় দড়ি পরানো। মাহুতগুলো অদ্ভুত কুশলী। পুরনো পোষমানা হাতির পিঠে চড়ে এক একটাকে ভুলিয়ে আনে ছোট খোঁয়াড়ে, আর দড়ি পরায়। তারপর আর কী! তাদের চরিয়ে চরিয়ে পোষ মানানো।

অনেকক্ষণ থেকে একজন ভদ্রলোক বাহিরে ঘোরাঘুরি করছিলেন। কঠিন চেহারার মানুষ। মাঝে মাঝে দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমাদের দেখছিলেন। ঠিক এই সময়ে আর একবার মুখ বাড়ালেন। বললুম: কাকে চাই আপনার?

সঙ্কুচিতভাবে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন: আপনারা কি উপরে রিটায়ারিং রুমে আছেন?

বললুম: হ্যাঁ।

কত নম্বর ঘরে?

আপনার দরকার?

দরকার আর কী, এমনিই জিজ্ঞাসা করছিলুম।

শিকারী ভদ্রলোক বললেন: স্টেশন মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করুন।

ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে বললেন: তারপর আর একটা কী বলব বলেছিলুম?

দশেরার গল্প।

ও হ্যাঁ। ও একটা শোভাযাত্রা। ভুখা মিছিল দেখেছেন?

দেখেছি।

বড় বাজারে মারওয়াড়ীর বিয়ের মিছিল?

তাও দেখেছি।

তফাৎ বলুন তো।

জাঁকজমক।

ঠিক ধরেছেন। কল্পনা করতে আপনার একটুও কষ্ট হবে না। সে মারওয়াড়ীর ব্যাপার, আর এ রাজার। জাক বলে জাঁক, মাথা ঘুরে যায়, দম যায় আটকে। প্রতিপদ থেকে সাজ সাজ রব। দোকান পাট ঘর বাড়ি রাস্তা পথ ঘাট সব সাজানো। যত ফুল তত বাতি। শুনতে পাই, লোকে ঘরের ভিতরেও সাজায়। যার আলমারি শো কেস আছে, সে সেগুলো ঝেড়ে মুছে খেলনা পুতুল দেখবার দেখাবার মতো সব জিনিস দোকানের মতো সাজাবে। যেন ছোট ছোট সব জাদুঘর। তারপর আত্মীয় বন্ধু আর পড়শিকে দেখাবে নেমন্তন্ন করে। মিষ্টিমুখ করাবে। একজিবিশন তো দেখেছেন, সেও চলছে। কার্নিভাল। দশেরার দিন ষোলকলা পূর্ণ হবে। রাজ-বাড়ির অবস্থা সন্ধ্যেবেলায় একবার বেরিয়ে দেখবেন। বিজলির

আলোয় এখনও তেমনি সাজানো। মহারাজা এক বিরাট হাতিতে চাপবেন। যেমন হাতির সাজ, তেমনি মাহুতের, হাওদার ভিতর রাজাও বসবেন সেজে গুজে। চাপরাশি বরকন্দাজ ফৌজ পেয়াদা, সঙ্গে রাজ্যের ছোট বড় সমস্ত প্রজা। যেন জগন্নাথদেবের রথের দড়ি ধরতে এসেছে।

তারপর ?

তাবপর আর কী! শহরের প্রান্তে একটা জায়গা আছে, সেইখানেই শোভাযাত্রার শেষ।

এত সব আপনি কখন দেখলেন ?

কখন ? দীর্ঘদিন তো এদেশে পড়ে আছি।

শুধু বাইসনের লোভে ?

ভদ্রলোক হাসলেন, বললেন : দুনিয়ায় লোভের শেষ নেই। শেষ থাকলে দেশটা বেশ হত। শুনেছি স্বর্গে লোভ নেই বলে লোভীরা সব নরকে যায়। আমারও নরকবাস অনিবার্য।

জনকয়েক ভদ্রলোক এই সময়ে হৈ হৈ করতে করতে ওয়েটিং রুমে এসে ঢুকলেন। বললেন : আপনি এখানে লুকিয়ে আছেন, আর আমরা আপনাকে সাবা শহর খুঁজে বেড়াচ্ছি।

আমাব তো এখানেই থাকবার কথা ছিল।

আসুন আসুন।

ভদ্রলোক আমাকে নমস্কার করলেন, বললেন : আচ্ছা ভাই।

বলে বেরিয়ে গেলেন।

আমিও বাহিরে গেলুম। খানিকটা এগিয়ে দেখলুম, সবাই মিলে একটা জিপে উঠলেন। এই জিপেই বোধহয় ব্যাঙ্গালোরে ফিরবেন।

বইএর দোকানের কাছে দেখলুম, সেই ভদ্রলোক, আমাকে যিনি ঘরের নম্বর জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি তাঁকে এড়িয়ে চলে গেলুম। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি যে আমার উপরে সজাগ আছে, তা বুঝতে একটুও কষ্ট হল না। এ আবার কোন্ আপদ ?

১৫

পরদিন ভোর ছটাতেই আমি তৈরি হয়ে নিচে নামলুম। উপর থেকেই দেখতে পাচ্ছিলুম যে আমাদের ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে। সবাই তৈরি হচ্ছেন। বেয়ারাকে বকশিস দিয়ে শুধু চা পাওয়া গেছে। রুটি মাখন আর সিদ্ধ ডিম রাতেই কিনে রেখেছিলুম। কিছু খাওয়া গেছে, কিছু সঙ্গে যাবে। কলা আর আপেলও কিছু কিনে রেখেছি।

কিন্তু নিচে নেমেই মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। সেই লোকটা। কঠিন মুখশ্রী, রুক্ষ বেশবাস, মাথার পাগড়িটা আজ নোংরা দেখাচ্ছে। এই লোকটার জন্যই কাল রাতে আমি অনেকক্ষণ ঘুমোতে পারি নি। দরজা খুলে বাহিরে এসে বারান্দায় পায়চারি করেছি অর্থহীন ভাবে। আশঙ্কা ছিল, লোকটাকে বারান্দায় দেখতে পাব, সামনের কিংবা পিছনের বারান্দায়। সিড়ি পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছি, নিচে তাকিয়ে দেখেছি, নিজের দু'কান উৎকর্ণ রেখেছি পদধ্বনি শোনবার জন্য। কিন্তু কিছুই দেখতে পাই নি, শুনতেও পাই নি কোন শব্দ। তাপ্তি ও স্বাতি হয়তো নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে, মামা মামীও ঘুমিয়েছেন। এক সময় ক্লান্ত দেহে ঘরে এসে আমিও ঘুমিয়ে পড়েছি।

আমার এই দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। কেউ না জানলেও আমি তাপ্তির ভয়ার্ত দৃষ্টি দেখেছি। দেখেছি তার দুর্ভাবনার ইঙ্গিত। কাল সন্ধ্যাবেলায় আমরা যখন বেরুচ্ছিলুম, এই লোকটা আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি দেখলুম, তাকে দেখতে পেয়েই তাপ্তি চমকে উঠল। শক্ত হয়ে সোজা চলতে লাগল। কিছুতেই আর কোনদিকে তাকাল না।

সারা রাস্তায় সে একটা কথাও বলে নি। প্রদর্শনীতে আমার কাছ ঘেঁষে চলেছে। সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল চারিদিকে। আমিও রেখেছিলুম। সেই লোকটাকে আমরা দেখতে পেয়েছি। দূরে দেখেছি। সে কাছে আসে নি, কথা কয় নি, কিন্তু নজর রেখেছে আমাদের উপর।

ভেবেছিলুম, তাপ্তিকে কিছু জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু তা পারি নি। মনে হয়েছে, সে আমার ধৃষ্টতা হবে। সে নিজে থেকে যদি কিছু না বলে তো আমাকে নীরবেই থাকতে হবে।

প্রদর্শনীতে মামী আতর পেলেন না। এরা আতর বলে না, বলে চন্দনের তেল। সে তেল নাকি কারখানায় গিয়ে কিনতে হবে। চন্দন সাবান আছে, সে সাবান কলকাতাতেও পাওয়া যায়। মামী চন্দন কাঠের কিছু জিনিস কিনলেন। একে ওকে দেবার জন্য ভাল জিনিস। ড্রয়িং রূমেও রাখা চলবে।

খেয়ে দেয়ে আমি তাপ্তির ঘরে বই দেখব ভেবেছিলুম। কিন্তু সে মন আমার ভেঙে গেছে। তাপ্তির ভয় দেখেই আমারও ভাবনা হয়েছে। সেই ভাবনা দূর না হলে বই পড়ার বাসনা আমার জাগবে না।

সে লোকটা আমার দিকে এগিয়ে এল না, বরং সরে গেল আমার সামনে থেকে। আমি নিশ্চিন্ত হতে পারলুম না। আমার বুঝতে বাকি নেই যে সে তাপ্তিকেও এমনি দেখা দিয়ে সরে যাবে। তার উদ্দেশ্য জানি না, কিন্তু সেটা যে ভাল নয় তা অনুমান করতে পারি। ভাল হলে এমন লুকোচুরির দরকার ছিল না, তাপ্তিও তাকে দেখে ভয় পেত না।

একবার ভাবলুম, সেই লোকটাকেই গিয়ে চেপে ধরি। সেই বলুক তার উদ্দেশ্যের কথা। কিন্তু—

কিন্তু কী! কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে না তো! না না, তা কখনোই হতে পারে না। তাপ্তির জীবনে এমন কোন

দুর্ঘটনার কথা আমি বিশ্বাস করতে পারব না। তবে কেন লোকটা আসে, কেন ভয় দেখায়, কেন পালিয়ে যায়!

আমাদের ট্যাক্সির ড্রাইভার এগিয়ে এসে বলল: গাড়ি এই দিকে বাবু।

গাড়ি কোন দিকে আমি জানতুম, কিন্তু আমার আচরণে অন্যরকম মনে হয়েছে। সে কথা স্বীকার না করে বললুম: খাবার জিনিসপত্র বোধ হয় কিছু সঙ্গে নিতে হবে।

ড্রাইভার বলল: হাসানে হোটেল আছে বটে, তেমন ভাল নয়।

তাহলে ওপর থেকেই নিয়ে আসি।

আবার আমি উপরে গেলুম। উদ্দেশ্য শুধু খাবার আনাই নয়, তাপ্তিকে একটু আড়াল করে রাখা, একটু ভুলিয়ে রাখা। ঐ লোকটাকে দেখতে পেলে হয়তো সারাদিনটা তার মাটি হবে।

তাপ্তি তৈরি হয়ে স্বাতির অপেক্ষা করছিল। মামা অপেক্ষা করছেন মামীর। ঘরের এক কোণায় বসে মামী হাত ঘুরিয়ে চলছেন। সারাদিনের নামে বেরনো, জপতপটা সংক্ষেপে সেরে বেরলেও মনে শান্তি থাকে।

তাপ্তি বলল: আপনি ফিরে এলেন যে?

আসল জিনিসটাই সঙ্গে নেওয়া হয় নি।

সে আবার কী?

খাবার।

খাবারকে আপনি আসল জিনিস বলছেন!

আসল জিনিস নয়! খাদ্যের প্রয়োজন না থাকলে পৃথিবীটা অন্যরকম হত। বনের পশুও মানুষ হয়ে যেত।

তা হত। কিন্তু সব মানুষ মানুষ হত না। পেটের ক্ষুধা ছাড়াও যে মানুষের অনেক ক্ষুধা আছে। পেটের ক্ষুধায় মানুষ অসহায় হয়, অসৎ নয়।

এর বেশি তাপ্তি বলতে চাইল না। বলা হয়তো শোভনও

হত না। কিন্তু আমার মনে হল, তাপ্তি শুধু দেহের ক্ষুধাকেই ঘৃণা করছে না, করছে আরও অনেক ক্ষুধাকে। দেহের ক্ষুধা চিরকালই ছিল, থাকবেও চিরকাল। কিন্তু এই শতাব্দীর মানুষ নানা ক্ষুধায় উন্মত্ত হয় উঠেছে। পৈশাচিক লোভ, নারকীয় যন্ত্রণা।

তাপ্তিকে আমার ভুলিয়ে রাখার দরকার। কোনদিকে না চেয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠবে। সারাক্ষণ অন্যমনস্ক থাকবে। তারপর স্টেশন ছেড়ে গেলেই আমার কর্তব্যের শেষ। বললুম: আপনার তো পুরাতত্ত্বে অনুরাগ। আমাদের ভালই হল। আজ অনেক কথাই আপনার কাছে জানতে পাব।

আমাকে লজ্জা দেবেন না।

লজ্জা কিসের ?

লজ্জা নয়! আমি তো জানতে বেরিয়েছি। শিখতে চাই। গুরুর দরকার আমারই তো সবচেয়ে বেশি।

গুরু তো আর আমরা হতে পারব না, কাজেই আমরা আপনার চেলা হয়ে গেলুম।

মামা বাহিরে বেরচ্ছিলেন, আমাকে দেখতে পেয়ে ভারি খুশী হলেন। বললেন: এই যে গোপাল। খাবারের জিনিসপত্র নিয়ে তোমার মামী ভারি বিপদে পড়েছেন।

সেইজন্যেই তো আমি দাঁড়িয়ে আছি।

বলে ভিতরে ঢুকে পড়লুম। মামী টিফিন বাস্কেটটা গুছিয়ে নিচ্ছিলেন। আমি সেটা তাঁর কাছ থেকে নিলুম, হাতলওয়ালা কুঁজোটাও নিলুম।

মামী বললেন: আহা তুমি কেন বইবে!

বললুম: তাতে কী হয়েছে!

কিন্তু ঘরের বাহিরে আসতেই তাপ্তি ছোঁ মারল। বেতের বাস্কেটটা কেড়ে নিল একেবারে অতর্কিতে। আমি আপত্তি করবার আর অবকাশ পেলুম না। স্বাতিও বাহিরে ছিল। সে শুধু হাসল।

আমি সকলের আগে সিঁড়ি দিয়ে নামছিলুম। উপর থেকে ড্রাইভারকে বলেছিলুম গাড়িটা কাছে আনতে, যত কাছে আনা যায়। এই একটুখানি পথ কি তাপ্তিকে লুকিয়ে রাখতে পারব না!

নিচে নেমে আমি কতকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলুম। ধারে কাছে সেই লোকটাকে কোথাও দেখতে পাই নি। মনে হয়েছিল, আর আসবে না। বোধহয় ভয় পেয়েছে। কিন্তু সে ঠিক সময় মতোই দেখা দিল। গাড়ি ছেড়ে যখন বেরিয়ে যাচ্ছে, একটা থামের আড়াল থেকে সে সরে দাঁড়াল। তাপ্তি আজ দেখতে পেয়েও চমকাল না। আজ সে বুঝতেই দিল না যে কিছু হয়েছে। সে বুঝি এর জন্য প্রস্তুত ছিল।

অল্প একটু এগিয়েই ড্রাইভার পেট্রল নিল। টাকা নিল মামার কাছে। তারপর আমাদের যাত্রা শুরু।

বেশিক্ষণ প্রভাত হয় নি। ধীরে ধীরে পৃথিবীর ঘুম ভাঙছে। সোনালী রোদের দিকে তাকিয়ে তাপ্তি বলল: আজকের সকালটি ভারি মিষ্টি, তাই না!

স্বাতি হলে তার কানে কানে বলতুম, মিষ্টি আরও অনেক কিছু আছে। কিন্তু তাপ্তিকে তা বলা চলে না। উত্তরে বললুম: রোদের রঙ যে এখনও সোনালী।

রৌদ্র ক্রমে প্রখর হবে, পৃথিবী জাগবে, কলরব হবে কোলাহলে পরিণত। তখন এই যাত্রাটি এমন মিষ্টি মনে হবে কিনা, কে জানে।

তাপ্তি বলল: রূপোলি রোদ বুঝি আপনার ভাল লাগে না?

রূপোলি রোদে আলো বেশি। যা দেখতে চাই না, তাও দেখতে পাই।

তাপ্তি আমার মুখের দিকে চাইল। তারপর আর কোন উত্তর দিল না।

পিছন থেকে মামা বললেন: গোপাল যেন হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গেছ।

লোকে বড় বদনাম করছে।

কিসের বদনাম ?

বেশি বকার জন্যে। অনেক কিছু জানা তো পাপ নয়, এখন দেখছি বলাটা পাপের কাজ।

মামা খানিকক্ষণ হাসলেন, তারপর বললেনঃ তুমি স্বাতির কথা বলছ!

তাড়াতাড়ি বললুমঃ স্বাতি তো একটা নয় মামাবাবু, গোটা দেশটাই তো স্বাতিতে ভর্তি।

স্বাতি বলল ঃ গোপালদা বুঝি একটা!

এখন তো একটাই মনে হচ্ছে।

ফাঁকা রাস্তায় আমাদের গাড়ি সবেগে ছুটে চলেছে। মসৃণ প্রশস্ত পথ। এ পথে বাধা নেই, উৎকণ্ঠা নেই, নিশ্চিন্ত নিরাপদ পথ। গতির সঙ্গে কল্পনাকেও উড়িয়ে দিতে ইচ্ছা করে। মামা বললেন ঃ ফাঁকি দিলে চলবে না গোপাল, তুমি গল্প বল।

ড্রাইভার বলল ঃ শ্রীরঙ্গপাটনা আমরা ফেরার সময় দেখব।

মামা বললেন ঃ এখন নয় কেন ?

রোদ বাড়বার আগেই শ্রবণবেলগোলা পৌঁছতে হবে। তা না হলে কষ্ট পাবেন।

আর একটা আশঙ্কার কথা আমাদের মনে হল না। ফিরতে দেরি হলে যে জায়গাটা দেখাই হবে না। ফেবার পথে দেখার কিছু না থাকলে সোয়া শো মাইল পথ কত নিশ্চিন্তে আসা যেত। সর্বত্র আমাদের উদ্বেগ থাকবে। হয়তো ড্রাইভারের এ একটা চাল। সন্ধ্যের আগেই সে বাড়ি ফিরতে পারবে, রাত করবার উপায় নেই।

আমরা একটা নয়, দুটো পুল পেরিয়ে গেলুম। ড্রাইভার বলল ঃ শ্রীরঙ্গপাটনা আমরা ছেড়ে এলাম।

এ তাহলে কাবেরীর পুল। দুভাগে বিভক্ত হয়ে কাবেরী

শ্রীরঙ্গপত্তনকে ঘিরে রেখেছে। টিপু সুলতানের রাজধানী। এখন তাহলে সে গল্প থাক।

মামা বললেনঃ কিছুক্ষণ তো নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। গোপাল এইবারে শুরু কর।

আমার সেই শিকারী ভদ্রলোক ও তাঁর গল্পের কথা মনে পড়ল। হাতি ধরার গল্প নয়, তাঁর ভ্রমণের গল্প। টৌনুর আর মেলুকোটের কথা। বেশি নয়, তিরিশ মাইল পথ। এই রাস্তার উপরেই। মামাকে আমি মেলুকোটের গল্প বললুম।

মেলুকোটের কথায় রামানুজের কথা এসে পড়ে। রামানুজ তখন শ্রীরঙ্গমে তাঁর বৈষ্ণব মত প্রচার করছেন। বহু লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করছে। ত্রিচিনপল্লীর শাসনকর্তা কৃমিকান্ত চোল এ সব সহ্য করতে নারাজ। রামানুজকে হত্যা করার আদেশ দিলেন। এই সংবাদ পেয়ে রামানুজ পলাতক হলেন।

তারপর তাঁকে যাদবপুরীতে দেখা গেল। এ স্থান মেলুকোটের রাজার অধীন। রাজা বল্লাল জৈন ছিলেন, কিন্তু উদারচেতা ও সাধুভক্ত বলে রামানুজকে আশ্রয় দিতে আপত্তি করেন নি।

আমি বাঙলায় গল্প বলছিলুম। এইবার ইংরেজীতে তার সারমর্ম তাপ্পিকে শুনিয়ে দিলুম। তাপ্পি বলল ঃ রামানুজের সম্বন্ধে অনেক দৈব গল্প আছে।

সত্যি নাকি!

ধর্মে অন্ধ বিশ্বাস না থাকলে আপনারা নিশ্চয়ই হাসবেন।

বললুম ঃ হাসব না, আপনি বলুন।

তাপ্পি বলল ঃ প্রথম গল্প হল ব্রহ্মদৈত্যের। রাজকন্যাকে ব্রহ্মদৈত্যায় পেয়েছে। কত ঝাড় ফুঁক চিকিৎসা, কত শান্তি স্বস্ত্যয়ন। কত যাগ যজ্ঞ—সব বৃথা। সারা ভারতের বৈদ্য ও ব্রাহ্মণেরা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। রাজকন্যার জীবনের ভরসা কিছুতেই

পাওয়া গেল না। এই সময়ে রামানুজ এলেন রাজা বল্লালদেবের প্রাসাদে। বললেন, তিনি রাজকন্যাকে রক্ষা করতে পারেন। তথাস্তু। রামানুজ মন্ত্র পড়লেন, ব্রহ্মদৈত্য যেন পালাতে পথ পায় না। দেখতে দেখতেই রাজকন্যা তাঁর পুরনো স্বাস্থ্য ফিরে পেলেন। আর রাজা হলেন বৈষ্ণব, তাঁর নাম হল বিষ্ণুবর্ধন।

মামা বললেন : কী গল্প গোপাল ?

আমি বাঙলায় সেই গল্প শোনালুম। তারপর তাপ্তির দিকে চেয়ে বললুম : দ্বিতীয় গল্প ?

তাপ্তি বলল : একটু ভূমিকা আছে। সেটুকু বোধহয় ইতিহাস। রাজা বৈষ্ণব হওয়াতে জৈন আচার্যরা খুশী হতে পারলেন না। রাজাব কাছে নানান নালিশ রোজ আসতে লাগল। রাজা রামানুজকে বললেন, গুরুদেব, এখন উপায় ? গুরু বললেন, সবাইকে তর্কে ডাকো। বড় বড় জৈন পণ্ডিতরা এগিয়ে এলেন। কিন্তু হেরে গিয়ে কেউ বৈষ্ণব হলেন, কেউ দেশ ছেড়ে পালালেন। যাদবপুরীর জৈন মন্দিরের জায়গায় নারায়ণ স্বামীর নতুন মন্দির উঠল। এই যাদবপুরীরই বর্তমান নাম টোন্নুর। এরপর রামানুজ একদিন স্বপ্ন দেখলেন। নারায়ণ স্বামী সামনে আবির্ভূত হয়ে বলছেন, বৎস, তুমি মেলুকোটে যাও। সেখানে বিগ্রহ আছে রমাপ্রিয়। সেই মন্দিরটি তোমাকে সংস্কার করতে হবে। আর কথা নেই। সকালে উঠেই রামানুজ মেলুকোট যাত্রা করলেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছে শুনলেন যে উত্তরাপথের সেনাপতি মেলুকোট লুণ্ঠন করে মন্দিরের বিগ্রহটিও নিয়ে গেছে। রামানুজ উত্তরাপথে ছুটলেন। উপস্থিত হলেন রাজসভায়। রাজা নির্মম নন, বললেন, আপনার বিগ্রহ আপনি চিনে নিয়ে যান। অসংখ্য বিগ্রহ এনে তাঁর সামনে রাখা হল। কিন্তু রমাপ্রিয়র বিগ্রহ সেখানে নেই। তিনি ধ্যানে জানলেন যে সে বিগ্রহ রাজকন্যার কাছে। দিবসে তাঁর খেলনা, রাতে তাঁর সহচর। দেবতা মানবরূপে রাজকন্যার মনোরঞ্জন করেন।

রামানুজ মন্ত্রবলে এই বিগ্রহকে আকর্ষণ করে আনলেন। বাহুবন্ধনে বন্দী করে মেলুকোটে নিয়ে এলেন।

তাপ্তি থেমেছিল, আমি বললুম : তারপর ?

তারপর : তাপ্তি হাসল নির্মল হাসি : ঘোড়া ছুটিয়ে রাজকন্যা এলেন রামানুজের কাছে। কিন্তু রাজকন্যা আব স্বতন্ত্র রইলেন না ; মেল্‌কোট পর্বতের নিকট তাঁর দেহ বিগ্রহের সঙ্গে লীন হয়ে গেল। বিশ্বাস না হয়, সেইখানে গিয়ে দেখে আসবেন। আজও সেখানে একটা স্মৃতি-স্তম্ভ আছে।

মামা বললেন : তোমরা কথা এত আস্তে বল যে পেছনে আমরা কিছুই শুনতে পাই নে।

তাপ্তির গল্পটা আমি জোরে জোরে তাঁকে শোনালুম। রামানুজ মন্দির সংস্কার করিয়েছিলেন। আর বারো বৎসর সেই মন্দিরে থেকে ধর্ম প্রচাব করেছিলেন।

তারপরে কি মারা গেলেন ?

না। মারা গেল ত্রিচিনপল্লীর শাসনকর্তা কৃমিকান্ত চোল। সেই খবর পেয়ে রামানুজ তাঁর প্রিয় মন্দির শ্রীরঙ্গমে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে তিনি একশো কুড়ি বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

মামা জিজ্ঞাসা করলেন : এ কতদিন আগের ঘটনা বলতে পার ?

প্রপন্নামৃত বলে একটি গ্রন্থ আছে। তাতে কিছু সন তারিখ পাওয়া যায়। ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে চিঙ্গলপুট জেলার শ্রীপবম্বদুব গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতার নাম কেশব ত্রিপাঠী। তিনিও একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। পনর বছর পর্যন্ত রামানুজ পিতার নিকট বেদাধ্যয়ন করেন। তারপর শ্রীরঙ্গমে আচার্য মহাপূর্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গের শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। বিষ্ণুভক্তি তাঁর বাল্যকাল থেকেই। মাদুরায় বৈষ্ণব মতে দীক্ষা গ্রহণ করে তিনি কাঞ্চীতে বরদরাজ স্বামীর মন্দিরে আসেন। সেইখান থেকেই তাঁর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রচার।

স্বাতি বলল : কিছু যেন শোনা শোনা মনে হচ্ছে।

মামা বললেন : বাদানুবাদের গল্প তো একদিন শুনিয়েছিলে।

মামী বললেন : মেলুকোটের মন্দির আমরা দেখব না?

ড্রাইভারকে আমি সেই কথা জিজ্ঞাসা করলুম। ড্রাইভার বলল : সে পথ তো আমরা অনেকক্ষণ আগে ছেড়ে দিয়েছি।

পথের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, সত্যিই তাই। সেই মসৃণ বাঁধানো পথ ছেড়ে আমরা অন্য পথ ধরেছি। এ পথ খুব প্রশস্ত নয়, তত মসৃণও নয়। তবু একে খারাপ বলব না। কিছু রুক্ষ কিছু অসমতল হলেও মোটর চলবার উপযুক্ত পথ। বাঙলা দেশে এমন পথও খুব কম আছে।

সেই যমজ পাহাড় ফ্রেঞ্চ রক্স্ আমরা দেখতে পেলুম না। হায়দর আলিকে সাহায্য করবার জন্য ফরাসী সৈন্য নাকি এইখানেই তাঁবু ফেলেছিল। মতি তালাও দেখাও আমাদের হল না। ন শো বছর আগে দুটো পাহাড়ী নদীকে বেঁধে এই সরোবরের সৃষ্টি হয়েছিল। এরই কাছে সেই টোন্নুর গ্রাম, একদা যার নাম ছিল যাদব গিরি। আজ আর সেই সীমান্ত দুর্গের চিহ্ন নেই।

মেলুকোট কিন্তু সগৌরবে বেঁচে আছে। সুন্দর সরোবরটির নাম কল্যাণী। ইতিহাস বলে, এরই তীরে রামানুজ খুঁজে পেয়েছিলেন নারায়ণের বিগ্রহ মূর্তি। বেদপুষ্করিণী সেই পাহাড়ী ঝর্ণাটির নাম। প্রাচীন দুর্গের দেওয়াল আজ ভেঙে ভেঙে পড়ছে। লতাগুল্মে সব ঢেকে গেছে। কিন্তু সেই বিশাল সিংহদ্বার ঢাকা পড়েনি। গোপাল রায় সিংহদ্বার, অসম্পূর্ণ, তবু অপূর্ব। এখানে সেখানে কত শিলা-লিপি ছড়িয়ে আছে। কত বীরত্বের কত গৌরবের কথা। এক হাজার বছরের ইতিহাস।

ড্রাইভার বলল : চৈত্র মাসে মেলুকোট আসতে হয়, বৈরমুদি দেখতে। দেবতার শোভাযাত্রা বার হয়। তাঁর মাথায় হীরের মুকুট। সাত শো বছর আগে এক হয়শাল রাজা এই মুকুট দিয়েছিলেন। আজ টাকায় তার দামের হিসেব হয় না।

রামানুজেরও দানের হিসেব হয় না। বৌদ্ধ ও জৈনদের হাত থেকে হিন্দুদের রক্ষা করবার জন্য শঙ্কর প্রচার করলেন তাঁর মায়াবাদ। বললেন, জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অভিন্ন। সাধারণ লোকে ভাবল, জীবমাত্রেই পূর্ণ ব্রহ্ম ও জগৎটা মিথ্যা। কাজেই আর চাই কী! যথেচ্ছ জীবন যাপন কর।

রামানুজ এই সব ভ্রান্ত মানুষের নাস্তিকতা দেখে উদ্বিগ্ন হলেন। বুঝতে পারলেন যে সাধারণ মানুষের উপযোগী করে ধর্মের প্রচার আবশ্যক। তিনি কোন নতুন ধর্মমত প্রচার করেন নি। বহু প্রাচীন মতকে রূপান্তর দিয়েছেন মাত্র। ভারতে একদা পঞ্চরাত্র বা ভাগবত মত বলে যা প্রচলিত ছিল, তারই অন্যরূপ। তিনি চিৎ অচিৎ ও ঈশ্বরকে স্বীকার করেছেন। চিৎ ও অচিতের সঙ্গে ঈশ্বরের ভেদ অভেদ ও ভেদাভেদ—এই তিনই আছে। ঈশ্বরের পাঁচ রূপ। তাঁর উপাসনাও পাঁচ প্রকার। ঈশ্বর তর্কের জিনিস নন, তিনি ধর্মের। বুদ্ধি দিয়ে তাঁর দর্শন নেই, হৃদয় দিয়ে তার উপলব্ধি। ভক্তি দিয়ে প্রেম দিয়ে তাঁর প্রসাদ ভিক্ষা। রামানুজ সাধারণ মানুষের জন্য বললেন:

অকিঞ্চনোঽনন্যগতিং শরণং
তৎপাদমূলং শরণং প্রপদ্যে!

হে শরণ্য, আমি অকিঞ্চন ও অনন্যগতি হয়ে তোমার পাদমূলে শরণ নিচ্ছি।

সাধারণ মানুষ তাঁকে উত্তর দিল:

শ্রীমান রামানুজ স্বামী শেষ অবতার।
কৃপা করি প্রকটিলা তারিতে সংসার॥

দেবতা তো মানুষ হয়ে জন্মায় না, মানুষই দেবতা হয় কর্মে।

১৬

আমরা শ্রবণবেলগোলার দিকে ছুটেছি। প্রত্যূষের আলস্য আর পৃথিবীর গায়ে লেগে নেই। পবিচ্ছন্ন আলোয় চারিধার একাকার হয়ে গেছে। দুধারের ক্ষেতে প্রান্তরে অনেক মানুষের পরিশ্রমেব বিজ্ঞাপন।

তাপ্তি আমায় আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা কবল: শ্রবণবেলগোলা তো জৈনদেব তীর্থস্থান।

বললুম: তীর্থের লোভে আমবা যাচ্ছি না।

লজ্জিত ভাবে তাপ্তি বলল: আমি আপনাব কথা ভেবে বলি নি। মামা মামীব কথা ভেবেছেন তো! তাঁরাও কতকটা দেশ দেখতেই বেরিয়েছেন। তীর্থদর্শনটা উপরি লাভ। কিংবা তাব উল্টো। তীর্থমানসে বেবিয়েছেন, দেশ দেখা উপবি লাভ।

তাপ্তি যেন একটু আশ্চয হল। বললুম: মামীব লক্ষ্য ছিল রামেশ্বর তীর্থ। সে তো দেখেইছেন, তার উপর শ্রীবঙ্গম, মাদুবা, কন্যাকুমারী হয়ে গেছে। এদেশে চামুণ্ডি দর্শনও হল। যাত্রা শেষ হবার আগে যদি আব কিছু দেখিয়ে দিতে পারি, তাহলে সাত খুন মাপ হয়ে যাবে।

আর—

মামাবাবু? মানুষটা সেকেলে বটে, মনটা আধুনিক। এ যুগেব অনেক কিছু তিনি ভালবাসেন। মামীব মতো কনজারভেটিভ নন।

পিছন থেকে মামাবাবু বললেন: কী কথা হচ্ছে গোপাল?

ভেবেছিলুম, গাড়িব শব্দে মামা কিছু শুনতে পাচ্ছেন না। এখন মনে হল, বোধহয় অনেক কিছুই শুনতে পেয়েছেন। বললুম: শ্রবণবেলগোলার কথা উঠেছে। আমবা কেন জৈন তীর্থ দেখতে যাচ্ছি।

মামা আশ্চর্য হয়ে বললেন : এ আবার তীর্থ নাকি !

তীর্থস্থানই তো !

আমি ভেবেছিলুম, কোন দ্রষ্টব্য স্থান।

মামী বললেন : তীর্থস্থান কি দেখবার জায়গা নয় !

না না, আমি তা বলছি না। আমি বলছি, দ্রষ্টব্য স্থানও এমন অনেক আছে, যা তীর্থ নয়। এও বোধ হয় সেই রকম কিছু।

চুপি চুপি স্বাতি বলল : আমারও বাবা সেই ধারণা।

সেই ধারণা তো ! খুবই স্বাভাবিক। ছবিতে অত বড় একটা বিরাট মূর্তি দেখে মনে হয়েছে যে মূর্তিটা মিশরের মতো। কবে কোন কালে কেউ তৈরি করেছে, এখন শুধু দেখতেই যাওয়া।

মামা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসলেন : তোমার ইতিহাস কী বলে ?

আমি স্বাতির দিকে তাকালুম। সে বলল : তোমার প্রশ্ন শুনে গোপালদা ভারি খুশী হয়েছেন বাবা।

মামা হাসলেন। কিন্তু আমি দমে গেলুম না। বললুম : না জানলে খুশী হতুম না। পরীক্ষা দিতে এখনও আমার ভাল লাগে। লিখতে না পারলেও নতুন কিছু জানা যায়। জানাতেই তো আনন্দ !

মামা আমাকে সমর্থন করলেন, বললেন : ঠিকই বলেছ। অজ্ঞানের যে আনন্দ সে তো অন্ধের হাতি দেখার মতন। সে আনন্দের আর মূল্য কী !

স্বাতি বলল : এইবারে শুরু কর।

হেসে বললুম : তোমার অনুমতির অপেক্ষা আমি করছি না, মামাবাবুর আদেশ পেয়েছি। আমি ভাবছি, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কথা বলব কি না। সে ইতিহাস, না কি বদন্তী, সে কথা সঠিক জানা নেই।

মামা বললেন : কী রকম ?

বললুম : এ অঞ্চলে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে অশোকের পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। লোকে বলে,

এই দেশে তিনি তাঁর শেষ জীবন অতিবাহিত করেছেন। এ সম্বন্ধে নাকি শিলালিপি পাওয়া গেছে। সম্রাট অশোকও যে এই স্থান পরিদর্শন করে গেছেন, তারও নাকি প্রমাণ আছে।

সে তো—

প্রায় দেড় হাজার বছরের পুরনো কথা।

তখনও ঐ মূর্তি ছিল?

বোধহয় না। চন্দ্রগুপ্ত জৈন ছিলেন, বা জৈন আচার্যদের এদেশে আনেন, এ কথা বিশ্বাস করাব মতো প্রামাণিক উপাদান নেই। কিন্তু হাজার বছর আগে গঙ্গা বংশের রাজত্বকালে যে জৈন ধর্মের প্রসার লাভ করেছে, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁদের সময়েই শ্রবণ-বেলগোলা দক্ষিণ দেশে জৈন ধর্মের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। মনে হয়, গঙ্গাবাজ রাজমল্লের মন্ত্রী চামুণ্ডরায়ের আমলে এই মূর্তি নির্মিত হয়েছে। সে ঘটনা নবম শতাব্দীব, বোধহয় ৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের।

তাপ্পির দিকে তাকিয়ে দেখালুম, সে খুব মনোযোগ দিয়ে আমার কথোপকথন বুঝবার চেষ্টা করছে। হয়তো কিছুই বুঝতে পাবে নি, তবু বলল: আপনি ইতিহাসের কথা বলছেন, তাই না?

ঠিক তাই। আপনি কি বাঙলা বোঝেন?

না। কতগুলো নাম করলেন, যা ইতিহাসের। তাইতেই মনে হল, আপনি হয়তো ইতিহাসের আলোচনা করছেন।

বললুম: ইতিহাস কিনা জানিনে, লোকে এই সব কথা বলে!

বিস্মিত ভাবে তাপ্পি বলল: কিন্তু আপনি তো কারও সঙ্গে কথা বলেন নি।

উত্তরে আমি হাসলুম।

স্বাতি যে শুনতে পেয়েছিল, তা তার মন্তব্য শুনেই বুঝতে পারলুম। বলল: খুব আত্মপ্রসাদ পেলে তো গোপালদা!

তা একট পেলুম বৈকি। কিন্তু—

কিন্তু কী?

সে কথা মামা মামীর সামনে না বলাই ভাল। সে যে আমাদের কথায় কান পেতে আছে, তার প্রমাণ পেয়ে গেলুম। বললুম ঃ সে কথা থাক।

ছোট ছোট গ্রাম আমরা অনেক ছেড়ে এসেছি। ছোট সমৃদ্ধ গ্রাম। কোন কোন জায়গায় স্কুল দেখেছি, পোস্ট অফিস আর সরকারী ডাক বাংলো। সে সমস্ত জায়গার নাম মানচিত্রে নেই, নেই কোন পুঁথি পত্তরে। তার প্রয়োজনও নেই। আমরা যেখানে যাচ্ছি, আমাদের ড্রাইভার সে জায়গা চেনে। তার কাছে কোন মানচিত্র নেই, তার স্মৃতিতে পথের চিহ্ন আছে। হঠাৎ এক জায়গায় পৌঁছে সে মোড় ফিরল। বাঁধানো পথ ছেড়ে অনাদৃত পথ। অসমতল রুক্ষ কঠিন। বললুম ঃ কোথায় চললে?

ড্রাইভার বলল ঃ যে পথে বাস আসে, সে পথ আমরা অনেক আগে ছেড়ে দিয়েছি। এ হল সংক্ষেপের রাস্তা। শ্রবণবেলগোলা থেকে আমরা বড় সড়ক ধরব।

এই কথা বলতে না বলতেই তাকে থামতে হল। বললুম ঃ কী হল?

চাকায় হাওয়া নেই।

লাফিয়ে নেমে সে পিছন থেকে পাম্প বার করল। হাওয়া ভরল সামনের চাকায়। তারপর পাম্পটা রেখে এসে চালাতে বসল।

ছায়াচ্ছন্ন গ্রাম্য পথে আমরা ঘুরে ঘুরে চলতে লাগলুম।

খানিকটা এগিয়েই আবার সে থামল। বললুম ঃ আবার কী হল?

আরও হাওয়া দিতে হবে।

আর কি চাকা নেই?

আছে।

কিন্তু চাকা সে বদলাল না। আমার সন্দেহ হল যে সত্যিই তার আর চাকা নেই। তাই হাওয়া ভরেই এগোচ্ছে। মামা উদ্বিগ্ন

হলেন। এখানে অচল হলে কিছুতেই চলবে না। আশ্বাস দিয়ে ড্রাইভার বলল : এবারে সামনে দেখুন।

সামনে! সামনে তো একটা ছোটখাট পাহাড় দেখছি।

আর তার চূড়োয় ?

তাইতো! ঐ তো শ্রবণবেলগোলার গোমতেশ্বর মূর্তি। ছবিতে তো ঠিক এমনটিই দেখেছি। কিন্তু এত ছোট কেন!

কাছে গেলে বড় দেখবেন।

পিছন থেকে মামা বললেন : আমাদের কি ঐ পাহাড়ে উঠতে হবে ?

মামা যে ভয় পেয়েছেন, তা তাঁর কণ্ঠস্বরেই প্রমাণ হল। মামী সান্ত্বনা দিলেন। মোটরেই হয়তো পৌঁছে যাব।

ড্রাইভারকে সে কথা জিজ্ঞাসা করতে আমার সাহস হল না। শুনেছি এই পাহাড় নাকি সমুদ্রতল থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার ফুট উঁচু। তবে ভরসা এই যে আমরাও অনেকটা উঁচুতে আছি। চোখের সামনে যা দেখতে পাচ্ছি, তার উচ্চতা পাঁচ শো ফুটও হবে না।

স্বাতি বলল : বেশ মজা লাগছে।

তাতো লাগবেই। মামা কিছু ক্ষুণ্ণ হলেন : এমন জানলে কি—

মামী আবার আশ্বাস দিলেন : অত ভাবছ কেন! আমাদেব তো তীর্থ নয় যে মৃত্যুপণ করে উঠতে হবে। আমরা না হয় নিচেই বসে থাকব।

মামা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন : তাও কি সম্ভব!

গাড়ি আবার আটকাল। বললুম : তোমার চাকা আছে তো পরিয়ে নাও না বাপু।

মামা বললেন : তা কি আর আছে! আমাদেরই ডোবাবে।

মামী বললেন : বেরবার সময় এ সব দেখে বেরতে হয়।

মামা বললেন : এদেরও আক্কেল দেখ না!

পাহাড়ের দূরত্বটা এখান থেকেও অনুমান করা যাচ্ছে না। উপরে উঠবার পথ উল্টো ধারে। যদি হাঁটতেই হয়, তাহলে সবাই মিলে পৌঁছতে পারব তো! হাওয়া ভরতে ভরতে ড্রাইভার আমাদের আশ্বাস দিল: শ্রবণবেলগোলায় পৌঁছে চাকাটা বদলে নেব।

গাড়ি আর আটকাল না।

পাহাড়টা দক্ষিণে রেখে ঘুরে আমরা বাজারের ভিতর এলুম। অন্য দিক থেকে একটা বাঁধানো রাস্তা এসে এইখানে মিলেছে। দুধারে ছোট ছোট দোকান। সেগুলোর শেষ প্রান্তে এসে গাড়ি দাঁড়াল। এইখানে আমাদের নামতে হবে।

কিন্তু মূর্তি কোথায়!

খানিকটা এগিয়ে একখানা বিরাট পাথর দেখতে পেলুম। একখানা পাথরই যেন একটা পাহাড়। তার গায়ে ধাপ কাটা। এঁকে-বেঁকে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। কিন্তু মূর্তি দেখা যাচ্ছে না। তবে কি ঐ মূর্তি পাহাড়ের অন্য ধারে!

কয়েকজন লোক এগিয়ে এসেছিল। কারও হাতে গাইড-বই— শ্রবণবেলগোলা বেলুর হালেবিদ সোমনাথপুর, কারও হাতে ছবি, কেউ প্রশ্ন করছে, গাইড চাই!

স্বাতি বলল: এখানে আবার গাইডের কী দরকার, এই সিঁড়িই তো গাইড।

মামা এই পাহাড়ের দিকে একবার করুণ চোখে চাইলেন। মামী বললেন: ভয় পাচ্ছ কেন, ধীরে ধীরে বেশ ওঠা যাবে।

তাপ্তি আর আমি এগিয়ে গেলুম। স্বাতি আমাদের সঙ্গে এল না।

এখন বুঝতে পারলুম, ড্রাইভার আমাদের শ্রীরঙ্গপত্তন না দেখিয়ে কেন এখানে তাড়াতাড়ি এনেছে। রোদ প্রখর হয় নি। হলে এই পাহাড়ে উঠতে পরিশ্রম বেশি হত।

তাপ্তি বলল: আমরা অনেকটা এগিয়ে এসেছি, ওঁদের আসতে দিন।

পিছন ফিরে আমি সবাইকে দেখলুম। স্বাতি মামা মামীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে উঠছে। ওঁদের সঙ্গে তাপ্তির ভাল লাগবে না। বললুম্‌ঃ তার দরকার নেই। ওঁরা ধীরে ধীরেই আসুন।

ইচ্ছা করলে স্বাতি আমাদের সঙ্গে আসতে পারত।

সে ইচ্ছা নেই বলেই সে পিছনে পড়ে রইল।

তাপ্তির মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল যে স্বাতির ব্যবহারের একটা সঙ্গত কারণ সে খুঁজছে। যে তাকে অত আগ্রহে সঙ্গী হবার অনুরোধ জানিয়েছে, সে কেন পিছিয়ে গেল। তারা সমবয়সী, তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা আনন্দ বেদনাও হবে সমগোত্রীয়। চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর এমন কী ঘটল যে তার সঙ্গ পাবার বাসনা গেল ফুরিয়ে? মনে হল, আমার উত্তরটা সম্পূর্ণ হয়নি। তাই যোগ করলুমঃ স্বাতি ঐ রকমই। তার অনেক আচরণের অর্থ আমি খুঁজে পাই নে।

তাপ্তির ভারি বিস্ময় বোধ হল। আমি তার চেয়েও বিস্মিত হলুম পিছনের দিকে তাকিয়ে। একটা পাহাড়ে আমরা উঠছি। ওধারে ঠিক এমনিই আর একটা পাহাড়। মাঝখানে একটা সুন্দর সরোবর। এরা কল্যাণী বলে। কোথায় যেন দেখেছিলুম যে গোমতেশ্বরের মূর্তি ইন্দ্রগিরি পাহাড়ের উপর। আর ওধারের পাহাড়টার নাম চন্দ্রগিরি। সেটা উঁচু কম। চূড়োর মন্দির দেখতে লোকে ওঠে। আমাদের কোন আকর্ষণ নেই।

তাপ্তি একখানা ছবি নিতে চাইল। বললুমঃ ওই গেটটার নিচে থেকে ছবি ভাল হবে।

ন্যাড়া পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট তোরণ। মাথার উপর কিছু কারুকার্য। দেখতে বেশ লাগছে। একটুখানি ছায়ার জন্য আরও ভাল লাগল। বিশ্রামও হল।

তাপ্তির ছবি তোলা হলে আবার আমরা উঠতে যাচ্ছিলুম। স্বাতির ডাক শুনে দাঁড়াতে হল। স্বাতি তাড়াতাড়ি কয়েকটা ধাপ

উঠে এসে বলল : তোমরা একটু দাঁড়াও গোপালদা, একটা ছাপ তুলব।

তাপ্তি উপরে দাঁড়িয়ে নিচের ছবি তুলেছিল। আর স্বাতি নিচে দাঁড়িয়ে আমাদের ছবি তুলল। স্বাতির এই প্রস্তাব শুনে তাপ্তি হেসেছিল, কিন্তু আপত্তি করে নি।

খানিকটা এগিয়ে গিয়ে তাপ্তি বলল : আমাদের ছবি তোলার শখ ওর কেন হল ?

ওকেই একথা জিজ্ঞেস করতে হয়।

মনে হয়, উত্তরটা খুব ভদ্র হল না। কিন্তু তাপ্তি সহজভাবে বলল : দুষ্টুমি আছে।

ষোল আনা।

তবে আপনি রাজী হলেন কেন ?

আমি আঠারো আনা দুষ্টুমি করব।

সে কি !

বললুম : আপনিও আমাদেব একটা ছবি তুলবেন। আমাদের দুজনকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে।

বিস্ময়ভরা দৃষ্টি তুলে তাপ্তি আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি এই বিস্ময়ের কারণ অনুমান করতে পারি। স্বাতি যে আমার বোন নয়, সে কথা বলাই হয়তো উচিত ছিল। কিন্তু বললুম : জানেন, একদিন আমার মুখ দেখে স্বাতি হেসেছিল, বাঁদরের মতো মুখ বলেছিল কিনা মনে নেই। সেইদিনই এক ভদ্রলোক বললেন, স্বাতিকে আমার বোন বলে পরিষ্কার চেনা যায়।

তাপ্তি হেসে উঠল। তৃণগুল্মহীন শুকনো পাথরের উপর মনে হল ঝর্ণার শব্দ পেলুম। ভারি মিষ্টি হাসি। তাপ্তি হাসতে জানে।

আমি নিশ্চয়ই জানি, নিচে থেকে স্বাতি এই হাসি শুনতে পেয়েছে। আমিও হেসে উঠলে বোধহয় আরও বেশি কৌতুক হয়।

আরও বেশি রোমাঞ্চ। এই লোভটুকু ছাড়তে পারলুম না। আমিও হেসে উঠলুম। হয়তো একটু দেরি হয়ে গেছে, হয়তো সুর মেলে নি। তাতে ক্ষতি কী! স্বাতির কানে এ ত্রুটি ধরা পড়বে না।

সিঁড়ির শেষ যেখানে মনে হচ্ছিল, সেখানে শেষ হল না। খানিকটা সমতল পাথরের উপর দিয়ে আর নিচু নিচু ধাপ পেরিয়ে এগিয়ে গেলুম। তারপর আবার উঁচু সিঁড়ি। দুর্গের মতো দরজা পেরিয়ে মন্দিরের সন্ধান পাওয়া গেল। অত বড় উঁচু মূর্তি তখনও দেখা যাচ্ছে না। একেবারে অঙ্গনে ঢুকে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলুম। এত বড় বিরাট মূর্তি জীবনে কখনও দেখি নি। মূর্তি এত বড় হতে পারে, একথা যেন কল্পনাই করা যায় না। হঠাৎ আমার ফার্গুসন সাহেবের একটা কথা মনে পড়ল। এই মূর্তি দেখে তিনি বলেছিলেন যে মিশরের বাহিরে পৃথিবীর আর কোথাও এর চেয়ে চমৎকার দর্শনীয় বস্তু নেই। এবং সেখানেও কোন জানা মূর্তি এর চেয়ে উঁচু নয়। সরল কথায়, শ্রবণবেলগোলার এই মূর্তির জুড়ি পৃথিবীর আর কোন দেশে নেই।

এ মূর্তি তৈরি করে নিশ্চয়ই এই পাহাড়ের উপর তোলা হয় নি। কোন পাথর তুলে আনাও সম্ভব নয়। মনে হয়, একটা বিরাট উঁচু পাথর এই পাহাড়ের উপরেই ছিল। তাকেই কেটে খোদাই করে এই মূর্তির আকার দেওয়া হয়েছে। শুনলুম এই মূর্তি সাতান্ন ফুট উঁচু। একখানা পাথর। তার পায়ের নিচে একটি ধাতুর মূর্তি। ধাতুর মূর্তির উপরেই গোমতেশ্বরের পূজো হচ্ছে। জন কয়েক জৈন নরনারী ফুল নৈবেদ্য দিয়ে পূজো করছিলেন। অত বড় মূর্তির সামনে তাদের পুতুল বলে মনে হচ্ছিল।

তাপ্তি বোধহয় ঠিক আমারই মতো ভাবছিল। বলল: ছবি দেখে কিছুই অনুমান করতে পারি নি।

সত্যিই তাই। ছবিতে আমরা মূর্তির উপরের অংশ শুধু দেখেছি। দোতলার ছাদে দাঁড়িয়ে তোলা ছবি। একতলার মেঝে থেকে

দোতলার ছাদ পর্যন্ত অংশ আমরা দেখতে পাই নি। কী করে দেখব! দশটা মানুষের চেয়েও যে বেশি উঁচু!

তাপ্তি তার ক্যামেরা বার করে ছবি নেবার চেষ্টা করতে লাগল। কোনখান থেকে পুরো মূর্তিটা পাওয়া যায় না। ছাদে উঠেও চারিধার ভাল করে দেখল। তাতেও পেল না। শেষ পর্যন্ত আধখানা ছবিই নিল। আমাকে বলেছিল, পিছনের রেলিঙের পাশে দাঁড়াতে। ছবিতে একটা মানুষ থাকলে এই মূর্তির উচ্চতা খানিকটা অনুমান করা যাবে।

ততক্ষণে মামা মামী ও স্বাতি এসে উপরে পৌঁছে গেছেন। ক্লান্ত শরীরে মামা চাতালের উপরেই বসে পড়লেন। হাঁপালেন খানিকক্ষণ ধরে, তারপর আমাকে দায়ী করলেন এখানে আনবার জন্যে। এ সমস্তই গোপালের কারসাজি।

মামী বললেন: তোমাদের তো কারও কষ্ট ছিল না। গোপাল একাই দায়ী।

এই কষ্টের কথা বললে কি আর রাজী হতুম!

মামা তখনও হাঁপাচ্ছেন। আর হাসছে স্বাতি। বুঝতে পারলুম যে এ হাসি মামার মন্তব্যের জন্য নয়। এ হাসি আমার হাসির উত্তর। আমি কোন উত্তরই দিলুম না। কতক্ষণ ও হাসে, আমি তাই দেখতে চাই।

সূর্যের আলোয় পৃথিবী তখন হাসছে।

মামা বললেন: এতো দেখছি বুদ্ধের মূর্তির মতো।

সম্পূর্ণ নগ্ন মূর্তি। বুদ্ধের নগ্ন মূর্তি কোথাও দেখি নি, কোথাও আছে বলে শুনি নি কারও কাছে। তাইতেই সকলের ধারণা, এ জৈন মূর্তি। জৈনদের দিগম্বর সম্প্রদায় আছে। নগ্নতায় তাদের বিশ্বাস। বললুম: বুদ্ধের নয়, এ জৈন মূর্তি, গোমতেশ্বরের।

মামা একটু সুস্থ বোধ করছিলেন, বললেন: আদিনাথ পার্শ্বনাথের নাম শুনেছি। এ তো দেখছি নতুন নাম।

বললুম : ইনি চব্বিশ তীর্থঙ্করের যে একজন নন, এইটুকুই শুধু জানি।

একজন অল্প বয়সের ছেলে খানকয়েক বই হাতে এগিয়ে এল। তাকিয়ে দেখলুম যে বারান্দার এক ধারে একটা বইএর দোকানও আছে। যে অঙ্গনের মাঝখানে মূর্তি, তার চারিধারে ঘর ও বারান্দা। যাত্রীরা এখানে বিশ্রাম করে। ছেলেটি বলল : 'গোমতেশ্বরের গল্প এই বই-এ আছে ভারি চমৎকার গল্প।

মামা বললেন : তোমার বইএর দাম আমি দিয়ে দিচ্ছি, তুমি গল্পটা আমাদের শোনাও।

এ প্রস্তাব ছেলেটির কাছে অদ্ভুত মনে হল। গল্প শোনাতে তার আপত্তি নেই. কিন্তু বই না নি । দাম দেব সে আবার কী কথা। মামা বললেন : বিশ্বাস ... নাও তোমার বইএর দাম।

বলে একটা টাকা দিলেন

ছেলেটি বই দিল। খুচরো প সাও ফেরত দিল। তারপর তার গল্প শোনাল। উত্তর ভারতে গোমতেশ্বরের নাম বাহুবলি। অনেকে ভুজবলিও বলেন। ইনি ছিলেন প্রথম তীর্থঙ্কর পুরুদেবের কনিষ্ঠ পুত্র ... জ্যেষ্ঠের নাম ভরত। রাজ্যের অধিকার নিয়ে এই দুই ভাই-এ দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়েছিল। বাহুবলি জয়লাভ করেও রাজ্য গ্রহণ করেন নি। বিজিত বড় ভাইকে অধিকার ছেড়ে দিয়ে নিজে বনবাসী হয়েছিলেন। রাজা ভরত এই ত্যাগী পুরুষের সিদ্ধিলাভের পর পাঁচশো পঁচিশ ধনুর সমান লম্বা এক মূর্তি স্থাপন করেন। এ মূর্তি সে মূর্তি নয়। এ মূর্তি গঙ্গরাজ রাজমল্লের মন্ত্রী চামুণ্ডা রায়ের কীর্তি। চামুণ্ডা রায় যখন বাহুবলির মূর্তির অনুসন্ধান করেন, তখন সেই মূর্তির নাম হয়েছে কুক্কুটেশ্বর। বিপদসঙ্কুল স্থান। সকলকে দর্শনও দেন না। নিজে দর্শন না পেয়ে চামুণ্ডা রায় এই নূতন মূর্তি স্থাপন করলেন।

সমস্ত গল্পটা শুনে মামা বললেন ঃ নতুন মূর্তিই বটে। দেখছ তো গোপাল, হাজার বছরের জলঝড় গেছে এর ওপর দিয়ে। একটা আচড় নেই, দাগও লাগে নি একটাও।

বালকটি বলল ঃ এখানকার সবচেয়ে বড় উৎসব হল মস্তকাভিষেক। আপনারা দেখেন নি বুঝি?

আমি বললুম ঃ না।

উৎসাহিত হয়ে বালকটি বলল ঃ ইস। একটা অদ্ভুত জিনিস আপনারা দেখেন নি। উনিশশো সাতষট্টি সালে আবার আসবেন। চোদ্দ বছর পর পর মস্তকাভিষেক হয়।

এ সবের ইতিহাস তার মুখস্থ। বলল ঃ আগে অনেকদিন পর পর হত। ১৩৯৮ সালে বোধহয় প্রথম হয়েছিল। তখন পণ্ডিতেরা পাঁজি পুঁথি দেখে গ্রহনক্ষত্রের বিশেষ সমাবেশের সময় মস্তকাভিষেকের বিধান দিতেন।

তারপরেই জিজ্ঞাসা করল ঃ এখানে আসবার পথে একটা ঘরে অনেক বাঁশ আর খুঁটি দেখতে পান নি?

দেখেছি তো।

ঐ সমস্ত কাজে লাগে। দাঁড়ান আপনাদের ছবি দেখাচ্ছি।

বলে সে তার দোকান থেকে একখানা ছবি নিয়ে এল। বিক্রির জন্যেই রাখে। তাতে দেখলুম, মূর্তির চারিদিক ঘিরে মাচা তৈরি হয়েছে। বাড়ি তৈরি বা মেরামতের জন্যে যেমন মাচা তেমনিই, তবে অনেক যত্নে অনেক সুন্দর করে বাঁধা। বালকটি বলল ঃ পুরোহিতরা এই মাচা বেয়ে উপরে উঠবেন। আর তারপর মস্তকাভিষেক হবে। ষোল রকম উপাদান—দুধ দই মধু সোনা রূপোর টাকা হীরে জহরৎ। ভারতের সমস্ত জায়গা থেকে লক্ষ লক্ষ লোক আসে। এই পাহাড়ে আর পাথর থাকে না, সব মানুষে ঢেকে যায়।

বললুম ঃ সাবাস।

ঘরে ঘরে যে সব মূর্তি আছে দেখেছেন?

মামা বললেন ঃ একটিই যথেষ্ট।

তখন অল্প অল্প বাতাস আসছে। স্নিগ্ধ বাতাস। ক্লান্তি জুড়িয়ে যায়। মামীও বিশ্রামের জন্য বসেছিলেন। একটু দূরে দাঁড়িয়ে তাপ্তি স্বাতির সঙ্গে কথা কইছিল। মামা বললেন ঃ একটা অভিজ্ঞতা হল।

কষ্টের না আনন্দের সে কথা তিনি বললেন না। আমি নীরব থেকে তাঁকে আরও কিছু বলবার অবকাশ দিলুম।

মামা বললেন ঃ পৃথিবীর লোকে আমাদের একটা অসভ্য জাত বলে জানে। আজকাল আমরা যেমন আদিবাসীদের উন্নতির জন্যে লেগেছি, তেমনি পৃথিবীর একটি আদিবাসী জাতকে ইংরেজ নাকি সভ্য করে গেছে। পৃথিবীর লোক এসে এইসব দেখে যাক।

প্রয়োজন হলে তারা চোখ বুঁজে থাকবে।

পাহাড়ে উঠতে বেশি কষ্ট না নামতে, সে তর্কের কথা। বেশি মানুষ উঠতেই বেশি কষ্ট বলেন। যত চড়াই, তত কষ্ট। হাঁফ লাগে, দম বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু নামতে সে সব নেই। হাল্কা পায়ে গড়-গড়িয়ে নামা যায়। নামতে যে কষ্ট আরও বেশি, সে কথাও অনেকে বলেন। খুব শক্ত কাজ, খুব সাবধানতার কাজ। পা হড়কালেই প্রাণ গেল। মামা, দেখলুম, তৃতীয় দলে। তিনি ওঠবার সময় যা বলেছিলেন, নামবার সময় তার উল্টো বললেন ঃ এখন দেখছি নামতেই বেশি কষ্ট।

মামী বললেন ঃ কিছু করতে হলেই তো তোমার কষ্ট।

তবে আর কী, তোমার মনোরঞ্জনের জন্যে হয় মিথ্যে বলি, নয় পাহাড় ভাঙি।

স্বাতি বলল ঃ ঐ পাহাড়টায় আমরা উঠব বাবা ?

বলে সে কল্যাণীর অপর পারের চন্দ্রগিরি পাহাড়টা দেখাল। তার উপরেও মন্দির আছে, শিলালিপি আছে। ইন্দ্রগিরির তুলনায় অনেক কম উঁচু।

মামা বললেন : আবার পাহাড় !

আমার দিকে ফিরে বললেন : বুঝলে গোপাল, পাহাড়ের ধারে কাছে আর নয়। তোমার বেলুর আর হালেবিদ যদি টিপির ওপরেও হয়, তো এইখান থেকেই ফিরে চল।

মামী বললেন : দেশে ফিরে একতলার বসবার ঘরটায় তোমার শোবার ব্যবস্থা করে দেব। তাহলে আর ওপর-নিচ করতে হবে না।

মামা বললেন : প্রস্তাবটা মন্দ নয়।

অনেকটা পথ নেমে আসবার পরে একটা শব্দ কানে আসতে লাগল। ঠক ঠক করে ধাতুর জিনিস পেটাইএর শব্দ। অবিশ্রান্ত একটানা শব্দ। কোন ছেদ নেই, বিরাম নেই। পরে শুনেছিলুম, এখানে পিতলের বাসন তৈরি হয়। এ অঞ্চলে এই বাসন-শিল্পের নাম আছে।

একেবারে নিচে নেমে মামা বললেন : কাণ্ড দেখেছ গোপাল ?

কৌতূহলী হয়ে আমি চারিদিকে চাইলুম। কিন্তু দেখতে কিছুই পেলুম না।

মামা বললেন : এখানেও ডাব বিক্রি হচ্ছে।

মামী বললেন : তেষ্টা পেয়েছে বুঝি ?

ততক্ষণে আমি ডাবের দাম চার থেকে তিন আনায় নামিয়ে ফেলেছি। এদের ভাষা জানলে হয়তো দু আনাতেই রফা হত। সবাই একটা করে ডাব খেলেন

গাড়িতে বসে মামা বললেন : কষ্ট আছে বটে, আনন্দও আছে।

এইটেই সবাচেয়ে বড় সত্য। এই আনন্দের লোভেই তো মানুষ দুর্গম দুস্তর পথ কত ক্লেশে অতিক্রম করে। চলার নেশা কোনদিন ফুরোয় না, ফুরোবেও না। পৃথিবী যে সারাক্ষণ চলে। মানুষকেও চলতে হবে। পৃথিবী প্রতিদিন হাসে, মানুষও হাসবে।

এবারে আমরা বেলুর যাব।

১৭

এই অঞ্চলে কোন ধর্মের একাধিপত্য ছিল না। নর্মদার তীরে তীরে কাঞ্চীপুরে আরও কত স্থানে বৌদ্ধধর্মের নানা নিদর্শন আছে ছড়িয়ে। তেমনি জৈনধর্মেরও। এই শ্রবণবেলগোলাতেই না জানি কত সমৃদ্ধি ছিল। কত আয়োজন, কত অনুষ্ঠান! একদিন অনেক ছিল বলেই আজও কিছু আছে। তাই বাস আসে মহিসুর থেকে, ব্যাঙ্গালোর থেকে, হাসান থেকে। মহিসুর থেকে বাষট্টি মাইল, একশো মাইল ব্যাঙ্গালোর থেকে, আর হাসান থেকে মাত্র তের মাইল। চমৎকার রাস্তা। যে পথে আমরা এসেছি, সেই অনাদৃত অসমতল পথ নয়। এ সদব রাস্তা। কিছুদূর এগিয়েই বড় রাস্তায় পড়েছে। সে রাস্তা গেছে ব্যাঙ্গালোর থেকে ম্যাঙ্গালোর. মাঝপথে হাসান। হাসান থেকে বেলুর শুধু বাইশ মাইল।

তাপ্তি ভেবেছিল, রেল গাড়িতে এই হাসানে আসবে। উঠবে ডাক বাংলোয়। তারপর বাসে চেপে একদিন শ্রবণবেলগোলা, আর একদিন বেলুর আর হালেবিদ দেখবে। ও দুটো জায়গাই একদিকে। বেলুর থেকে হালেবিদ পৌঁছতে আধ ঘণ্টাও সময় লাগে না। মাত্র ন' মাইল পথ। হাসানে ফেরবার জন্যে আরও একটা সংক্ষেপের রাস্তা আছে। পাহাড়ের ধার দিয়ে। রাস্তার ধারে ধারে অপরূপ জংলী ফুল। বেশ লাগে। এ সমস্তই আমরা দেখেছি।

তার আগে মামা বললেন : জৈনরা এত দক্ষিণেও এসেছিল।

ভয়ের ভাব দেখিয়ে স্বাতি বলল : দোহাই গোপালদা, এখন আর ধর্মের কচকচি নয়। তার চেয়ে বেলুর সম্বন্ধে যদি কিছু বলবার থাকে তাই বল।

তাপ্তি কী বুঝল সেই জানে, আমাকে জিজ্ঞাসা করল : কী বলল স্বাতি ?

বললুম : ধর্মের কথা সে শুনবে না।

তবে কি অধর্মের কথা শুনবে ?

হেসে বললুম : প্রায় সেই রকম।

পিছন থেকে স্বাতির তর্জন শুনতে পেলুম, বলল : আর যাই কর, আমাকে নিয়ে তামাসা ক'রো না।

ইচ্ছে করেই কথাটা বাঙলায় বলল। তাপ্তি বুঝবে না, বুঝব আমি। তাপ্তি প্রশ্ন করবে, আমি উত্তর দেব, আব সে হাসবে। কিন্তু তাপ্তি কিছু জানতে চাইল না। আমিও তার উত্তর দিলুম না।

মামা বললেন : এতদিন একটা বেলুড়ের নাম জানতুম। বেলুড় মঠ। এদেশেও যে বেলুর আছে, সে এখানে এসেই শুনলুম।

স্বাতি বলল : বেলুব নামটা কোথা থেকে এল ?

প্রশ্নটা যে আমাকে, তাতে সন্দেহ নেই। উত্তব জানা ছিল ব'লে বললুম : বিদ্যার পরীক্ষা নিচ্ছ বুঝি ?

গম্ভীব ভাবে স্বাতি বলল : গোপালদার কথা শোন বাবা, আমি ওঁর বিদ্যাব পরীক্ষা নেব !

তর্ক এড়িয়ে বললুম : কলকাতার বেলুড় আর এই বেলুরে বানানেব তফাৎ আছে। কলকাতায় ড-এ বিন্দু ড়, আর এখানে ব-এ বিন্দু। আরও মজার কথা, এই বেলুর নামই এ দেশে আরও অনেক আছে। মাদ্রাজের সালেম জেলায় এক বেলুব আছে, আর্কট জেলায় আর একটি। বোম্বাই প্রদেশেও এক বেলুব আছে। আর সর্বত্রই কিছু না কিছু দ্রষ্টব্য স্থান। আমরা যে বেলুর দেখতে যাচ্ছি, তা হাসান জেলার। এর পৌরাণিক নাম বেলপুর, ঐতিহাসিক নামও তাই। প্রাচীন শিলালিপিতে পাওয়া গেছে। কাজেই অস্বীকার করবার উপায় নেই।

এতগুলো বেলুর নাম আমি জানতুম না। কাল সন্ধ্যেবেলায় তাপ্তির মুখে শুনেছি। এখন তা শুনিয়ে দিয়ে সবাইকে চমকে দিলুম। আরও একটু খবর জানা ছিল, বললুম : হয়শাল বংশেব

রাজা বিষ্ণুবর্ধন। জৈন ধর্ম পরিত্যাগ করে তিনি বৈষ্ণব হয়েছিলেন। এই বিষ্ণুর মন্দির তাঁরই কীর্তি। বেলুরে চেন্ন কেশব বিষ্ণু মন্দির। চেন্ন মানে সুন্দর।

চেন্নর আর একটা মানে আমি শুনেছিলুম একটা স্টেশনে। তারা পেদ্দ মাস্টার বলছিল স্টেশন মাস্টারকে আর চেন্ন মাস্টার এসিস্ট্যাণ্ট স্টেশন মাস্টারকে। আমি পেদ্দ আর চেন্ন মানে বড় আর ছোট মনে করেছিলুম।

তাপ্তি আমাকে আর একটা নাম বলেছিল। জখনাচারির নাম। হয়শাল রাজাদের একজন বিখ্যাত স্থপতি। মহিসুরের শ্রেষ্ঠ তিনটি মন্দির হল বেলুর হালেবিদ আর সোমনাথপুরে। এই তিনটিই নাকি তাঁরই পরিকল্পনায় তাঁরই তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়েছে। সে দ্বাদশ শতাব্দীর কথা। বেলুর মন্দির নির্মাণের তারিখ পাওয়া গেছে ১১১৭ খ্রীষ্টাব্দ। তাপ্তি বলেছিল, এই নিয়ে সে একটু গবেষণাও করবে। সত্যিই এ জিনিস গবেষণার অপেক্ষা রাখে।

এইটুকু শুনে আমি থেমে গিয়েছিলুম। কিন্তু তাপ্তি থামে নি। আস্তে আস্তে বলেছিল: শুনেছি, ইয়োরোপেও এই সময়ে অনেক সুন্দর অট্টালিকা নির্মিত হয়েছে। লিঙ্কনের গির্জার নাম শুনেছেন? সেও এই সময়ে তৈরি। বইএ পড়েছি, এই রকমের আরও গির্জা আছে ওয়েলস্ অ্যামিয়েন্স রীম্‌স প্রভৃতি স্থানে। সবই প্রায় সমসাময়িক। মনে হয়, এ একটা যুগ, যখন স্থাপত্যের অনুরাগ ছিল পৃথিবীর সবদেশে। নিশ্চয়ই একটা যোগাযোগ ছিল। সে যোগসূত্রটি ধরতে পেলে আমার আনন্দের সীমা থাকবে না।

পরিচ্ছন্ন রাজপথে আমাদের গাড়ি ছুটে চলেছে। আশে পাশে ঘর বাড়ি দেখে মনে হল, আমরা একটি শহরের কাছাকাছি এসে পড়েছি! সত্যিই তাই। আমরা হাসান শহরে প্রবেশ করছি। জেলার প্রধান শহর। ড্রাইভার বলল: ভাল কফির দোকান আছে, দাঁড়াব কি?

মামা বললেন : গোপাল কী বল ?

উত্তর মামী দিলেন : সেই সাত সকালে বেরিয়েছ, কিছু খেয়েই নাও না।

মাথা দুলিয়ে মামা বললেন : এইজন্যেই গিন্নীদের কদর। শুধু দেহের নয়, দেহের অভ্যন্তরের খবরও তাদের জানা। বুঝলে গোপাল—

মামী বাধা দিলেন, বললেন : কী যা-তা বলছ ?

মামা কিন্তু থামলেন না, বললেন : ডাক্তারের সঙ্গে গিন্নীদের একটা প্রকাণ্ড মিল আছে। দু দলই পাকা। ডাক্তার যেমন রোগীর বেলায়, গিন্নীরা তেমনি কর্তাদের ব্যাপারে।

স্বাতি হেসে উঠল।

ডাবের জলে মামার তৃষ্ণা নিবারণ হয়েছে, কিন্তু নেশার নিবৃত্তি হয় নি। এ সময় একটু চা কি বা কফির অন্যরকম আস্বাদ। মামী এই দুর্বলতার সংবাদটি জানেন বলেই মামা প্রসন্ন হয়ে উঠেছেন।

ড্রাইভার একটা রেস্তোরাঁর সামনে তার গাড়ি দাঁড় করাল। মামী নামতে চান নি। পরে কী ভেবে নামলেন, কিন্তু কিছু খেলেন না। আমরা কফি খেলুম। তার সঙ্গে মসালা দোসা। এ সবে স্বাতির অদ্ভুত অনুরাগ। তারই আগ্রহে সবাইকে খেতে হল।

আমরা যখন বেলুরের মন্দিরে এসে পৌঁছলুম, মধ্যাহ্নের মার্তণ্ড তখন মাথার উপর উঠেছেন। প্রখর রৌদ্র। পায়ের নীচে বাঁধানো চত্বর উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। শুধু পায়ে চলতে কষ্ট হচ্ছে।

মামা বললেন : যা দেখবার আছে, তাড়াতাড়ি দেখে নাও।

এ কথা সময়ের অভাবের জন্য নয়। এ উত্তাপ দেখে। মাথা পুড়ছে, পা ঝলসে যাচ্ছে। মস্তবড় গোপুরের নিচে দিয়ে আমরা মন্দিরের বিরাট প্রাঙ্গণে পৌঁছেছি। চারিদিকে উঁচু দেওয়াল, মাঝখানে বেঁটে মন্দির। নিতান্তই বেঁটে। মন্দির যে এমন হয়, এ আমাদের ধারণার অতীত। চূড়ো নেই, গম্বুজ নেই, এমনকি

একটা আলসেও নেই। কয়েকটা ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠলেই মন্দিরের দরজা। সামনে কিছু কারুকার্য আছে বলে মনে হল, কিন্তু দূর থেকে উল্লসিত হওয়া চলে না। স্বাতি বলল : আমরা কি এই দেখতে এতদূর এলুম ?

তাপ্তিও বোধহয় বিস্মিত হয়েছে, কিন্তু হতাশ হয় নি। বলল : কাছে গিয়ে দেখতে হবে।

প্রশস্ত প্রাঙ্গণটি আমরা তাড়াতাড়ি পেরিয়ে গেলুম। মন্দিরের টানে নিশ্চয়ই নয়, পায়ের আরামের জন্য। একটু ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াতে পারলে নিশ্চিন্ত মনে দেখবার আগ্রহ হবে।

নিকটে গিয়ে আমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলুম। এ কী অদ্ভুত দৃশ্য ! পাথরে যে প্রাণ দেখতে পাচ্ছি।

স্বাতি নির্বাক দাঁড়িয়ে রইল, কথা কইতে পারলাম না। মামা মামীর দিকে তাকিয়ে দেখলুম, তাঁরাও অপরিমিত আশ্চর্য হয়েছেন। হয়নি শুধু তাপ্তি। সে বোধহয় এইরকম কিছুরই প্রত্যাশা করেছিল।

মন্দিরের ভিতরে ঢুকতে আমরা ভুলে গেলুম। দেবতার কথা আমাদের মনে পড়ল না। আমরা বাহিরের রূপ দেখতে লাগলুম মুগ্ধ চোখে।

মন্দিরের গাত্র নিচ থেকে উপর পর্যন্ত অপর্যাপ্ত কারুকার্য-মণ্ডিত মেঝের কাছে এক সারি হাতি সারিবদ্ধ হয়ে চলেছে। তার উপরের সারিতে নানারকম ফুল লতা পাতা। দেবতার মূর্তি তার উপরের সারিতে। সারির শেষ নেই, মূর্তিরও নেই। একেবারে উপরের দিকে তাকিয়ে আরও বিস্ময় বাড়ল। কারুকার্য করা থামের উপর নৃত্যপরা নারীমূর্তি। দেবীমূর্তিও হতে পারে। পায়ের কাছে যুক্তকর ভক্তবৃন্দ। দেবীর এক পদ মাটিতে, অন্য পদ শূন্যে, ভঙ্গী নৃত্যের। কটিতে মেখলা, বক্ষ নিরাবরণ। সারা অঙ্গে নানা অলঙ্কার। অদ্ভুত জীবন্ত মূর্তি। চোখ ফেরাতে ইচ্ছা করে না।

শোনা গেল, ব্র্যাকেটের উপর এই রকম মূর্তি সব শুদ্ধ আটত্রিশটা

আছে। এর মধ্যে সরস্বতীর মূর্তিও নাকি আছে। পরে শুনেছিলুম কোন কোন মূর্তির হাতের বালা আর মাথার মুকুট নাকি নাড়ানো যায়, খুলে নেওয়া যায় না। গাইড নিলে তারা এইসব দেখায়।

মন্দিরের ভিতরে ঢোকবার দরজা তিন দিকে—উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে। দরজার দুই ধারের কারুকার্য আরও অপূর্ব। থমকে না দাঁড়িয়ে সরাসরি ভিতরে যাওয়া যায় না।

এই মন্দিরের ভিতরে একটি মাত্র ঘর। অন্ধকার অভ্যন্তর। তবু তার শিল্পকর্ম দৃষ্টি এড়াল না। দরজার পাশে স্তম্ভগাত্রে এমনকি উপরের ছাদে পর্যন্ত বিচিত্র কারুকার্য। শ্রমের এমন অজস্র অকৃপণ অপচয় ভারতের আর কোন মন্দিরে বুঝি নেই। একখণ্ড পাথরকে আর পাথর থাকতে দেয় নি, সমগ্র মন্দিরটা একটা প্রাণের মতো প্রস্ফুটিত হয়ে আছে। একসময় স্বাতি এসে আমার পাশে দাঁড়াল। তার মুখে আর একটাও কথা নেই।

প্রশ্ন করলুম ঃ কেমন দেখছ?

বিশ্বাস হচ্ছে না।

কী বিশ্বাস হচ্ছে না?

স্বপ্ন নয় তো!

হয়তো স্বপ্নই। শিল্পীর স্বপ্ন। স্বপ্নকে সে ধরে রেখেছে।

মামা মামী মন্দিরের বিগ্রহ খুঁজছিলেন। সে দরজা এখন বন্ধ। যাঁরা সকালে এসেছেন, তাঁরা বোধহয় সবই দেখেছেন।

একজন বললেন ঃ এমন সুন্দর বিগ্রহ আমরা আর কোথাও দেখি নি। ওধারের মন্দিরে কপ্পে চেন্নিগ রায় মূর্তিটিও অপূর্ব সুন্দর।

তাঁর সঙ্গী ভদ্রলোক বললেন ঃ প্লাস্টিক আর্টের নিদর্শন।

ইচ্ছা হল তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, সে আবার কী! কিন্তু ততক্ষণে তারা সরে গেছেন।

আমরা আশে পাশের মন্দিরগুলোও দেখলুম। কতক্ষণ ধরে দেখলুম মনে নেই। পায়ের নিচের উত্তাপের কথা মনে ছিল না,

পেটের ক্ষুধার কথাও ভুলে গিয়েছিলুম। যখন সব মনে পড়ল, তখন তাপ্তিকে আর দেখতে পাচ্ছিলুম না। তাপ্তি কোথায় গেল! সবচেয়ে ব্যস্ত হলেন মামা নিজে: মেয়েটা—

তাড়াতাড়ি আমি মন্দিরের পিছনে দেখতে গেলুম। সে সেখানেই ছিল। গভীর মনোযোগে সে দেওয়ালের ছবি নিচ্ছে। আমাকে দেখেই লজ্জা পেল, বলল: আপনাদের দেরি করে দিলাম বুঝি?

একটুও না।

সে কি! আমি যে অনেকক্ষণ আপনাদের ছেড়ে আছি!

এতক্ষণে আমাদের খেয়াল হল।

ক্যামেরা বন্ধ করে তাপ্তি বলল: এত ছবি কেন নিলাম জানেন?

না।

ইরানী আবদুর রাজাক এই মন্দির দেখেছিলেন ১৪৪৩ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু বর্ণনা কিছুই লেখেন নি। বলেছিলেন, যা কিছুই লিখবেন, লোকে অতিশয়োক্তি বলবে।

মামা মামী দেওয়ালের ধারে ছায়ায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। উপরে একটু ছাদ আছে। বোধহয় যাত্রীদের বাসের ব্যবস্থা ছিল পুরাকালে। আমাকে দেখে মামী বললেন: খাবারটা এইখানে খেলেই বোধহয় ভাল হয়।

মামা মেঝের দিকে চাইলেন। বোধ হয় তার নোংরা বোধ হল। মামী বললেন: গাড়ির চেয়ে এইখেনেই খেতে সুবিধে হবে। জল ঢালাঢালি—

মামা বসে বললেন: বুঝেছি।

আমি খাবার আনতে গেলুম। তাপ্তি ও স্বাতিও আমার সঙ্গে এল। আমরা যেন এক পরিবারের লোক।

১৮

বেলুবের মন্দির ছেড়ে বাজার পেরিয়ে আমাদের গাড়ি হালেবিদের দিকে ছুটেছে। দুধারে পথের দৃশ্য বড় মনোরম। শুধু এখানে নয়, সারা পথ আমরা সুন্দর দৃশ্য দুচোখ ভরে দেখেছি। প্রকৃতি কি তার পাগলা রূপ এদেশে উজাড় করে ছড়িয়ে দিয়েছে!

তাপ্তি আমার পাশে বসেছে। তার দেহের উত্তাপ পাচ্ছি, সৌরভও পাচ্ছি। সকালবেলায় যাত্রার শুরুতে যে অনুভূতি ছিল, এখন আর তা নেই। এখন অন্যদিকেও মন দিতে পারছি। উপভোগ করতে পারছি প্রকৃতির দুরন্ত রূপ। কিন্তু তাপ্তি আমাকে তার দিকে ফিরিয়ে আনল। বলল: আমার একটা উপকার করবেন?

উপকার!

হ্যা উপকার। কথা দিলে তবেই বলব।

এ তো ভারি মজার কথা। না জেনেই কথা দিয়ে দেব, রাখতে না পারলে!

রাখতে অনায়াসেই পারবেন. তাই তো কথা চাইছি।

বেশ, বলুন।

তাপ্তি বলল: আমার জন্যে আপনারা খরচ করবেন না। আমি—

আমার জোরে জোরে হেসে উঠবার ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু চেপে গেলুম, আমার মুখের ভাব দেখে তাপ্তি বলল: কী হল?

কিছু না।

কিছু না নয়, একটা উত্তর দিন।

সত্যি কথা শুনবেন?

শুনব।

আমিও আপনার মতো অতিথি।

বড় বড় চোখ মেলে তাপ্তি আমার মুখের দিকে তাকাল। সহসা আমার কথা সে বিশ্বাস করতে পারল না। বললুম: বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?

তাপ্তি তার অবিশ্বাসের কথা গোপন করল না, বলল: কী করে হবে!

বললুম: আপনার সঙ্গে যেমন মাইসোর স্টেশনে দেখা, আমার সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে। তফাৎ এইটুকু যে, আপনার সঙ্গে একেবারেই পরিচয় ছিল না, আর আমার সঙ্গে এই ক'দিনের পরিচয়। তার পেছনে একটুখানি পাতানো আত্মীয়তা।

তাপ্তির বোধহয় বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। খুব আস্তে আস্তে বললুম: মামার চাকর হারিয়ে গিয়েছিল স্টেশনের ভিড়ের ভিতর। টিকিট কেনা ছিল। তাই আমাকে সঙ্গে নিলেন সাহায্য পাবার আশায়। সেই থেকে এইভাবে ঘুরছি।

তাপ্তি অনেকক্ষণ কথা কইল না। তারপর করুণ ভাবে বলল: তাহলে কি স্বাতিকে বলব?

সেই তো আপনাকে সঙ্গে নিয়েছে।

কিন্তু—

কিন্তু কী?

আচ্ছা তাকেই বলব।

কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে কাটল। তারপরেই তাপ্তি বলল: আপনার সম্বন্ধে আমার কৌতূহল বাড়ল।

কেন বলুন তো?

আপনার কি কেউ নেই?

কেন থাকবে না। আপনারা সবাই তো আছেন। গোটা দেশটাই তো আমার, গোটা পৃথিবীটাই।

তাপ্তি বিহ্বল চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বললুম: ছোট একটা ঘরের ভেতর বন্দী হয়ে থাকতে আমার

মন ওঠে না। আমার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। দম আটকায়। খোলা আকাশের নিচে আমি সুস্থ বোধ করি।

তাপ্তি কী বুঝল সেই জানে। বলল: আমারও কষ্ট হচ্ছিল। আমিও বেরিয়ে পড়েছি।

সত্যি!

সত্যি বই কি। কিন্তু আপনার মতো বাহিরের টানে আমি বের হইনি। ঘরে থাকতে পারি নি বলেই আমি বেরিয়ে পড়েছি।

মনে হল, তাপ্তি আরও কিছু বলবে। কিন্তু বলল না। বলবার সময়ও ছিল না। হালেবিদ গ্রামে আমরা ঢুকে পড়েছি। নিতান্তই অনাদৃত গ্রাম। আমাদের জীবনের মতো। কিছু ঐশ্বর্য আছে, তাই বেঁচে আছে। ঐটুকু ফুরোলেই স্মৃতির পাতা থেকে একেবারে নিঃশেষে মুছে যাবে। ইতিহাসের দ্বারসমুদ্রের নাম আজ ক'জনে জানে, ক'জন জানে দ্বারাবতীর নাম! নাম তো অমর হয়ে থাকে না, থাকে কীর্তি। হয়শাল রাজবংশের ঐতিহাসিক কীর্তির কথা লোকে ভুলে গেছে। তাই তাঁদের রাজধানীর নামও আর কারও মনে পড়ে না। আজ কয়েকটা মন্দিরের জন্য এই বংশের অমরত্ব। এই মন্দির যতদিন থাকবে, ততদিন আমরা হয়শালরাজ নরসিংহকে মনে রাখব, মনে রাখব তাঁর অদ্ভুতকর্মা শিল্পী-স্থপতি যখমাচারির কথা, মনে রাখব মধ্যযুগীয় ভারতের কৃষ্টি-সভ্যতার উৎকর্ষের কথা। আমাদের গাড়ি এসে হালেবিদের মন্দিরের সামনে দাঁড়াল।

এ যে বেলুরের মতো আদৃত মন্দির নয়, তা অনেকক্ষণ আগেই বুঝতে পেরেছিলুম। পথ ধূলিধূসর, জনহীন, সংকীর্ণ। গাড়ি থেকে নেমে মনে হল, মন্দির অসম্পূর্ণও বটে। প'ড়ো বাড়ির মতো উন্মুক্ত প্রবেশদ্বার। উচ্চশির প্রহরীর মতো কোন বিরাট গোপুর এই দ্বারের শোভাবর্ধন করছে না। মন্দিরের অঙ্গন কেউ পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দেয় নি। অনাদর ও অবহেলার চিহ্ন বড় স্পষ্ট হয়ে আছে।

এরই সঙ্গে পরিকল্পনার বিশালতা লক্ষ্য করতেও কষ্ট হল না।

এক নয়, একাধিক গর্ভগৃহ, একাধিক নন্দী। সিদ্ধিদাতা গণেশ এ মন্দির হয়শালেশ্বর শিবের মন্দির।

এই হয়শাল বংশের বল্লাল রাজারা নাকি জৈন ছিলেন। তখন তাঁরা জৈন মন্দির নির্মাণ করেছেন। এই দ্বারসমুদ্রেই এক বিশাল জৈন মন্দির ছিল। তার ধ্বংসাবশেষ নাকি আজও আছে। তারপর তাঁরা বৈষ্ণব হয়েছিলেন। বৈষ্ণব রাজা বিষ্ণুবর্ধনের কীর্তি আমরা বেলুরে দেখেছি। এ মন্দির নাকি রাজা নরসিংহের আমলে নির্মিত। ১১৪১ থেকে ১১৭৩ খ্রীষ্টাব্দ তাঁর রাজ্যকাল। রাজা নবসিংহ কি শৈব ছিলেন ?

ইতিহাস যতটুকু জানা আছে তাতে দেখি, এই দ্বারসমুদ্র হয়শাল রাজাদের রাজধানী ছিল ৯৫০ থেকে ১৩১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। আলাউদ্দীন খিলজীর সেনাপতি মালিক কাফুর গোটা দক্ষিণ ভারতটা তাঁর পদানত করে যান ১৩১০ খ্রীষ্টাব্দেই। সেই সময়েই এই রাজধানী লুণ্ঠিত হয়েছিল। যা বাকি ছিল, তা সম্পূর্ণ করেন তৃতীয় মুহম্মদ। এ কথাও প্রবাদ আছে যে আশি বছর ধরে এই মন্দির নির্মিত হচ্ছিল। সম্পূর্ণ হবাব আগেই তা ধ্বংস হয়ে যায়। এই সূত্র ধরে অনেকে মনে করেন মন্দির নির্মাণ হচ্ছিল ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বীর সোমেশ্বরের রাজত্বকালে। একটি নয়, তুটি মন্দির। হয়শালেশ্বর ও কেদারেশ্বরেব মন্দির।

এ মন্দিরের কাছে গিয়ে মনে হল, এর কারুকার্য বুঝি আরও সূক্ষ্ম আরও সুন্দর। মন্দিরগাত্রে এতটুকু স্থানও উপেক্ষিত নয়। ভাল কবে স্মরণ করে দেখলুম, বেলুরের মন্দিরেও কিছু পাথরেব সন্ধান পেয়েছিলুম। শিল্পীর হাত সেখানে পড়ে নি। অনেক খুঁজে বার কবতে হয়েছিল। এখানে খুঁজেও তেমন স্থান পেলুম না। মূর্তিগুলিও আরও জীবন্ত মনে হল। আরও বৈচিত্র্যময়।

তাপ্তি আমার কাছে এসে বলল : আপনার কি একটা কথা মনে হচ্ছে না ?

কী কথা বলুন তো ?

দ্বারসমুদ্রে এই মন্দিরটাই শুধু ছিল না। সরকারি অফিস কাছারি রাজপ্রাসাদ সাধারণ প্রজাদের ঘর-বাড়ি, এ সমস্তও নিশ্চয়ই ছিল।

তা ছিল বৈকি।

সেগুলোও কি সুন্দর ছিল না? না হলে এই মন্দির যে বড় খাপছাড়া দেখাত।

তাপ্তি ঠিকই বলেছে। সাধারণ মানুষেরই ছিল শিল্পবোধ। যখমাচারি একা তো এই মন্দির গড়েন নি। তিনি হয়তো পরিকল্পনাটিই তৈরি করেছিলেন। মন্দিরের গায়ে এই শিল্পের নমুনা তো সাধারণ শিল্পীদেরই হাতের কাজ। একজন দুজন নয়, শয়ে শয়ে লোক কাজ করেছে। শয়ে শয়ে মজুর। তাদের মধ্যেই শিল্পী ছিল। তারা দিনের পর দিন, বছরের পর বছর অক্লান্ত ভাবে এই পাথর কেটে কেটে এই স্বপ্ন রচনা করেছে। কত বিচিত্র কল্পনা, বলিষ্ঠ সংযত সুন্দর। আর কী স্বপ্নময় প্রকাশ। জীবনের আনন্দ ও বেদনা এই পাথরের গায়ে একাকার হয়ে আছে। বললুম: এ একটা যুগের সৌন্দর্যচেতনা। সে যুগটাকে হারিয়ে আমরা তাকে মধ্যযুগ বলে নিন্দা করতে শিখেছি।

সে যুগটাকে আর কিছুতেই ফেরানো যায় না, তাই না?

কে ফেরাবে? আজও এদেশে বড় বড় শিল্পী আছেন। তাঁরা একটা প্রাণবন্ত মূর্তি গড়তে পারেন, কিন্তু এমন একটা মন্দির গড়তে পারেন না। একজনের কাজ হলে হয়তো পারতেন। দশজনের কাজ হলেও সাহস করা যায়। এ যে হাজার হাজার শিল্পী মজুরের কাজ। এ যুগে এমন একটা মন্দির গড়া আর কিছুতেই সম্ভব নয়।

তাপ্তি বলল: আমি শিল্পীর কথা বলছি না, আমি সৌন্দর্যচেতনার কথা বলছি।

সে আরও কঠিন। শিল্পের দিকে আজও মানুষ তাকিয়ে দেখে,

কিন্তু তার দাম দেয় না। দাম দিতে ভুলে গেছে। যার দাম দেয়, সে শিল্প নয় সৌন্দর্যও নয়। সে ভোগ। পৃথিবীর মানুষ আজ ভোগ করতে শিখেছে। এই ভোগের ব্যাধি থেকে মুক্ত না হলে সৌন্দর্যচেতনা আর ফিরে আসবে না।

তাপ্তি কঠিন দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাল। বললুম ঃ আমি সিনিক নই, জীবনটাকে বাঁকা চোখে আমি কোনদিন দেখিনা। কিন্তু তবু যা দেখতে পাই তা বড় নৈরাশ্যজনক। পৃথিবীর মানুষ আজ একটা জিনিস আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইছে—সে টাকা। ঐ টাকাই আজকাল মনুষ্যত্বের মান, ঐ টাকাই সমাজের ছাড়পত্র। যার টাকা আছে তার সব আছে, যার নেই তাকে সমাজ মানুষ ভাবে না। টাকা দিয়ে আজ সমস্ত পাপের সমস্ত দুষ্কৃতির সমস্ত পশুত্বের প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব। পৃথিবীর মনুসংহিতা নতুন করে লেখা হচ্ছে।

নিজেকে বোধহয় আমি হারিয়ে ফেলেছিলুম। আমার তো এমন হয় না। হঠাৎ আজ আমার এ কী হল! লজ্জিত ভাবে আমি থেমে গেলুম।

পিছন থেকে স্বাতি বলল ঃ থামলে কেন গোপালদা?

এ কি! স্বাতিও তাহলে সব শুনে ফেলেছে! ফিরে দেখলুম, মামা মামীও আমার পিছনে দাঁড়িয়ে। লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল।

মামা বললেন ঃ কথাটা তুমি মিথ্যা বল নি। দিল্লীতে আমি হাড়ে হাড়ে সব অনুভব করছি।

গোপালদা কি দিল্লী দেখেছ?

সত্য তো এক জায়গায় আটকে থাকে না স্বাতি, চোখ মেলে থাকলেই তা দেখতে পাওয়া যায়।

মামা বললেন ঃ তুমি একবার দিল্লী এস। দিল্লীর শহর আর সমাজ দুটোই দেখে যাও। সরকার তো আমায় থাকবার আস্তানা দিয়েছে। তোমার কোন অসুবিধা হবে না।

বললুম ঃ আসব।

সকৌতুকে স্বাতি বলল ঃ কথা দিলে কিন্তু গোপালদা, ভুলে যাবার চেষ্টা করলেও মনে করিয়ে দেব। এই বড়দিনেই বেড়াতে এস।

পাঞ্জাবীর পকেট দুটো ঝেড়ে দেখিয়ে দিলুম যে ও দুটো শূন্য। শূন্যই থাকে। ও দুটো ভরাবার জন্যে সরকারের কোন মাথাব্যথা নেই। মাথাব্যথা শুধু নিজের পকেটের জন্যে।

ছেলেমানুষের মতো স্বাতি বলল ঃ কোন অজুহাত শুনব না।

উত্তরে আমি শুধু হাসলুম।

তাপ্তি সরে গিয়ে মন্দিরগাত্রের চিত্রগুলি ভাল করে লক্ষ্য করছিল। আমরাও এগিয়ে গেলুম। এখানেও সেই হাতির সারি, সিংহ আর ঘোড়সওয়ার, পৌরাণিক পশু পাখি, ফুললতাপাতা। আরও আছে পুরাণের নানা কাহিনীর চিত্র, দেবদেবী। ছোটখাট চিত্র এঁকেই শিল্পীরা সন্তুষ্ট হয় নি। বড় বড় মূর্তিও গড়েছে। সূক্ষ্ম কারুকার্যমণ্ডিত শিল্পঋদ্ধ সুন্দর মূর্তি। চোখ ফেরাতে ইচ্ছা করে না।

কে একজন বলেছিলেন, মানুষের বন্য বিশ্বাস আর উষ্ণ অনুভূতি—দুইই এই দেওয়ালে ধরা আছে। কথাটা মিথ্যা নয়।

এই মন্দিরের চারটি দ্বার, কিন্তু চারদিকে চারটি নয়। উত্তরে ও দক্ষিণে একটি করে, পূর্বে দুটি। দ্বারের পাশে নানা মূর্তি। কোথাও তাণ্ডবেশ্বর, মকরের উপর সস্ত্রীক বরুণদেব। কোথাও দ্বারপাল।

মামা বললেন ঃ দেবতাদের মূর্তিগুলো কি চিনতে পেরেছ ?

কিছু কিছু চিনেছি বৈকি। ময়ূরবাহন কার্তিক সিদ্ধিদাতা গণেশ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইন্দ্র সূর্য পার্বতী সরস্বতী। এ ছাড়া বামন বরাহ নরসিংহের মূর্তি, মূর্তি আছে গরুড় গজাসুরের। এক ধারে রামায়ণ মহাভারত এবং শিব ও বিষ্ণু পুরাণের অনেক চিত্র আছে। রাম-রাবণ কর্ণার্জুনের যুদ্ধ ক্ষীরসমুদ্র মন্থন কৃষ্ণচরিত্র সবই সুচিত্রিত আছে।

নগ্ন মূর্তিগুলির কথা আমি বলতে পারলুম না। ভৈরবের নগ্ন মূর্তি দেখেছি গোটা ছয়েক আর সর্পবেষ্টিত মোহিনীর নগ্ন নারীমূর্তি আছে অনেকগুলি। সাজসজ্জাও দর্শনীয়। নর্তকীদের অনেকে ব্রিচেস পরিহিতা। ঘোড়সওয়ারেরা পরেছে লম্বা বুট। পৌরাণিক পুরুষেরা কোট পরিহিত, তাদের কোমরে কোমরবন্ধ।

কেদারেশ্বরের মন্দির নাকি সোমনাথপুরের কেশব মন্দিরেব মতো। কিছু মিল, গরমিলই বেশি। স্থাপত্যরীতি চালুক্যদের মতো। কিন্তু নির্মাণ করেছিলেন বীর বল্লাল ১২১৯ খ্রীষ্টাব্দে।

একদা যে জৈনদের কয়েক শো বস্তি ছিল, তার প্রমাণ আজও আছে। কয়েক শোর কয়েকটি বস্তি আজও টিকে আছে। তার মধ্যে আছে পার্শ্বনাথ ও শান্তিনাথের বস্তি। পার্শ্বনাথের বস্তিতে এমন কয়েকটি স্তম্ভ আছে যা শৌখিন আয়নার কাজ করে।

এ স্থানের চারিধারে ধ্বংসস্তূপ। কোথাও প্রাসাদ দুর্গের ভাঙ্গা প্রাচীর, কোথাও ধূলিসাৎ মন্দিরের ঢিবি। কোথায় কী ছিল আজ তার হদিস পাওয়া যায় না, কিন্তু অনেক কিছু যে ছিল তার প্রমাণ আছে সর্বত্র বিক্ষিপ্ত হয়ে।

ফেরার আগে আমরা এক বিদেশী যুবকের সন্ধান পেলুম। তরুণ বয়স, ভারি মিষ্টি চেহারা। কিন্তু একটু রুক্ষ ও উদাস। মনে হল, পথশ্রমে ক্লান্ত হয়েছে। ভারতের মানুষ যে নয়, তাতে আমার সন্দেহ ছিল না। তাই এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করলুম।

যুবকটি এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। একটু চমকে উঠে হাত জুড়ে নমস্কার করল। মুখেও বলল ঃ নমস্কার।

ভারি ভাল লাগল এক বিদেশীর কাছে এই ভারতীয় প্রথার সমাদর। অল্পক্ষণেই পরিচয় হয়ে গেল। সে ফরাসী, ভারতবর্ষ দেখতে এসেছে। এক টুকরো কাগজে দ্রষ্টব্য স্থানগুলোর নাম লিখে এনেছে। বম্বে থেকে অজান্তা ইলোরা দেখে ওয়ার্ধায় গিয়েছিল

মহাত্মাজীর আশ্রম দেখতে। তার লোভ ছিল মহাত্মাজীর সম্বন্ধে কিছু জানবার। যারা তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছে আর তাঁর আদর্শ আজও নিষ্ঠার সঙ্গে বহন করছে, তাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সে আনন্দ পেয়েছে। সেখান থেকে সেকেন্দ্রাবাদ এসেছিল। তারপর ব্যাঙ্গালোর-হাসান। আজ মহিসুর যাবে।

এর নিরভিমান সরলতা আমার ভাল লাগল। ইচ্ছে হল, একে সঙ্গে নিয়ে ফিরি। তাপ্তি আমার পাশে দাঁড়িয়ে সবই শুনেছে। মনে হল, আমার মতো তারও ইচ্ছে হচ্ছে এই যুবকটিকে সঙ্গী করবার। বিদেশীব মুখে আমাদেব দেশের কথা জানতে ইচ্ছা করে—কী ভেবে এসেছিল আর কেমন লাগল। কিন্তু তাকে নিমন্ত্রণ জানাবার সাহস আমাদের হল না। মামার অনুমতি না নিয়ে এ কাজ করা সঙ্গত হবে না।

আশ্চর্য হলুম স্বাতির কাণ্ড দেখে। তাপ্তিকে বলল: তুমি আমার পাশে বসতে পারবে না? একটু ঘেঁষাঘেঁষিই না হয় হবে।

মামা বললেন: তার কী দরকার?

স্বাতি বলল: ঐ ভদ্রলোকও আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে।

বলেই সে যুবকটিকে তার অনুরোধ জানাল।

এ বোধহয় তার কল্পনার অতীত ছিল। চট করে উত্তর দিতে পারল না।

আমি বললুম: বেশ তো, চলুন না।

সে লজ্জা পেল। এই সামান্য পরিচয় নিয়ে এই পরিবারের সঙ্গী হওয়া বোধহয় ধৃষ্টতার কাজ হবে। সসঙ্কোচে জবাব দিল: আমি বাসে এসেছি, বাসেই ফিরব।

মামীর অসন্তোষের ভয়ে আমরা আর জোর করলুম না।

সময় আমরা কোথাও নষ্ট করি নি। যতটুকু নিতান্ত প্রয়োজন, ঠিক ততটুকু। তার বেশি আমরা একটুও নিই নি। শ্রীরঙ্গপত্তন আমাদের দেখতে হবে। একটু আলো থাকতে যদি না পৌঁছতে পারি তো অন্ধকারে কি কিছু দেখতে পাব !

ড্রাইভার আমাদের সদর রাস্তায় আনে নি। এনেছে একটা নির্জন পথে। পাহাড়ের ধারে ধারে লাল সুরকির পথ। দুধারে বুনো ফুল। দূরে দূরে, দু একটা ঘর বাড়ি, চাষের ক্ষেত। এ পথে যে মোটর বাস চলে না তা বোঝা যাচ্ছে। কোনখানে চাকার দাগ নেই। থাকলেও আমাদের নজরে পড়ছে না।

মামা বললেন : এ আবার কোন্ রাস্তায় এল ?

মামার দুর্ভাবনার কারণ আমার মনে পড়ে গেল। এখানে যদি চাকা বেগড়ায় তো বিপদের অন্ত থাকবে না। পথের ধারে পাহাড়। বন ঘন না হলেও জানোয়ার হয়তো হিংস্র আছে। দুভাবনার কথাই বটে। জিজ্ঞাসা করলুম : বড় রাস্তা কতদূর ?

হাসানে গিয়ে মিলবে।

মনে মনে হিসেব করে বললুম : সে তো মাইল ত্রিশেক পথ।

মাইল পাঁচেক সংক্ষেপ হবে।

ড্রাইভারের কণ্ঠস্বরে কোন উদ্বেগের আভাষ নেই।

মামা বললেন : চাকাটা বদলেছে তো ?

ড্রাইভার বলল : পুরনোটাও মেরামত করে নিয়েছি।

অর্থাৎ এখনও তার হাতে একটা অতিরিক্ত চাকা আছে। কিন্তু চাকার অবস্থা আমরা দেখতেই পেয়েছি। ও বেগড়াতে সময় লাগবে না। পথের উপর একখানা পাথর কিংবা একটা গর্তই যথেষ্ট হবে।

তাপ্তি আস্তে আস্তে বলল : আপনাদের দুর্ভাবনা দেখে আমার মজা লাগছে।

কেন বলুন তো।

দেশ থেকে এত দূরে এসেও ঘরের ভাবনা! নাইবা ফিরতে পারলাম! ঐ রকম একটা কুটীরে কি একটা রাত কাটাতে পারব না?

কেন পারব না! ভাবতেও তো ভাল লাগে! কিন্তু যাঁরা পিছনে বসেছেন, তাঁদের জাত আলাদা।

আমাকে কি আপনার দলে নিলেন?

আপনার কথায় তাই ধরে নিলুম।

এর পরে তাপ্তি অনেকক্ষণ কথা কইল না। কিন্তু আমার মনে হল, সে এইসব কথাই ভাবছে। এক সময় বললুম : আপনার সম্বন্ধে আমার কৌতূহল বাড়ছে।

কেন বলুন তো!

হালেবিদের পথে আপনি কয়েকটা কথা বলেছিলেন। আপনার ব্যক্তিগত কথা। আর কিছু জানতে চাইলে হয়তো আমার অন্যায় হবে।

অনেকক্ষণ পরে তাপ্তি বলল : অন্যায় কেন হবে! কিন্তু সে বড় অপ্রিয় কথা। অযথা আপনার মন ভারাক্রান্ত হবে।

হোক না। আপনার মন তো খানিকটা হাল্কা হবে।

তা হয়তো হবে।

কিন্তু তবু তাপ্তি কিছু বলল না। সে হয়তো এই কথাই ভাবছে। দুদিনের পরিচয়ে কি জীবনের আগল খোলা উচিত! পথের পরিচয় তো পথেই শেষ হয়ে যাবে। তবে আর আনন্দের মুহূর্তকে নষ্ট করে কী লাভ! বেদনার্ত জীবন কি কখনো রঙীন হবে!

বললুম : সেও তো লাভ। চোখের ধারায় শোক যায় ধুয়ে, আর মুখের কথায় মন হাল্কা হয়।

তাপ্তি বলল ঃ আমার দুটো অপরাধ আমাকে ঘর ছাড়া করেছে।

অপরাধ!

আমি চমকে উঠলুম। এমন সুন্দর মেয়ে কি কোন অপরাধ করতে পারে! কোন পাপ? বিশ্বাস হয় না। কিন্তু সে নিজে যদি স্বীকার করে তাহলে আর বিশ্বাস না করে উপায় কী! রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে আমি তার উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগলুম।

তাপ্তি বলল ঃ চমকে উঠলেন তো! উঠবেনই। সেইজন্যেই আমি বলতে চাই নি।

না না, আমি চমকাই নি, আপনি বলুন।

তাপ্তি বলল ঃ প্রথমটি আমার বাবার পয়সা, আর দ্বিতীয়টি—

তাপ্তি থেমে গেল। কিন্তু সেই অসমাপ্ত কথাটি বুঝতে আমার একটুও দেরি হল না। বললুম ঃ দ্বিতীয়টি আমি জানি।

জানেন?

ও যে দেখতেই পাচ্ছি। সবাই আপনার রূপ দেখে।

তাপ্তির ফর্সা গালে রক্তের ছোঁয়া লাগল। অপরিসীম লজ্জায় মুখ নিচু করে রইল।

বললুম ঃ এ দুটো অপরাধের তো প্রায়শ্চিত্ত আছে। আপনি বিয়ে করুন না।

করেছিলাম।

করেছিলেন?

হ্যাঁ।

আমার বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। ভয়ে ভয়ে বললুম ঃ তারপর?

তাপ্তির একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বলল ঃ সব শেষ হয়ে গেছে।

এত শীঘ্র! এমন অকস্মাৎ!

তাপ্তি এ কথার উত্তর দিল না।

পাহাড়ের ধারে ধারে অসমতল উঁচু নিচু পথে আমাদের গাড়ি

ছুটে চলেছে। মনে হল, তাপ্তির জীবন আর ছুটছে না, সে থেমে গেছে। কিন্তু থেমে থাকতেও পারছে না। তার খোঁড়া পা দুটো নিয়ে ছুটবার জন্যে অধীর হয়ে উঠেছে। আমি তার সংযত আচরণেও যেন অস্থিরতার সংবাদ পেয়েছি।

স্টেশনের সেই বিশ্রী লোকটার কথা মনে পড়ল। এখন যেন তাকে খানিকটা চিনতে পারছি। কী নীচ, কী ইতর তার প্রবৃত্তি! কী কুৎসিত অভিসন্ধি! একটা অসহায় মেয়েকে সে কি খেলার পুতুল ভাবছে! লোকটাব সম্বন্ধে কী একটা প্রশ্ন করতে গিয়ে থেমে গেলুম। তাপ্তিকে বোধহয় আরও যন্ত্রণা দেওয়া হবে। তার চেয়ে তাকে ভুলিয়ে রাখি। বললুম: আপনার কথাই ঠিক। বাড়ি থেকে এত দূরে এসেও আমাদের বাড়ির ভাবনা যায় নি।

তাপ্তি হাসল। বড় বিষণ্ণ হাসি। মনে হল, তার কাছে আমি ধরা পড়ে গেছি। কিন্তু ড্রাইভার আমাকে রক্ষা করল। বলল: এদিকে না এসে উত্তর-পশ্চিমে গেলে আমরা চমৎকার দৃশ্য দেখতে পেতাম।

কী রকম?

বাবা বুধন গিরিমালা। বেশি দূর নয়, সুন্দর রাস্তায় চোদ্দ মাইল পথ। চিকমাগলুর। মাটি যেন হঠাৎ উঁচু হয়ে গেছে। দু এক হাজার নয়, একেবারে ছ হাজার ফিট।

পাহাড়ের এমন অদ্ভুত নাম কেন হল ড্রাইভার তাও বলল। মক্কা থেকে এক মুসলমান পীর এসেছিলেন, তাঁরই নাম বাবা বুধন। এদেশে আসবার সময় কয়েকটা কফির বীজ এনেছিলেন সঙ্গে করে। এ হল সপ্তদশ শতাব্দীর কথা। আজ এখানকার কফির চাষ দেশ-বিখ্যাত।

মামা বললেন: এসব কথা আগে বললে আমরা দেখে আসতে পারতুম।

ড্রাইভার ইচ্ছা করেই হয়তো বলে নি। অন্ধকার হবার আগেই

তাকে শ্রীরঙ্গপত্তন পৌঁছতে হবে। এই পার্বত্য পথেও সে জোরে জোরে গাড়ি চালাচ্ছে। তার চাকার কথা যেন সে ভুলেই গেছে। কিন্তু আমরা ভুলি নি।

ড্রাইভারের কাছে আর একটা নতুন জায়গার নাম শুনলুম। কেম্মান্না গুণ্ডি। বাবা বুধন পাহাড়ে মহিসুর রাজ্যের গ্রীষ্মাবাস। সমুদ্রতল থেকে ৪৭৫০ ফিট উঁচু। বলল : চিকমাগলুর থেকে চল্লিশ মাইল পথ ঘন কফি বনের ভিতর দিয়ে পাহাড়ে পথে পাক খেয়ে খেয়ে উপরে উঠেছে।

দৃশ্য যে অপূর্ব হবে তাতে আমার সন্দেহ রইল না। কিন্তু ড্রাইভার বলল : বড় নিরিবিলি জায়গা। নতুন নতুন বাংলোগুলো এখানে-সেখানে লুকিয়ে আছে। লোক নেই, ভিড় নেই, কোলাহল নেই। অনেকেরই ভাল লাগে না। আগে মহারাজা একা যেতেন। এখন অনেকেই যায়। কিন্তু এমন নির্জন জায়গায় কেন যায়, তা সবাই বোঝে না।

পাহাড়ের পশ্চিমে নাকি বন আরও গভীর। এ রাজ্যের সেগুন আর চন্দন আসে সেই বন থেকে। লোহা এদিকেই আছে। লোহার মাটি। তিন মাইল লম্বা রোপওয়ে দিয়ে নিচে নামায়।

যায় কোথায়?

ভদ্রাবতী।

ভদ্রাবতীতে কি লোহার কারখানা? শুনিনি তো।

ভদ্রাবতী এ রাজ্যের পুরনো কারখানার শহর। শুধু লোহা আর ইস্পাত নয়, সিমেন্ট ও কাগজও এখানে তৈরি হয়। যদি শৃঙ্গেরী যান তো ভদ্রাবতী অবশ্য দেখবেন। তুঙ্গ নদীর তীরে শঙ্করাচার্যের আশ্রম শৃঙ্গেরী, আর ভদ্রানদীর তীরে ভদ্রাবতী। এধারে বাবা বুধন; রেলে চেপে যদি জোগ ফল্‌স্ দেখতে যান, তাহলে তো ভদ্রাবতী পথেই পড়বে।

ড্রাইভার আমাদের জানিয়ে দিল যে মহিসুর রাজ্যে সর্বত্র মোটর

চলে। মোটরে চেপে জোগ ফল্‌স্‌ও দেখে আসতে পারি। ভদ্রাবতী থেকে চিতলদুর্গ মাত্র পঁয়ষট্টি মাইল।

সে আবার কেমন জায়গা ?

এদিকের মতো একেবারেই নয়। রুক্ষ দেশে একটা প্রাচীন দুর্গ। হায়দার আলি তৈরি করেন আর টিপু সুলতান করেন শক্তিশালী।

সত্তর মাইল উত্তরে সিদ্ধপুরে তিনটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। অশোকের শিলালিপি। এই সিদ্ধপুর তাঁর বিরাট সাম্রাজ্যের দক্ষিণের সীমানা ছিল।

চিতলদুর্গের এক মাইল পশ্চিমে চন্দ্রাবলীর শ্যামল উপত্যকা। এই উপত্যকায় প্রচুর রোমান মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। রোম সম্রাট অগাস্টাস ও টাইবেরিয়াসের মুদ্রা। ভারতের সঙ্গে রোমের বাণিজ্য সম্বন্ধ গভীর ছিল, এ তারই প্রমাণ।

ড্রাইভার বলল: চিতলদুর্গ থেকে হরিহর যাওয়া যায় মহিসুর-বম্বে রাজ্যের সীমানায়। একটি প্রাচীন মন্দিরের নামে এই শহরের নাম। এখানকার ব্যবসা বেশ জমজমাট। এইখান থেকে জেরুসোপ্পা বাষট্টি মাইল পথ, শিমোগা হয়ে যেতে হয়। সাগর বলে একটা শহর আছে, সেখান থেকে লোকে জলপ্রপাত দেখতে যায়। আর কিনে আনে চন্দন ও হাতির দাঁতের জিনিস। জোগ ফল্‌স্‌ দেখেছেন ?

কোথায় আর দেখলুম!

ওঃ, সে এক অদ্ভুত জিনিস! যেমন পথ, তেমনি পথের শেষ। রাস্তার দুধারে বড় বড় গাছ। কয়েক মাইল পথ তো শিমুলের ফুলে লাল হয়ে আছে। আপনারা গিয়ে মাইসোর বাংলোয় উঠবেন। তার আগে সরবতী নদী পাবেন। হেলেদুলে এমন ধীরে সুস্থে বয়ে চলেছে যে তার আটশো তিরিশ ফুটের ঝাঁপ আপনারা বিশ্বাস করতেই পারবেন না। বাংলো থেকে ফল্‌স্‌টা দেখে অন্য নদী ভাববেন।

এই জলপ্রপাতের চারটি ধারা। ড্রাইভার আমাদের ধারাগুলোর নামও শুনিয়ে দিল—রাজা রাণী—রকেট ও রোরার। রাজার রূপই সবচেয়ে সুন্দর। একটা গভীর প্রশস্ত ধারা আটশো পঞ্চাশ ফুট নিচে পড়ে শব্দে ও ফেনায় আবহাওয়াটা আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। আর একধারে রাণী নেমেছে নারীসুলভ লাবণ্য নিয়ে। মাঝখানে রকেট ও রোরার। ঢালে এদের আভিজাত্য নেই। রোরার রাজার সঙ্গে মিলেছে, আর রকেটের ধারাগুলি বিচ্ছিন্নভাবে নেমেছে। প্রপাতের নিচে শুধু নৃত্যেরই ছন্দ নয়, আকাশের রামধনুও দেখতে পাওয়া যাবে।

ড্রাইভার বলল : মাইসোর বাংলোয় বুড়ো সাহেব কয়েকদিন রয়ে গেল। পূর্ণিমার রাতে প্রপাত দেখবে।

কোন্ সাহেব ?

সাহেবের কথা বুঝি বলি নি! ঐ সাহেবই তো আমায় এদিকে টেনে এনেছিল। একেবারে পাগল। বলল, তোমার গাড়ি চাই না, তোমার কাজও না। তুমি আমার পাশে শুধু বসে থাকবে। সাহেব নিজের গাড়ি এনেছিলেন, নিজেই চালালেন। এ রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত। আমি বসে বসে সব দেখলাম।

সত্যি ?

সব সত্যি কথা। প্রথমটায় ভেবেছিলাম, বোধহয় রাস্তা দেখাতে হবে। তারও দরকার হল না। গাড়িতে ম্যাপ খুলে বসেছিলেন, তাই দেখেই চালিয়ে গেলেন। ব্যাঙ্গালোর থেকে জেরুসোপ্পা মাত্র একশো পঁচাওর মাইল পথ। যাবেন আপনারা ?

বলে আমার মুখের দিকে তাকাল।

গম্ভীর ভাবে আমি বললুম : ভেবে দেখি।

২০

হালেবিদ থেকে শ্রীরঙ্গপত্তন একশো মাইলের কম নয়। এই দীর্ঘ পথ মুখ বুজে কে চলতে পারে জানি নে। পিছনের সিটে মামা তামাক ধরিয়েছেন, মামী চোখ বন্ধ করে বিশ্রাম নিচ্ছেন, আর স্বাতি পথের শোভা দেখছে নিবিষ্ট মনে। তার কান আমাদের দিকে পেতে রেখেছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

পিছন ফিরে কথা কইতে কিছু কষ্ট হয়। দেহের কষ্ট, কণ্ঠেরও বটে। জোরে কথা না বললে চলে না। অথচ পাশের এই মেয়েটার সঙ্গে বড় স্বচ্ছন্দে কথা বলা চলে। অভাব শুধু বিষয়বস্তুর। কী বলা যায়, তাই ভেবে পাচ্ছি না।

শেষ পর্যন্ত তাপ্তিই কথা কইল, বলল: বাঙলা দেশে মেয়েদের স্বাধীনতা কী রকম?

স্বাতিকে তো দেখতে পাচ্ছেন।

দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু বুঝতে কিছুই পারছি না।

খুব পরাধীন। নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়েরা পেটের দায়ে রোজগারে বেরিয়েছে। স্বাধীন হবার ইচ্ছায় নয়, নিতান্তই জীবন-ধারণের চেষ্টায়। ভাল পাত্র পেলে চাকরি ছেড়ে দিতে তারা ইতস্তত করবে না।

তাপ্তি আর প্রশ্ন করল না। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বললুম: আমি সাধারণ নিয়মের কথা বললুম। স্বাধীন জীবন যাপনের লোভেই চাকরি বাকরি করছে, এমন মেয়েরও অভাব হবে না।

সত্যি!

তাপ্তির দৃষ্টিতে একরকমের অদ্ভুত তৃপ্তি দেখতে পেলুম।

বলল: আপনার পরিচিত কেউ আছেন?

আমার পরিচিত!

সহসা কোন নাম আমি মনে করতে পারলুম না। কটা মেয়েকে আমি চিনি যে চিন্তা করলেই কারও নাম মনে আসবে! বললুম: আমার পরিচিত কেউ নেই।

তাপ্তির প্রশ্ন যেন ফুরোয় নি। বললুম: আমার কোন সমাজ নেই, তাই কোন পরিচিত মেয়ের নাম মনে পড়ছে না। আমি একেবারে একা।

আমার সম্বন্ধে তাপ্তি বোধহয় এই রকমই কিছু ভেবেছিল। বলল: আপনাকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হয়।

এত মানুষের সঙ্গেও?

আপনার ব্যবহারে একটা ব্যবধানের ইঙ্গিত আমি দেখতে পাই। মিশে গিয়েও যেন মিল হচ্ছে না।

আমি তার মন্তব্য শুনে বিস্মিত হলুম। আমি কি নিজেই এই ব্যবধান সৃষ্টি করি নি! কিন্তু কেন করেছি! এ আমার চারিত্রিক দুর্বলতা নয় তো! কিন্তু দুর্বলতা কেন থাকবে! মানুষ যখন কিছু চায় তখন সে দুর্বল। আমার কেন এই দুর্বলতা আসবে! আমি কি কারও কাছে কিছু চাই?

খানিকক্ষণ নীরবে থাকবার পর আমি প্রশ্ন করলুম: আমার পরিচিত কোন স্বাধীন মেয়ে থাকলে আপনি কী করতেন?

তাপ্তি এবারে ভাবনায় পড়ল, বলল: তাই তো।

আমি বলব?

আপনি বলতে পারবেন?

কেন পারব না! আপনিও যে তারই মতো স্বাধীন জীবনের পথ খুঁজছেন। হয়তো একটু উপদেশ কিংবা সাহায্যের দরকার বোধ করছেন।

চিন্তিত ভাবে তাপ্তি বলল: বোধহয় তাই।

বললুম: বোধহয় নয়, সত্যিই তাই। কিন্তু তার তো কোন

প্রয়োজন নেই। আপনার যোগ্যতা আছে, আপনার বাসনা আছে। সাহস করে আপনি নিজেই কেন এগিয়ে যাবেন না?

বাধার কথা আপনি কেন ভাবছেন না?

ডিওোবাব উৎসাহ যোগায় বলেই সে বাধা। বাধা না থাকলে মানুষ অলস হত, মানুষ ঝিমিয়ে যেত।

আপনিও দেখছি বাধা।

কেন?

আপনিও তো বেশ উৎসাহ দিচ্ছেন। আপনাব সংজ্ঞা অনুসারে তাহলে আপনিও বাধা।

তাব কথায আমি হেসে উঠেছিলুম। একেবারে অনাবিল হাসি। তারপরেই এলুম বুদ্ধিব জগতে ফিরে। গাড়িতে মামা মামী আছেন। স্বাতি আছে। তাঁরা কী ভাবলেন!

কী ভাববেন তাঁরা! কেন ভাববেন! আমি তো শুধু হেসেছি। হাসি কি অন্যায়! লক্ষ্য করিনি যে হাসি আমার অকস্মাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাপ্তি তা লক্ষ্য করে বলল, হঠাৎ লজ্জিত হয়ে পড়লেন যে!

এর উত্তর আমাকে দিতে হল না। পিছন থেকে মামা বললেন: রহস্যটা একা একাই উপভোগ করবে গোপাল?

আমি পিছন ফিরে বাঙলায় বললুম: তাপ্তি রসিকতা জানে।

মামা বললেন, তাইতেই তো বলছি একটু জোরে বল। অমন ফিসফিস করে কথা কইবার দরকার কী!

আমার বিপদ বাড়ল। মামাকে এবারে কী বলি! প্রাণের দায়ে ড্রাইভারকে প্রশ্ন করলুম, হাসান আর কতদূর?

ড্রাইভার বলল: কফির জন্য দাঁড়াতে হবে কি?

আমি মামার আদেশের জন্য পিছন ফিরে তাকালুম। মামা বললেন: এদেশের কফিটা মন্দ নয়, কী বল গোপাল?

বোধ হয় আমার হাসির শব্দেই মামীর তন্দ্রা ভেঙে গিয়েছিল। বললেন: কোন্‌টা খারাপ?

মামা বললেন : তাও বটে।

ড্রাইভারকে আমি জানিয়ে দিলুম যে কফির নেশা আমাদেরও আছে।

আমরা যখন শ্রীরঙ্গপত্তনে পৌঁছলুম, তখন সূর্যাস্ত হতে আর বেশি বিলম্ব নেই। সরল পাকা রাস্তায় আমরা আসি নি, তাতে বোধহয় সময় বেশি লাগত, না লাগলেও পেট্রল যে বেশি পুড়ত তাতে সন্দেহ নেই। ড্রাইভার আমাদের অপেক্ষাকৃত অসমতল পথেই বেগে নিয়ে এল। তাতে পথের সংক্ষেপ হল, পেট্রলও বাঁচল। কিন্তু চাকার আয়ু যে নিশ্চিত ভাবে কমল, সে কথা ড্রাইভার ভাবল না। গাড়িটা কি তার নিজের নয়? চাকার ভার যদি মালিককে বইতে হয়, তাহলে তার বুদ্ধিকে প্রশংসাই করব। মামা বলছিলেন যে এই রকম বিষয়বুদ্ধিই বর্তমান ভারত সরকারের নীতি। টাকা যখন গৌরী সেন দেবে, তখন যা পাও লুটেপুটে খাও। কয়েক ফোঁটা পেট্রল, তাই সই। হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ।

মহিস্থরের ইতিহাস যেন দুটো মানুষেব বীরত্বের কাহিনী। হায়দর আলি আর টিপু সুলতান। তাব আগে ও পরে আর যেন কিছু ছিল না। থাকতে পারে না। পানিপথে মাবাঠাদের তৃতীয় যুদ্ধ হয়ে গেছে। ক্ষয়িষ্ণু শক্তি মারাঠা। হায়দর তখন একজন সামান্য সৈনিক। বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ও অসমসাহসী বীর। বীবত্বে ও কৌশলে তিনি হিন্দুরাজ্য মহিস্থরের অধিকার গ্রহণ করলেন। এ ঘটনা দুশো বছরেও পুরনো হয় নি। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে হায়দর আলির নাম ইতিহাসেব পাতায় লেখা হল। তিনি নিজাম ও মারাঠাদেব রাজ্য থেকে কিছু কিছু কেড়ে নিয়ে একটি শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তুললেন। মাদ্রাজে বসে ইংরেজরা এইসব দেখছিল। কিন্তু ভাল চোখে দেখছিল না। এক সময়ে অকারণে বিবাদ বাধিয়ে যারপর-নাই অপদস্থ হল। যুদ্ধে ইংরেজ সেনাকে বিধ্বস্ত করে হায়দর আলি

যখন মাদ্রাজ গ্রাস করতে যাচ্ছেন, তখন তারা সন্ধি করতে বাধ্য হল। রাজী হল যে নিজাম বা মারাঠা যদি মহিসুর আক্রমণ করে, ইংরেজ হায়দরকে সাহায্য করবে। ইংরেজের এতবড় পরাজয় এর আগে কখনও হয় নি।

কিন্তু ইংরেজ বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। মাত্র এক বছর পরে তাদের সন্ধির সর্ত পালন করে নি। মারাঠারা মহিসুর আক্রমণ করেছিল। ইংরেজ মজা দেখেছে, উপভোগ করেছে তাদের পরাজয়। হায়দর এই বিশ্বাসঘাতকতার কথা জীবনে কোনদিন ভোলেন নি। এই জাতের প্রতি তাঁর মর্মান্তিক ঘৃণার কথা ইতিহাসেব পাতায় লেখা হয়ে গেছে।

হায়দর আলি জানতেন যে ইংরেজ পরাক্রান্ত শত্রু। তার সঙ্গে বিবাদ রাখতে গেলে প্রতিবেশী শক্তিদের সঙ্গে মৈত্রী চাই। রেখেছিলেনও। হায়দ্রাবাদের নিজাম ও নাগপুরের ভোঁসলার সঙ্গে স্থির করেছিলেন যে বিদেশে ইংরেজ ও ফরাসীর যুদ্ধের সুযোগ দেশে তাঁরা গ্রহণ করবেন। তাঁরা তিন শক্তি একযোগে মাদ্রাজ ও বাংলা থেকে ইংবেজের উচ্ছেদ করবেন। কিন্তু হেস্টিংস আরও বেশি কুশলী ছিলেন। নিজাম ও ভোঁসলাকে ঘুষ দিয়ে কিনে নিলেন—নিজামকে জমি দিয়ে ভোঁসলাকে অর্থ দিয়ে। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁরা দাঁড়িয়ে রইলেন, যুদ্ধ করলেন একা হায়দর আলি।

মালাবার উপকূলে মাহেতে ছিল ফবাসী অধিকার। ইয়োরোপে যখন ইংরেজ আর ফরাসীতে যুদ্ধ, তখন ভারতের ইংরেজ মাহে দাবী করল। হায়দর বললেন, ও আমার রাজ্য, আমার আশ্রিত ওরা। ইংরেজ মানল না। জোর করে মাহে দখল করল। কাজেই যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। নিজাম প্রস্তাব করলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলেন বৃদ্ধ হায়দর। তাঁর বয়স তখন আশি। ইংরেজ অধিকৃত কর্ণাট ধ্বংস হল, মাদ্রাজ যায় যায়। সেনাপতি বেইলি আসছিল উত্তর থেকে। হায়দর তার সেনাদল বিধ্বস্ত করলেন। যুবক টিপু ব্রেথওয়েটের

সেনাদলও ধ্বংস করলেন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। হায়দর মারা গেলেন দুবছর পর। বাংলাদেশ থেকে আয়ার কুট এসে কিছু সুবিধার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু টিপু দুর্ধর্ষ। ইংরেজকে শেষ পর্যন্ত সন্ধি করতেই হল। চার বছরের যুদ্ধ একদিন শেষ হল।

সুলতান হয়ে টিপু কী করেছিলেন? ইংরেজকে সন্ধি করতে বাধ্য কবলেন। তারা যা জয় করেছিল তা ফেরৎ দিল, কিন্তু টিপুকেও তো সব ফেরৎ দিতে হল। পাঁচ বছর পর ইংরেজকে আবার শায়েস্তা করতে গিয়েছিলেন। লর্ড কর্নওয়ালিস নাকি তাঁকে পাগল ও বর্বর বলে আড়ালে গাল দিয়েছিলেন। টিপু তাই ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণ করলেন। মিত্রকে রক্ষা করবাব জন্য লর্ড কর্নওয়ালিসও এগিয়ে এলেন। যুদ্ধে টিপুর হার হল। শ্রীরঙ্গপত্তনে অবরুদ্ধ হয়ে তিনি সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। তাতে আদ্ধেক বাজত্ব গেল, ক্ষতিপূরণ দিতে হল তিন কোটি তিরিশ লক্ষ টাকা। আর জামিন নিজের দুই পুত্র। তাদের কলকাতায় এনে রাখা হল।

তারপর? ঠিক দশ বৎসর পরে শ্রীরঙ্গপত্তন ধ্বংস হয়ে গেল। লর্ড ওয়েলেসলি বলেছিলেন, অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ করতে হবে। টিপু বললেন, ক্রীতদাস হয়ে থাকতে পারব না। ফরাসীর সঙ্গে মিলিত হয়ে যখন শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করছিলেন, রাজ্যটা তখুনই গেল। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে। সম্মুখ সমরে টিপু প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

ইংরেজ নিজামের সঙ্গে মহিসুর ভাগ করলেন। পুরনো হিন্দু রাজার উত্তরাধিকারীর ভাগে পড়ল রাজ্যের মধ্য অংশ। কিন্তু ভাবতবর্ষের মানুষ হায়দর আলি আর টিপু সুলতানকে আজও ভুলতে পাবে নি। কেন পারে নি ইতিহাসে তার হদিস নেই।

প্রশ্নটা মামাই করেছিলেন: সুলতান হয়ে টিপু কী করেছিলেন?

ভেবে দেখবার মতো প্রশ্ন। সহসা উত্তর বুঝি যোগায় না। ইংরেজ বণিকের ভারত অধিকারের প্রথম যুগে এমন কত রাজা রাজা

হারিয়েছে তার হিসেব নেই। কিন্তু তাদের সবাইকে তো আমরা স্মরণ করি না। তাদের আমরা ভুলেই গিয়েছি। কিন্তু টিপুকে ভুলতে পারি নি। কেউই পারে নি। টিপু আর তাঁর শ্রীরঙ্গপত্তন আমাদের মনে সোনা হয়ে আছে। কেন আছে?

স্বাতি বলল: এই মসজিদ—

তাড়াতাড়ি মামী বললেন: না না মসজিদ নয়, আর কিছু যদি থাকে তো তাই দেখ।

স্বাতি বলল: কেমন উঁচু উঁচু মিনার দেখা যাচ্ছে!

মসজিদকে যে মামী ভয় পান তা তার ব্যস্ততা দেখেই বোঝা গেল। বললেন: এখান থেকেই তো দেখা হয়ে গেল।

এ ভয় সংস্কারগত। ধর্মস্থান যে পবিত্র, এ কথা সবাই মানবেন। কিন্তু সব মানুষ যে পবিত্র, এ কথা স্বীকার সবাই করেন না। শুধু খ্রীষ্টান বা মুসলমান কেন, হিন্দুদের মধ্যেও অনেক জাত আছে, যাদের অপবিত্র ভাবা হয়। মনের এ সংকীর্ণতা, কুসংস্কার। কিন্তু দীর্ঘদিনের বিশ্বাসে এমন শক্ত দানা বেঁধেছে যে সহজে পরিত্রাণ নেই। মামীকে দোষ দিলে অন্যায় হবে।

আমাদের গাড়ি এসে দাঁড়াল দরিয়া দৌলত বাগের সামনে। সুন্দর একটি ছায়াচ্ছন্ন বাগান বাড়ি। পিছন দিয়ে কাবেরী বইছে কলকল করে, সামনে ফুলের বাগান। শোনা যায় টিপু সামনে দাঁড়িয়ে এই বাগান করিয়েছেন। কাঠের দোতলা বাড়ি, কিন্তু কাঠ কোথাও দেখা যায় না। নিচে থেকে উপর পর্যন্ত অজস্র রঙে চিত্রিত। সোনার জলের এমন দিলদরিয়া ব্যবহার শুধু দরিয়া দৌলতেই সম্ভব। দৌলতের নদী। টিপু বোধ হয় কাবেরীর এই নাম রেখেছিলেন, লোকে এখন এই বাড়িকেই বলে দরিয়া দৌলত। প্রখর গ্রীষ্মে টিপু উটি না গিয়ে এইখানেই বাস করতেন। সুলতান হয়েই টিপু এই প্রাসাদ নির্মাণ করেন।

এখানে গাইডের অভাব নেই। যারা রক্ষী তারাই গাইড।

সামনের বড় বড় চিত্রগুলি কোন্ যুদ্ধের, হায়দর না টিপু সেই সেনাদল পরিচালনা করছেন, এ সব কথা গাইডরাই বলে দেবে।

ভাল করে দেখবার সময় আমাদের হাতে ছিল না। বড় বড় গাছের আড়ালে সূর্য আর দেখা যাচ্ছে না, অথচ দেখবার জিনিস এখনও কিছুই দেখা হয় নি। তাড়াতাড়ি করে আমরা গুম্বজ দেখতে গেলুম। বড় বড় বাড়ির বা প্রাসাদের মাথায় গোল চূড়াকেই গম্বুজ বলে জানতুম। এখানে এসে দেখলুম হায়দর ও টিপুর সমাধিকে এরা গুম্বজ বলছে। শ্বেত মর্মরের বাড়ি, উপরে সুন্দর গম্বুজ। শ্রীরঙ্গপত্তন দ্বীপের একেবারে পূর্বপ্রান্তে সুন্দর একটি বাগানের ভিতর এই স্মৃতি সমাধি। টিপু তাঁর পিতামাতাব জন্য নির্মাণ করেছিলেন। আর ইংরেজ টিপুকেও এইখানে সমাধিস্থ করে। পাশাপাশি তিনটি কবর। ধূপে ধুনোয় তার গম্ভীর আবহাওয়া। ভক্তরা ফুল মালা দিয়ে আজও শ্রদ্ধা নিবেদন করে যাচ্ছে।

এখান থেকে আমরা দুর্গের ভিতরে এলুম। সম্পূর্ণরূপে এ দুর্গ বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। একটি জিনিসও আজ কোথাও সম্পূর্ণ নেই। যা আজও সম্পূর্ণ ও জীবিত আছে, তা রঙ্গনাথের মন্দির। মামীকে খুশী করবার জন্য ড্রাইভারকে আমি বললুম ঃ মন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়াও।

মন্দির ?

মামী আশ্চর্য হলেন!

হ্যাঁ মামীমা, এখানে যে রঙ্গনাথের বিখ্যাত মন্দির।

তা সকালে বল নি কেন ?

মনে মনে আমি প্রমাদ গুনলুম। মামী খেয়ে দেয়ে পূজো করতে পারবেন না। সেই ক্ষোভ তাঁর অনেকদিন থাকবে। সকালে বললে তিনি পূজো দিয়ে জলস্পর্শ করতেন। স্বাতি পুলকিত হয়ে উঠল। আমার চোখের দিকে চেয়ে বলল ঃ জানলে তো বলত। বাগান বাড়ির গাইডদের কাছে খবর পেয়ে এখন বাহাদুরী দেখাচ্ছে।

স্বাতির মন্তব্য শুনে মামা হেসে উঠলেন। আমিও যেন বেঁচে গেলুম। মিথ্যে কথাটা আমি বলতে পারতুম না।

রঙ্গনাথের নামেই শ্রীরঙ্গপত্তনের নাম। বড় প্রাচীন মন্দির। কত প্রাচীন তা নিয়ে অবশ্য মতের বিরোধ আছে। ধর্মে যাঁদের অন্ধ বিশ্বাস তাঁরা বলেন, এ মন্দির মহর্ষি গৌতমের আমলের। পুরাণের অনেক কথাই তো আমরা বিশ্বাস করি, এ কথা বিশ্বাস করতে বাধা কিসের! যাঁরা একথা মানেন না তাঁরা শিলালিপির কথা মানতে বাধ্য হয়েছেন। দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দের কথা তো শিলালিপিতেই লেখা আছে।

এ মন্দিরে আমরা একটা নতুন জিনিস দেখতে পেলুম। ব্রাহ্মণের বদলে ব্রাহ্মণ বালকেরা আমাদের ছেঁকে ধরল। একজনের হাত ছাড়ালেই আর একজন। মন্দিরের পুরাবৃত্ত বলছে গড় গড় করে। ছোট ছোট ছেলেরাও ইংরেজীতে বলছে। শুনতে না চাইলে বলবে, বড় গরীব, পড়বার খরচ জোটে না. একটু বলতে দাও। পয়সা দাও কেউ বলছে না, বলছে শ্রম নিয়ে মজুরি দাও। পাঁচ ছ বছর থেকে দশ বারো বছর বয়সের এক দঙ্গল বালক।

রঙ্গনাথ স্বামীর বিরাট শায়িত মূর্তি। ঠিক শ্রীরঙ্গমের মতো। সায়াহ্নের স্তিমিত আলোকে আমরা দেবতার দর্শন পেলুম।

এ বেলায় যাত্রী নেই। যাত্রী এখানে কোথায়! শ্রীরঙ্গপত্তন যে এখন একটি গণ্ড গ্রাম। মহিসুর এখান থেকে দশ মাইল। মহিসুরের লোক এখানে আসে উৎসবের দিনে। আসে বিশেষ তীর্থ পার্বণে, মানসিক ব্রত উদযাপনে। শ্রীরঙ্গপত্তনে আমরা রঙ্গনাথ দর্শনে আসি নি। টিপু সুলতানের রাজধানী দেখতে এসে দেবতার খবর পেয়েছি। দরিয়া দৌলত গুম্বজ দেখে ভাঙ্গা দুর্গ দেখবার সময় রঙ্গনাথও দর্শন করে যাচ্ছি।

মামা কী দিলেন জানি না, বালকেরা উল্লসিত হয়ে উঠল। আমার দিকে ফিরে বললেন: লক্ষণটা ভাল।

কিসের লক্ষণ ?

দেখলে না, ভিক্ষে এরা চাইলে না।

স্বাতি বলল : তুমি তো ভিক্ষেই দিলে। কারও কাছে কিছু শুনলে তবে মজুরি হত।

এ কথার উত্তর মামা ভেবে পেলেন না, বললেন : ঐ হল।

কিন্তু নিজের ভুলটা বুঝতে পারলেন গাড়িতে উঠবার সময়। আরও একদল ছেলেমেয়ে এসে তাঁকে ছেঁকে ধরল। তারা সবাই তাদের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কিছু চাই। মামার পরাজয়ের দৃশ্যটি বড় করুণ। তাঁর দৃষ্টিতে আমি আহত হবার আভাষ দেখতে পেলুম। ড্রাইভারকে আমি বললুম : চল।

একটুখানি এগোতেই তাপ্তি বলল : টিপু সুলতান শুনেছি যুদ্ধ করতে করতে মারা গেছেন।

ইতিহাসে আমিও তাই পড়েছি। দুর্গদ্বারে তলোয়ার হাতে তিনি যুদ্ধ করছিলেন।

শ্রীরঙ্গপত্তন একটি স্বাভাবিক দুর্গ। কাবেরী নদী হঠাৎ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে আবার যুক্ত হয়েছে। যেমন শ্রীরঙ্গমে। শহর একটি নদীবেষ্টিত দ্বীপ। দ্বীপ নয়, দুর্গ। দুধারে দুটো সেতু দিয়ে দেশের সঙ্গে যুক্ত আছে। টিপুর তৈরি এই সেতু দুটো আজও নতুনের মতো আছে। এরই উপর দিয়ে আমরা যাতায়াত করি।

টিপু ভাবতেন, তাঁর দুর্গ দুর্ভেদ্য। দুরন্ত কাবেরী অতিক্রম করতে পারে এমন শত্রু নেই। দুই সেতুর উপরে সুরক্ষিত দুর্গ দ্বার। ইংরেজ এই দ্বার অতিক্রম করতে পারে নি, পারে নি কাবেরী উত্তীর্ণ হতে। তবু শ্রীরঙ্গপত্তন জয় করেছে। ইতিহাস কী বলে জানি নে, বাংলা নাটকে এক তৃতীয় গুপ্ত পথের নাম আছে—লালবাগের পথ। গৃহশত্রু সেই পথে ইংরেজকে ঘরে নিয়ে এসেছে। এই দুর্গের ভিতর আজ কোন বাগ নেই। সবই ধ্বংসস্তূপ। লালবাগ কোথায় আজ কেউ বলে দেবার নেই।

তাপ্তি জিজ্ঞাসা করল: টিপুকে আপনারা খুব ভালবাসেন, তাই না ?

বাসি, কিন্তু কেন বাসি জানি না।

ক্ষুদিরাম বসুকে কেন ভালবাসেন ? সে তো শুনেছি জীবনে একটি কাজ করেছিল, একটি গুলি ছোঁড়া।

দেশের জন্যে অত বড় আত্মদান !

টিপুরও কি আত্মদান নয় ? লর্ড ওয়েলেসলির অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ করে টিপু কি আর সব রাজার মতো সুলতান হয়ে সুখে থাকতে পারতেন না ! সে সুখের লোভ কেন তাঁর হল না ! কেন এগিয়ে গেলেন বাধা দিতে ! যদি বাধা দিতে পারতেন তো ভারতের মানচিত্র সেদিন লাল হয়ে যেত না। ক্ষুদিরামরা তো সেই লাল রঙ মুছতে গিয়েছিল। টিপু সেই লাল রঙ ছড়াতে দিতে চান নি। ক্ষুদিরামরা অনেক ছিল, কিন্তু টিপু একা। সমস্ত সুখের আশা জলাঞ্জলি দিয়ে টিপু একা লড়তে গিয়েছিলেন। সেদিন ভারতবর্ষে তাঁর একটা সঙ্গী থাকলে শ্রীরঙ্গপত্তনের ধ্বংসস্তূপ আজ দেখতে হত না।

টিপুকে আমরা আজও চিনতে পারি নি।

২১

শ্রীরঙ্গপত্তন থেকে ফেরার পথে চামুণ্ডি পাহাড়কে দেখলুম আলোর মালায় সজ্জিত। শুধু প্রাসাদ আর মন্দির নয়, পাহাড়ের কালো দেহটাও মালা জড়ানো। বিজলী আলোর মালা। ওটা রাজপথ। দিনের বেলায় যে পথ আত্মগোপন করে থাকে, সে পথের বিজ্ঞাপন দেখি অন্ধকার রাত্রে। অপূর্ব রূপ !

আলোকিত পথে আমরা স্টেশনে ফিরে এলুম। ফিরে এলুম পার্থিব জগতে, আমাদের চেতনার জগতে। অতীতটা যেন সহসা মনে পড়ে গেল। মনে পড়ল, তাপ্তির কথা। এতক্ষণ যে মেয়েটার সঙ্গে পাশাপাশি বসে এলুম, সে যে আমাদের কেউ নয়, সে কথা মনে ছিল না। সেই বিশ্রী লোকটার কথাও ভুলে গিয়েছিলুম। ভুলে গিয়ে শান্তিতে ছিলুম। গাড়ি থেকে নামবার সময় মনে হল, লোকটা হয়তো থামের আড়ালে লুকিয়ে আছে। এইবারে মুখ বাড়াবে। তাপ্তির শান্তি ভঙ্গ করতে পারলেই তার পরম আনন্দ।

আমি তাড়াতাড়ি আমাদের জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নিলুম। তাড়া দিয়ে বললুম: চল চল, ওপরে চল।

মামা বললেন: তোমরা এগোও। আমি এর পয়সা মিটিয়ে আসছি।

ড্রাইভার বলল: কাল আবার আসব তো? সোমনাথপুর শিবসমুদ্রম বৃন্দাবন?

অসহিষ্ণুভাবে মামা বললেন: রক্ষে কর।

আমি বললুম: কালকের কথা কাল ভাবব।

সেই বিশ্রী লোকটা তার মুখ বাড়াল না দেখে খুশী হলুম। কিন্তু তাপ্তি আমার অনুসন্ধানী দৃষ্টি যে দেখতে পেয়েছে তাতে সন্দেহ

নেই। সে কিছু জানতে চাইল না বলেই আমার সন্দেহ গভীর হল।

পরদিন সকালে মামা বেরতে রাজী হলেন না। বললেন: 'মনসা'ও কিছু দেখতে দাও।

মন দিয়ে দেখা আরও ভাল যায়। দৃষ্টি দিয়ে যা দেখতে পাইনে, তা তো মন দিয়েই দেখি। কিন্তু মন দিয়ে দেখবার জন্য তো এত দূরে আসবার দরকার ছিল না। স্বাতি সেই কথাই বলল: বিকেলে আমরা বৃন্দাবন গার্ডেনে যাব।

মামা আপত্তি করলেন না। সকালবেলাটা আমরা ছুটি পেয়ে গেলুম।

তাপ্তি এ ঘরে ছিল না। স্বাতি বলল: তাপ্তি তোমাকে খুঁজছে।

কেন?

সে তুমি জান।

আমি?

স্বাতির উত্তর শুনে আমি বিস্মিত হয়েছিলুম। তাপ্তি আমাকে কেন খুঁজছে, সে কথা আমি কী করে জানব! অথচ স্বাতি অন্যরকম ভাবছে। কেন ভাবছে, তাও আমার জানা নেই।

নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম: দেখে আসি।

সত্যিই দেখতে গেলুম। পাশের ঘরে তাপ্তি ছিল না। ওধারের দরজা খোলা। মনে হল, সে উল্টোদিকের বারান্দায় বেরিয়েছে। উঁকি দিয়ে তাকে দেখতেও পেলুম। নিঃশব্দে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে কোন সঙ্কোচ এল না, দ্বিধাও হল না। তাপ্তি গুনগুন করে গান গাইছিল:

বন স্থুমদোলেন্না জীবনভু বিকাশি শুভস্তে।
মন ভানানুগোলিস্থু গুরুভে হে দেব।

আমাকে দেখে তাপ্তি চমকে উঠল না। বললুম: ভারি মিষ্টি গলা তো!

মিষ্টি আমার গলা নয়। মিষ্টি গানের ভাবটি।

আমি তো মানে বুঝি নি, আমি সুর শুনেছি।

তাপ্তি আমাকে কথাগুলি আবার শোনাল। বলল: আমার জীবন হোক বনফুলের মতো কুসুমিত। হে দেব, আমার মন তুমি এমনি করেই গড়ে তোল।

আমি বললুম: আর একবার গাইবেন!

কথা না বলে তাপ্তি আবার গাইল। আমি মুগ্ধ হয়ে সেই গান শুনলুম। তারপর ফিরে এলুম ঘরের ভিতরে।

আমাকে খুঁজছিলেন?

আপনাকে! আপনি তো পাশের ঘরে ছিলেন!

বুঝতে পারলুম, স্বাতি আমাকে ছলনা করেছে। ভালই করেছে। তার কী উদ্দেশ্য আছে জানি নে। আমার উদ্দেশ্য সফল হবে। বললুম: আপনাকে না দেখে আমি নিজেই চলে এলুম।

তাপ্তি হাসল।

বললুম: হাসলেন যে?

এমনি।

সত্যি কথা আপনি লুকোলেন।

সব সত্যি কথা যে সুন্দর হয় না।

তা নাইবা হল।

তাপ্তি বলল: স্বাতি আপনাকে ঠকিয়েছে।

কে বলল?

তাপ্তি আরও একটু হেসে বলল: আমি।

আপনাকে কে বলল?

আমার মন বলব না, বলব আমার বুদ্ধি। দুষ্টু বুদ্ধি।

মুখে এসেছিল, আপনার জাতের বুদ্ধি। কিন্তু কথাটা ভদ্র হবে না ভেবে চেপে গেলুম। মেয়েদের নজর বেশি, বোধ হয় বুদ্ধিও। বললুম: আজ আপনাকে বিরক্ত করব।

আমি তো বিরক্ত হই না।

কিছুতেই না ?

সে তো আপনিও লক্ষ্য করেছেন।

আমি ! আমি আপনাকে বিরক্ত করেছি !

তাপ্তি অকপটে স্বীকার করল : সেই লোকটা, যাকে দেখলে আপনি নিজে বিরক্ত হচ্ছেন। আর আমাকে আড়াল করবার চেষ্টা করছেন !

বিস্ময়ে আমি অভিভূত হয়ে গেলুম। মেয়েটা এত লক্ষ্য করেছে ! আমার নির্বুদ্ধিতা দেখে মনে মনে সে নিশ্চয় হেসেছে। আমি যে নিতান্ত নির্বোধ, এই মুহূর্তে আমার আর তাতে সন্দেহ রইল না।

তাপ্তি হেসে বলল : ও আমার স্বামীর বড় ভাই। ভারতের সেনাদলে আছে।

ভেবেছিলুম তাপ্তি এবারে কিছু মন্তব্য করবে। বলবে, অসভ্য বর্বর। কিন্তু সে কিছুই বলল না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আমি বললুম : তারপর ?

তারপর নয়, তার আগে। আমার স্বামী লেখাপড়া শিখেছিলেন। পড়াশুনো করতেই ভালবাসতেন। ঐ বইগুলো সব তারই।

একটু থেমে বলল : আমাদের সমাজব্যবস্থা বোধ হয় আপনি জানেন না।

ঠিক ধরেছেন।

কোন সময় বোধ হয় মেয়েদের ওপর পুরুষের অবাধ অধিকার ছিল। অন্তত এক পরিবারের পুরুষদের। ঐ লোকটা আমাকে সেই কথা বলতে চাইত। সেদিন যদি তা শুনতাম—

তাহলে কি—

কথাটা তাপ্তি সম্পূর্ণ করছে না। অস্থিরভাবে আমি আবার বললুম : তা হলে কি আপনার স্বামী—

বাকিটুকু আমি শেষ করতে পারলুম না। মুখে আটকে গেল।

ভাই ভাইকে হত্যা করবে, এ কথা সন্দেহ করাও পাপ। কিন্তু মন পাপের ভয় পায় না। ভয় পেয়ে সত্যকে অস্বীকার করে না। তাপ্তি নীরব থেকেই আমার সন্দেহকে সমর্থন করল প্রবলভাবে।

আমার মনে তখন নানা প্রশ্ন উঠেছে কিলবিল করে। কোন্ প্রশ্ন করব, কী ভাবে করব! তাপ্তি যাই ভাবুক, তার সব কথা আমাকে জেনে নিতে হবে। না নিলে আমার শান্তি হবে না। এই ভ্রমণের আনন্দ যাবে নিঃশেষ হয়ে। বললুম: দোহাই আপনার, এমন চুপ করে আপনি থাকবেন না।

স্বাতি কখন এসে আমার পিছনে দাঁড়িয়েছিল আমি খেয়াল করি নি। আস্তে আস্তে বলল: বাবা তোমাদেব ডাকছেন।

তাপ্তি বাঙলা বোঝে না, তাই আমার মুখেব দিকে তাকাল প্রশ্ন নিয়ে। বললুম: ও ঘরে ডাক পড়েছে।

আমার?

স্বাতি বলল: তুজনেরই।

এই ডাক আজ আমার ভাল লাগল না। মনে হল, কোন অমূল্য সম্পদ আমার হাতছাড়া হয়ে গেল। কিন্তু তাপ্তির মুখে কোন ভাবান্তর দেখতে পেলুম না।

মামা বললেন: কুর্গ সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা নেই।

কথাটা ইংরেজীতেই বলেছিলেন। আর তাপ্তি তখনই বলল: বেশ তো, চলুন না তুদিনের জন্যে।

স্বাতি তাপ্তির গা ঘেঁষে বসল, বলল: কাছেই বুঝি?

বাসে আমাদের চার ঘণ্টা লাগে। ট্যাক্সিতে গেলে একদিনেই ঘুরে আসা যায়।

সত্যি!

তাপ্তি বলল: মাইসোর থেকে ম্যাঙ্গালোরের বাস রোজ ছাড়ে। আমাদের মারকারা প্রায় মাঝ পথে।

উল্লসিতভাবে স্বাতি বলল : যাবে বাবা ?

মামা না বলতে পারেন না। হ্যাঁ বলবারও ইচ্ছা নেই। বললেন : ওদেশের গল্প আগে শুনি।

কুর্গের গল্প আমরা শুনলুম। পশ্চিম ঘাট পাহাড়ের কোলে কোডাদের দেশ কুর্গ। আয়তন পনর শো বর্গমাইল, অধিবাসী মাত্র পঞ্চাশ হাজার। একদিকে মহিসুর, অন্যদিকে মালাবার। দুদেশেরই প্রভাব আছে এ দেশের রীতি নীতি ও আচার ব্যবহারে। নিজেদের একটা ভাষা আছে, কিন্তু দীর্ঘদিনের ব্যবহারেও তা প্রশ্রয় পায় নি। লেখাপড়া কানাড়া ভাষাতেই চলে। আজকাল ইংরেজীর প্রচলন অবারিত হয়েছে।

মানুষের সম্বন্ধে তাপ্তি কিছু বলল না। কিন্তু আমার মনে পড়ল আমাদের প্রধান সেনাপতি জেনারেল কারিআপ্পার কথা। ভারতবর্ষের তিনি প্রথম ভারতীয় প্রধান সেনাপতি। কুর্গ তার দেশ। শুনেছি, এ দেশের আরও অনেকে সেনাদলের পদস্থ পদে বহাল আছে। বীরের বংশ বলে এদের একটা প্রবাদ আছে। এই প্রবাদকে এরা মনে প্রাণে সম্মান করে। এরা দেখতেও যেমন, আচরণেও তেমনি সৈনিকের মতো। কিন্তু তাপ্তিকে বড় কোমল বড় নম্র দেখাচ্ছে। তাকে দেখে সৈনিক পরিবারের মানুষ বলে মনে হয় না।

তাপ্তি বলল : বীরের জাত বলে গর্ব করবার আমাদের কিছু নেই। দেশ আমাদের চিরদিনই পরাধীন ছিল। টিপুর মৃত্যুর পর মাত্র চৌত্রিশ বছরের জন্য স্বাধীন ছিল। তারপর ইংরেজের দখলে এল। দ্বিতীয় বীররাজকে তাড়িয়ে তারা একজন ইংরেজ কমিশনারের হাতে শাসনের ভার দিল।

স্বাতি আমার দিকে তাকিয়ে বলল : পুরাণের কথা বুঝি বলবে না ?

প্রয়োজন হলে বলব বৈ কি !

মামা আশ্চর্য হলেন, বললেন : এখানেও তোমার পুরাণ আছে ?

বললুম : স্কন্দ পুরাণে কাবেরী মাহাত্ম্য আছে। কাবেরীর উৎপত্তি হয়েছে এই দেশে।

তাপ্তি বলল : সে অতি সুন্দর স্থান। উঁচু পাহাড়ে ঘেরা বনময় স্থান। আমরা তাকে তলাকাবেরী বলি। দুধারের ঘন বনরাজির মাঝখান দিয়ে কাবেরী বয়ে আসছে। শুধু ধর্মের তীর্থ নয়, সৌন্দর্যেরও তীর্থ। দলে দলে হিন্দু সেখানে অবগাহন করতে যায়, মেলা হয় তুলাসংক্রান্তিতে। মারকারা থেকে মাত্র পঁচিশ মাইল পথ, মোটর বাস নিয়মিত চলে।

স্বাতি বলল : মারকারায় কী দেখবার আছে ?

তেমন কিছুই নেই। একটা পাহাড়ের ওপর পুরনো রাজাদের দুর্গ, রাজবাড়ি। তারই নিকটে ওঙ্কারেশ্বরের মন্দির। ব্রিটিশ অধিকারের পর রাজারা কাশীবাসী হয়েছিলেন, এখনও নাকি সেখানেই থাকেন। রাজবাড়িতে এখন সরকারী দপ্তর।

বললুম : এদেশের বীরত্বের কথা আপনি গোপন করে গেছেন।

মামা বললেন : কী রকম ?

যতটুকু আমার জানা ছিল বললুম। ষষ্ঠ শতাব্দীতে কদম্ব নামে এক রাজা ছিলেন। আজকের অধিবাসী তাঁরই বংশধর। একটি শিলালিপি থেকে জানা গেছে যে নবম শতাব্দীতে এখানে চের বংশীয় রাজা ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে মোগল ঐতিহাসিক ফেরিস্তার সময় এ রাজ্য স্বাধীন ছিল। তারপর রাজত্ব করেন হালেরি পলিগারগন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বীর রাজেন্দ্র তাঁদের ইতিহাস রচনা করান। তার নাম রাজেন্দ্রনামা।

আস্তে আস্তে তাপ্তি বলল : এর ভেতর বীরত্বের কিছু পাওয়া গেল না।

বললুম : অজেয় হায়দর আলি দক্ষিণের সমস্ত রাজ্য জয় করেও কুর্গ থেকে ফিরে গেছেন। ক্ষতি করেছেন অনেক, কিন্তু রাজ্য জয়

করতে পারেন নি। তাঁকে দ্বিতীয়বার আসতে হয়েছিল। হায়দর এই রাজবংশের সবাইকে বন্দী করে নিয়ে যান, আর টিপু রাজ্যের সাড়ে আট হাজার প্রজাকে ধরে নিয়ে যান শ্রীরঙ্গপত্তনে। বন্দীদের মধ্যে ছিলেন রাজবংশের বীর রাজেন্দ্র। তিনি পালিয়ে এসে আবার স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলেন।

রাজ্যে নিষ্ঠুরতার কথা বলবেন না ; প্রজা উৎপীড়নের কথা ?

তবু তো তারা রাজার পক্ষ ছাড়ে নি। ইংরেজের সঙ্গে আমরণ লড়াই করেছে দেশের স্বাধীনতার জন্যে।

স্বাতি বলল ঃ ইতিহাসের চেয়ে দেশটা নিশ্চয়ই বেশি ভাল।

তাপ্তি হাসল। তারপরে বলল ঃ ঠিক ওয়েলসের মতো।

মানে ?

ইংরেজ সেনাপতিরা তাই মনে করতেন। লম্বা ছুটি না পেলে এখানেই আসতেন অবসর যাপনে। কফির বাগানে বন্ধুদের সঙ্গে শিকার করে বেড়াতেন।

স্বাতি কিছু বিমর্ষভাবে বলল ঃ আমাদের জন্যে কী আছে ?

অবলীলাক্রমে তাপ্তি বলল ঃ আমরা আছি।

মামা হেসে উঠলেন।

কতকটা হতাশভাবে স্বাতি বলল ঃ তাহলে আমরা কোথায় যাই ?

সংক্ষেপে বললুম ঃ বৃন্দাবনে।

সে তো বিকেল বেলায়।

তাপ্তি বলল ঃ সোমনাথপুর আর শিবসমুদ্রম তো অনেক দূর। বেলুর আর হালেবিদের চেয়ে ভাল হলে অবশ্যই দেখতে হত।

আপনি দেখেছেন বুঝি ?

তাপ্তি হাসল। বলল ঃ শ্রীরঙ্গপাটনা থেকে উনিশ মাইল পূবে। একটি নিরিবিলি ছোট খাট গ্রাম। লোকে শুধু মন্দির দেখতেই যায়।

এও হয়শাল স্থাপত্যের চমৎকার নিদর্শন। তৃতীয় নরসিংহের

কোন আত্মীয়ের নাম ছিল সোম, প্রতিপত্তিশালী কর্মচারীও বটে। ১২৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই মন্দির স্থাপনা করেন। এখানেও স্থপতি ছিলেন বিখ্যাত যখনাচারি।

স্বাতি বলল : বেলুরের সঙ্গে কিছু পার্থক্য নেই?

আছে বৈকি। তারার মতো ভিতের ওপর তিনটি মিনার। নিচ থেকে উপর অবধি কারুকার্য করা। সে প্রায় একই রকম। যদি ছবি দেখতে চান, আমি দেখাতে পারব।

পর্দার আড়ালে মনে হল কেউ পায়চারি করছে। সঙ্গে সঙ্গেই আমার সেই লোকটার কথা মনে হল। তাড়াতাড়ি বাহিরে বেরিয়ে দেখলুম, সে আমাদের ড্রাইভার। নমস্কার করে কখন বেরব জানতে চাইল।

ফিরে এসে মামাকে সেই কথা বললুম। সেও চেরা পর্দার ফাঁকে মুখ বাড়াল।

মামা বললেন : কোথায় নিয়ে যাবার ইচ্ছে?

শিবসমুদ্রম?

সে অনেক দূর।

দূর আর কোথায়! পঁয়তাল্লিশ মাইল পথ এক বেলাতেই ফিরে আসা যায়। সোমনাথপুর থেকে মাত্র সত্তর মাইল। রাজ্যের সীমানায় গিয়ে কাবেরী আবার দুভাগ হয়েছে। শিবসমুদ্রম একটা দ্বীপ। পাহাড় আর বন, তারপর জলপ্রপাত। চমৎকার দৃশ্য। এক জোড়া প্রপাত—গগনচুক্কি আর বরচুক্কি। নদীটাই দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। শিব আর বিষ্ণুর দুটো মন্দিরও আছে।

মামা বললেন : সবাই পেছনে লেগেছে।

ড্রাইভারকে আমি বিকেলে আসতে বললুম। চা খেয়ে বৃন্দাবন বাগানে যাব।

স্বাতি বোধহয় ক্ষুব্ধ হল।

২২

মামী ক্ষেপে গিয়েছিলেন। পরে দেখলুম, সে রাগে নয়, ভয়ে। সকাল বেলায় গল্প করবার সময় তাপ্তির কোমরে কোন সাংঘাতিক অস্ত্র দেখতে পেয়েছিলেন। ছোরা কিংবা পিস্তল। জিনিসটা লুকনো ছিল, কিন্তু অস্তিত্বটা ঢাকা পড়েনি। মামীর নানা দুর্ভাবনা। জানা নেই শুনো নেই, যাকে তাকে সঙ্গে নেওয়া। কী দরকার ছিল কোথাকার একটা বিদেশী মেয়ের বোঝা ঘাড়ে বইবার।

মামীর কথার সামনে মামা দাঁড়াতে পারেন না। আমতা আমতা করে বলেন, তাতে হয়েছে কী! কোন্ মহাভারতটা অশুদ্ধ হয়েছে!

সে কথা কি এখন বুঝবে, বুঝবে ঠেকে।

সারাজীবনই তো ঠেকে শিখছি।

তবে আর কী!

ভেবেছিলুম, এখানেই এ প্রসঙ্গের নিষ্পত্তি হবে। কিন্তু তা হল না। মামী রায় দিলেন যে আজ রাতে স্বাতি ও-ঘরে শুতে পারবে না। ও-ঘরে মানে তাপ্তির ঘরে। রায় দিয়েই মামীর কর্তব্য শেষ। কিন্তু বেরালের গলায় ঘন্টা কে বাঁধবে! এমন অসৌজন্যের কাজ কে করতে পারে!

আমি একবার মেট্রনের সঙ্গে দেখা করে এলুম। যদি একটা পুরো ঘর পাওয়া যায়, তাহলে মামার সঙ্গে আমি সেখানে যেতে পারি। আর স্বাতি আসবে মামীর কাছে। কিন্তু সেখানে সুবিধা হল না। নতুন আইনে যাত্রীরা তিন দিন থাকতে পারে, তিন দিন কারও পুরো হয় নি। তাপ্তি গেলে ঐ ঘরটাই আমরা পাব। কিন্তু তাপ্তি তো যাবার কথা বলছে না। মনে পড়ছে, সে টিকিটের

কথা একদিন বলেছিল। রেলের একটা টিকিট সে কেটে রেখেছে। কিন্তু কবে যাবে, সে কথা জিজ্ঞাসা করা হয় নি। প্রশ্নটা অভদ্রের মতো শোনাবে বলেই জানতে চাই নি।

মামা বললেন: গোপাল তো সবই শুনলে, ব্যবস্থা একটা কর।

তাপ্তিকেই তাহলে যেতে বলি।

সে কি, তাকে কেন যেতে বলবে!

আর তো উপায় দেখছি না।

এ কথার উত্তর মামা দিতে পারলেন না।

বিকেলে বৃন্দাবন গার্ডেনে যাবার সময় তাপ্তিকে স্বাতি ডেকে নিল। অভ্যাসমতো সে আমার পাশেই বসল। কিন্তু বেদনায় আজ আমার মন ভরে আছে। আমাদের মনের সংকীর্ণতার জন্য বেদনা। মানুষকে আমরা মানুষ ভাবতে পারি নে, বিদেশীকে পারি নে আপন ভাবতে। তাপ্তির মতো সুন্দর মেয়েকেও আমরা সন্দেহ করছি। স্বাতিকে কেউ সন্দেহ করলে কি আমাদের ভাল লাগবে!

মনে হল, এই সংকীর্ণতার জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী। ছোট গণ্ডির মধ্যে তো আর আমরা বাঁধা নই। গণ্ডির বাহিরে যখন বেরিয়ে এসেছি, তখন গোটা বিশ্বটাই আমাদের নতুন গণ্ডির ভিতর আসুক না। বসুধা হবে কুটুম্ব। সে কি কম লাভ!

মামী একে লাভ ভাবছেন না। কোনোদিন বোধ হয় তা ভাববেনও না। তিনি যে পৃথিবীতে মানুষ হয়েছেন, সেখানে তাঁর বিলিয়ে দেবার আদর্শ ছিল না। সেখানে তাঁর আদর্শ ছিল ছোট একটি সংসারকে আঁকড়ে থাকবার। সেই সংসারকে বুকে চেপে তাঁর নারী-জন্ম সার্থক মনে হয়েছে। ঘরের বাহিরে এসে বিশ্বের চেহারা দেখবার তাঁর কোনদিন সাধ হয় নি।

আজও তিনি বিশ্ব দেখতে বাহির হন নি। বেরিয়েছেন তীর্থ

দর্শনে, পুণ্যের লোভে। ইহকালে তো সবই পেয়েছেন, পরকালের জন্য কিছু সঞ্চয় করা দরকার। একই জন্মে যদি জীবনটা শেষ হয়ে যেত, তাহলে বোধ হয় তীর্থ-পরিক্রমারও প্রয়োজন হত না। জপ-তপের বদলে ছেঁসেলে বেশি নজর দিতে পারতেন। মামা একসময়ে খেতে ভালবাসতেন।

শহর থেকে বৃন্দাবন গার্ডেন দশ বারো মাইল উত্তর-পশ্চিমে। কাবেরীকে সেখানে বাঁধা হয়েছে। এতবড় ড্যাম নাকি দক্ষিণ ভারতে আর নেই। নাম কৃষ্ণরাজ সাগর। তারই একধারে বৃন্দাবন গার্ডেন। ফটকের উপর ভাড়া দিতে হয়। হেঁটে এলে ভাড়া মাথাপিছু, আর গাড়িতে এলে মানুষশুদ্ধ দুটাকা। গাড়ি একেবারে বাগানের মাঝখান দিয়ে তার শেষপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়ায়। অনেকটা পথ হাঁটতে হয় না।

গাড়ি থেকে আমরা যখন নামলুম, বেলাশেষের রোদ তখনও ঝলমল করছে। সেই রঙীন আলোয় আমরা বৃন্দাবনের রূপ দেখলুম। পশ্চিমে বাঁধের গা বেয়ে নদীর ধারা বয়ে আসছে। খানিকটা স্থান জলের নিচে এপার থেকে ওপার পর্যন্ত বাঁধানো। ওপারেও বাগান, নানা রঙের ফুলে পাতায় রঙীন হয়ে আছে। অজস্র ফোয়ারা থেকে অবিরত জল ঝরছে। নদীর মাঝখানেও একটি বড় ফোয়ারা। সেখান থেকেও জল উঠছে আকাশের দিকে। আকাশ ছোঁবার চেষ্টা। এই ফোয়ারা বাঁচিয়ে কলের নৌকো সোঁ সোঁ করে ছুটছে। পারানি কড়ি নিয়ে এপারের মানুষকে ওপারে নিয়ে যাচ্ছে। আবার তাদের ফিরিয়ে আনছে।

পূবে বাগানের ভিতর আমরা দাঁড়িয়ে আছি। চওড়া রাস্তার দুধারে নানা রঙের নানা রকমের মরশুমী ফুল। আর ফোয়ারার কত বিচিত্র আয়োজন। জল কোথাও তরতর করে নেমে আসছে, কোথাও চারিদিক থেকে ধারা উঠে একটি বিন্দুতে মিলিত হচ্ছে। সকলের পিছনে বিরাট অট্টালিকা। হোটেল কৃষ্ণরাজ সাগর। বিকেলের চা আমরা এইখানেই খেতে পারতুম। অনেকে খাচ্ছে।

জায়গাটি রমণীয় লাগছে। ছায়া খুঁজে আমরা একটি বেঞ্চির নিচে বসলুম। সন্ধ্যার অপেক্ষা। অন্ধকার হলে বাতি জ্বলবে। নানা রঙের বাতি। এ বাগান তখন আর এরকম থাকবে না, স্বপ্নময় পরীর রাজ্যে পরিণত হয়ে যাবে। আমরা সেই পরীর রাজ্য দেখে বাড়ি ফিরব।

তাপ্তি আমাদের সঙ্গে বসে নি। নদীর ধারে এগিয়ে গিয়ে পায়চারি করছে। স্বাতি বলল ঃ তোমাকে ডাকছে গোপালদা।

আমাকে! কই ডাকে নি তো! আমাকে কেন ডাকবে!

স্বাতি হেসে উঠল। আমার উদ্বেগে সেকি অপরাধী মনেব পরিচয় পেল! তাড়াতাড়ি বললুম ঃ ও হ্যাঁ, বোধহয় তার যাবার ব্যবস্থার জন্যে ডাকছিল!

স্বাতি আবার হাসল। কিন্তু মামা বললেন : ও কি যাবে বলছিল?

ও নয়, মেট্রন বলছিল যে ওর তিনদিন পুরো হয়ে গেছে।

আমি আর অপেক্ষা না করে তাপ্তির দিকে এগিয়ে গেলুম।

আমার পায়ের শব্দ সে শুনল কি না সেই জানে। অনেকটা পথ এগিয়ে গিয়ে থামল। সেখান থেকে মামা মামীকে আর দেখা যাচ্ছে না। বলল ঃ আসুন, এইখানে একটু বসি।

বুঝতে দেরি হল না যে আমার উপস্থিতি সে অনেক আগেই টের পেয়েছে। ইচ্ছে করেই এতক্ষণ কথা বলে নি। আমিও কোন উত্তর না দিয়ে তার পাশে এসে বসলুম।

আমার মনে হল, তাপ্তি আজ কথা কইতে চায়। সেইজন্যেই বোধহয় দূরে ডেকে এনেছে। দুনিয়ার এই নিয়ম। কথা বলতে যে জানে, সে সারাক্ষণ চুপ করে থাকতে পারে না। বুকেব ভিতর যখন কথা জমে ওঠে ভারি হয়ে, সে কথা ব্যথার মতো চাপ দেয়। কাউকে বলতে পারলে হাল্কা হয় বুকখানা। কিন্তু সেই বলার মানুষ যে সংসারে কম। যার একজনও নেই, সে হতভাগ্য। তাপ্তি কি আমাকে কিছু বলবে না? আমি তার মুখের দিকে তাকালুম।

একসময় আস্তে আস্তে তাপ্তি বলল: আপনাদের সঙ্গে আরও দিনকয়েক থাকবার ইচ্ছা ছিল।

বেশ তো।

তা হবে না।

কেন?

আপনার জীবন আমি বিপন্ন করছি।

আমার জীবন!

আমি বিপুল বিস্ময়ে চমকে উঠলুম।

তাপ্তি বলল: আমার কাছে ঘেঁষবার সাহস তার নেই। তাই আক্রোশে আপনাকেই হয়তো আক্রমণ করবে।

আমার বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটে নি। আমি কোন কথা কইতে পারলুম না।

তাপ্তি বলল: মনে হচ্ছে, এই রকম কোন মতলব নিয়ে সে এইখানে এসেছে। আলোয় আছে আত্মগোপন করে।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আমি ভয় পেলুম। বললুম: আমরা যে এখানে আসব, সে কী করে জানল।

তাপ্তি হাসল, বলল: ড্রাইভারকে তো আমরা বলেই রেখেছিলুম।

আমার ভয় বাড়ল। মনে হল, এ কিসের সঙ্গে আমি জড়িয়ে পড়েছি। আমি তো কোন অপরাধ করি নি যে আমায় শাস্তি পেতে হবে।

তাপ্তি বলল: ভয় পেলেন নাকি?

মিথ্যে কথা আমার মুখে এল না, সত্যি কথাও বলতে লজ্জা হল।

তাপ্তি হেসে বলল: আপনার কোন ভয় নেই। এ সব চিন্তাও করবেন না। আমি খুব সজাগ আছি।

তারপরেই বলল: ভাল কথা, আজ আমাকে ঘর ছেড়ে দিতে হবে। নোটিশ পেয়েছি।

এ কথা শুনে আমি লজ্জা পেলুম। মেট্রন বোধহয় আমার কথাতেই নোটিশ দিয়েছে।

তাপ্তি বলল : না পেলেও যেতে হত। আমার টিকিটের আজ মেয়াদ শেষ।

কোথায় যাবেন ?

মাদ্রাজ।

তারপর ?

জীবিকার চেষ্টা। ভরসা আছে যে বড় শহরে কিছু করে খেতে পারব। কিছু না জুটলে বিশ্ববিদ্যালয় আছে। পড়াতে না পারি, পড়তে তো পারব।

তাপ্তির পয়সার যে অভাব নেই, সে কথা আমি আগেই জেনেছি। কাজেই তার কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু আমার মন বড় ভারাক্রান্ত হল। কেন জানি না, উত্তরপাড়ার ছোট ঘরখানির কথা আমার মনে পড়ল। নিতান্তই ছোট ঘর, আলো বাতাসের চেয়ে ধোঁয়া আসে বেশি, বেশি দম আটকায়। কিন্তু সে ঘর আমার খুব ছোট মনে হত না। যে বিরাট আকাশের নিচে অসংখ্য ঘর আছে, আমি তো সেই আকাশেরই নিচে আছি। যে বিপুল পৃথিবীর উপর অগণিত ঘর, আমিও তো সেই মাটিরই উপর আছি। আমার উপরে ও নিচে যখন অসীম বিস্তার, আমি কেন চারখানা দেওয়ালকে সত্য ভেবে সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেব। এই বৃন্দাবন বাগান তো উত্তরপাড়ারই মতো, কাবেরীও গঙ্গার মতো নদী। তাপ্তি আর স্বাতিতে কতটুকু তফাৎ। আর সেই ফরাসী যুবকটি। এখন আমার সামনে এলে তাকেও উত্তরপাড়ার লোক ভাবতে আমার কোন কষ্ট হবে না। নিজেকে ছড়িয়ে দিলে জগৎকে যে জড়িয়ে ধরতে পারব।

তারপর।

তারপর সব এলোমেলো হয়ে গেল। বিদ্যুতের মতো চমকে উঠেই তাপ্তি মিলিয়ে গেল। হঠাৎ আমি তাকে হারিয়ে ফেললুম।

উত্তেজনায় আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলুম। কিন্তু তাকে খুঁজতে যেতে হল না। খানিকটা দূরে একটা গাছের আড়ালে তাকে দেখতে পেয়েছি। সে ঐ বিশ্রী লোকটার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

খানিকটা এগিয়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। তাপ্তি যেন আগুনের শিখার মতো জ্বলছে। ভয়ে লোকটা পিছিয়ে গেছে। নিজেদের ভাষায় তাপ্তি তাকে কী বলল সেই জানে, আমি একটা ভীরু কাপুরুষকে দেখলুম মাথা হেঁট করে চলে যেতে। তাপ্তি ফিরে এল। পুরনো তাপ্তি। আগুনেব মতো নয়, প্রদীপের শিখার মতো মিষ্টি ও মধুর। আমার বিস্ময়ের যেন শেষ নেই।

আবার আমরা পুরনো জায়গায় ফিরে এলাম।

কী বলব ভেবে পাচ্ছিলুম না। তাপ্তি বলল: খুব অসভ্যতা করেছি, তাই না?

না না, অসভ্যতা কিসের!

আপনি বেশি ভদ্র। আজ সারাদিন আপনি ওকে লক্ষ্য করেন নি, কিন্তু আমি করেছি। ওব মনে কোন দুরভিসন্ধি ছিল। আজ ও আপনাকে খুঁজছিল। ওকে একটু সাবধান করে এলাম।

আমার কথা যেন সব ফুরিয়ে গেছে।

তাপ্তি বলল: এখানে এসে আমি হোটেলে উঠেছিলাম। খবর নিয়ে নিয়ে সেও এসে উঠল। ও জায়গাটা তেমন নিরাপদ নয় ভেবে আমি স্টেশনে চলে এলাম।

একটু থেমে বলল: ওকে আমি অনেক আগেই শেষ করে দিতে পারতাম। সে ইচ্ছাও একদিন খুব প্রবল হয়ে উঠেছিল। আমার স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুর ঠিক পরেব ঘটনা। আমাব কাছে এসেছিল সান্ত্বনা দিতে। সেই মুহূর্তে আমি তাকে খুনী বলে সন্দেহ করেছিলাম। হাতে অস্ত্র থাকলে তখনি হয়তো শেষ করে দিতাম। কিন্তু অস্ত্র খুঁজতে গিয়ে মত পালটে গেল।

পালটে গেল?

হ্যাঁ। ভাবলাম, তাতে অনেক কেলেঙ্কারী হবে। লোকে আমার স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে এই হত্যাকে যুক্ত করে অনেক মুখ-রোচক কাহিনী রচনার সুযোগ পাবে। শাস্তিকে আমি ভয় পাই নি, আমি ভয় পেয়েছিলাম আমার স্বামীর বদনামের। তিনি দেবতার মতো উদার ছিলেন। তাঁর অপবাদ হলে সে পাপ আমাকে ফাঁসির পরেও পীড়া দেবে।

তাপ্তি অনেকক্ষণ থেমে রইল। তারপর বলল : আজও তাই আমি তাকে সহ্য করি।

আমার মনে হল, আমি তার কোমরের অস্ত্রের রহস্য এতক্ষণে ভেদ করেছি। সে এই অস্ত্র রেখেছে আত্মরক্ষার জন্য। ভাল করে এই কথাটুকু জানবার জন্য বললুম : আপনি নিরস্ত্র থাকেন ?

তাপ্তি হাসল। কোমরে তার বাম হাতটা রেখে বলল : না। পৃথিবীতে আজকাল দিনে রাতে জানোয়ার চরে বেড়াচ্ছে। তাদের নানারকমের ক্ষুধা।

আমি উত্তর দিতে পারতুম, কিন্তু দিলুম না।

তাপ্তি অন্যমনস্ক ভাবে বলল : সম্মান সাবধানে রাখবার জিনিস। একবার হারালে তা চিরকালের মতো গেল। বিশেষ ভাবে মেয়েদের সম্মান।

আমাদের পাশ দিয়ে একখানা বড় বাস চলে গেল। এর আগেও একখানা এসেছিল। লোক বৃন্দাবন দেখতে আসছে। দিনের আলো নিবে আসছে। এবারে রাতের আলো জ্বলবে। দেখতে দেখতে সবকিছু স্বপ্নময় হয়ে উঠবে। সবাই সেই স্বপ্নের রাজ্যে হাবু-ডুবু খাবার জন্য একান্ত ভাবে অপেক্ষা করছে। আমি যে নিজেকে হারিয়ে ফেলছি, তা বুঝতে পারছিলুম। তাপ্তি আমাকে জাগিয়ে দিল, বলল : আপনার ঠিকানাটা দেবেন ?

চামড়ার থলি থেকে তার নোটবুক বার করে সে আমার উত্তরের অপেক্ষা করছে। আমি তাকে আমার উত্তরপাড়ার ঠিকানা দিলুম।

লিখে নিয়ে সে বলল ঃ যা বলতে পারলাম না, তা লিখে জানাব।

আমার রোমাঞ্চ হল। সেই সঙ্গে দুঃখও হল অপরিমিত। মনে হল, তাপ্তি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিচ্ছে। এ তার বিদায়ের পূর্বাভাষ। এই কদিনে আমরা এমন অন্তরঙ্গ হয়ে গেলুম! অন্তরঙ্গ হতে কি সময়ের প্রয়োজন নেই!

তাপ্তি বলল ঃ আর একটা কথা।

আমি নিঃশব্দে তার মুখের দিকে তাকালুম।

স্বাতি আপনাকে ভালবাসে। তাকে আপনি কোনদিন ভুল বুঝবেন না।

আমি চমকে উঠলুম ঃ কে বলল এ কথা?

স্বাতি নিজেই বলেছে।

তাপ্তির সুন্দর মুখে ভারি মিষ্টি হাসি।

ঠিক এই মুহূর্তে স্বাতি এল আমাদের কাছে। বলল ঃ দেখ কাকে ধরে নিয়ে এলাম!

সেই ফরাসী যুবক। বাসে চেপে সেও এসেছে বৃন্দাবন দেখতে। স্বাতিকে নাকি আমার কথা জিজ্ঞাসা করছিল। বললুম ঃ এবারে কোথায় যাবে?

যুবক তার পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে বলল ঃ মহাবল্লিপুরম।

সে তো মাদ্রাজ হয়ে যাবে।

ঠিক তাই।

তাপ্তি বলল ঃ ভালই হল। আমরা একসঙ্গে যাব। আপনি কি আজ রাতের গাড়িতেই যাবেন?

টিকিট কিনে এসেছি।

আমারও কেনা আছে।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। বললুম ঃ ও আজই যাবে।

তাপ্তি উঠে দাঁড়াল। বলল: আপনারা একটু বসুন। আমি অনুমতি নিয়ে আসি।

বলে স্বাতির হাত ধরে মামা মামীর দিকে এগিয়ে গেলেন।

বড় সঙ্কুচিত ভাবে ফরাসী যুবকটি বলল: আমি তো আপার ক্লাসে চড়ি নে। আমার রুপি বেশি নেই।

তাই বুঝি।

হ্যাঁ। আমার দেশ মাত্র পাঁচশো টাকা দিয়েছে।

বাস?

আর চুরি করে আমি আরও আড়াইশো টাকা এনেছি। এতেই আমাকে গোটা ভারতবর্ষটা দেখতে হবে।

আফসোস করে বললুম: যাতায়াতেই তো তোমার সব টাকা খরচ হয়ে যাবে।

না না, আমাকে তারা রিটার্ন টিকিট কিনে দিয়েছে। প্লেনের টিকিট। এ টাকা শুধু ভারতবর্ষে খরচের জন্য।

কঠিন কথা।

যুবকটি মেনে নিয়ে বলল: সেইজন্য আমি হোটেলে যাইনে। স্টেশনেই পড়ে থাকি। ডিনার খাইনে, পাঁউরুটি খেয়ে রাত কাটাই। এদেশের মসলা দেওয়া খাবার খেতে আমার খুব ভয় করে।

হেসে বললুম: এদেশ তোমার কেমন লাগছে?

খুব ভাল।

কী কী দেখলে বলবে না?

বম্বে থেকে শুরু করেছি। প্রথম অজন্তা আর ইলোরা।

কেমন দেখলে?

অপূর্ব।

তারপরে?

মহাত্মা গান্ধীর সেবাগ্রাম।

এখন আর কী দেখবার আছে ?

মহাত্মাজীকে যারা ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন, তাঁদের আমি দেখে এলাম। তাঁদের মুখেই মহাত্মাজীর কথা শুনলাম।

তারপর ?

তারপর হায়দ্রাবাদ। ভাল লাগল না।

কেন ?

ওদের একটা মিউজিয়ম দেখলাম। মিউজিয়ম কেন বলে জানি না। কোন পয়সাওয়ালা লোকের খেয়ালী সংগ্রহ। সুরুচির পরিচয় নয়। আমাদের ফুটপাথে যা বিক্রি হয়, তাও যত্ন করে রাখা হয়েছে।

যখন দেখব, তোমার মতামত আমি মিলিয়ে নেব। তারপর ?

বেলুর হালেবিদ শ্রবণবেলগোলা মাইসোর। অদ্ভুত ভাল লেগেছে।

হঠাৎ লক্ষ্য করলুম যে স্থানে স্থানে বাতি জ্বলে উঠেছে। লাল নীল সবুজ হলদে নানা রঙের বাতি। ফোয়ারাগুলো আর সাদা দেখাচ্ছে না, নানা রঙে বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে। যুবকটির সঙ্গে আমিও উঠে দাঁড়ালুম।

ধীরে ধীরে অন্ধকার ঘনাবে, আর এই রঙীন আলো হবে উজ্জ্বলতর। সামনে নদীর উপর পরপারের বাগানেও সব রঙীন হয়ে উঠেছে। আশে-পাশে চারিধারে সর্বত্র রঙের খেলা।

পথের উপর পদধ্বনি শুনলুম। স্বাতি ও তৃপ্তি আসছে, পিছনে মামা মামা। কাছে এসে মামা বললেন: তৃপ্তির কাণ্ড শুনেছ গোপাল ?

না তো !

তার খরচ দিতে চাইছে। মেয়ের বন্ধু তো নিজেরই মেয়ের মতন, মেয়ের কাছে বাপে খরচ নেয় ! তৃপ্তি এ কথা বুঝছে না।

বলে অকারণেই হেসে উঠলেন।

মামার এই পরিচয় আমি জানি। এই মেয়েটা চলে গেলে অনেকক্ষণ তাঁর মন আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাইপ ধরাবেন। কথাটা আমি তাপ্তিকে বুঝিয়ে দিলুম।

বৃন্দাবনের দৃশ্য মামা মামীর ভাল লেগেছে, স্বাতিরও। ফরাসী যুবককে আমি বললুম : তোমাব কেমন লাগছে ?

সংক্ষেপে সে বলল : ছেলেমানুষী।

আমারও তাতে সন্দেহ নেই। তবু তো ভাল লাগে।

এবারে সে বিদায় নিতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। তাকে ট্রেন ধরতে হবে। তাপ্তি বলল : আমিও এঁর সঙ্গে যাই। একটু গোছগাছ করে নিতে হবে।

মামা বললেন : সেকি, আমরাও তো এখুনি ফিরব।

তাপ্তি অনুরোধে আর্দ্র হল, বলল : আপনারা আর একটু বসুন, আমি আগে যাই।

বলে ফরাসী যুবকটির সঙ্গে বাসের দিকে এগিয়ে গেল।

মামা বললেন : তুমি কি ওকে কিছু বলেছিলে ?

কী সম্বন্ধে ?

ওর চলে যাবার ব্যাপারে ?

ও নিজেই চলে গেল।

মামা কী ভাবলেন তিনিই জানেন। আমি শুধু একটি দীর্ঘশ্বাসের শব্দ পেলুম।

মামী বললেন : স্বাতি কোথায় গেল ?

সত্যিই তো, স্বাতিকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি নে। অন্ধকারে দেখা সম্ভবও নয়।

সে কি তাপ্তিকে পৌছতে গেল !

বললুম : দেখে আসি।

মামা বললেন ঃ আমরা এই বেঞ্চিতে বসছি, আমাদের আবার হারিয়ে ফেলো না।

আমি স্বাতির খোঁজে গেলুম। কিন্তু তাকে বাসের কাছে দেখতে পেলুম না। তাপ্তি সেই ফরাসী যুবকের পাশে উঠে বসেছে। দূর থেকে দেখে আমি বিদায় নিলুম।

ফেরার পথে সন্দেহ হল, স্বাতিকে পাব নদীর ধারে। আমাকে তার নিরিবিলিতে হয়তো দরকার আছে। তাই এই ছল। রাস্তা ছেড়ে আমি নদীর ধারে এলুম।

অন্ধকার এখন গভীর হয়েছে। দূরের মানুষ এখন আর চেনা যাচ্ছে না। কিন্তু তবু আমি স্বাতিকে চিনতে পারলুম। রেলিঙ ধরে নদীর দিকে চেয়ে আছে। ভঙ্গিটি বড় চেনা চেনা। নিঃশব্দে আমি তার পাশে এসে দাঁড়ালুম। বোধহয় বুঝতে পেরেও স্বাতি কোন কথা কইল না।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে বললুম ঃ কী দেখছ?

কিছু না।

তবে?

ভাবছি।

আমার কথা?

না।

তোমার কথা?

তাও না।

তবে নিশ্চয়ই তাপ্তির কথা ভাবছ।

স্বাতি বলল ঃ অসঙ্কোচে সে একটা বিদেশী লোকের সঙ্গে চলে গেল!

তাতে কী হয়েছে?

ভয় করল না!

ভয় কিসের!

মেয়েদের ভয়ের কথা কি তুমি জান না ?

ও তো শিল্পী ছেলে, ওর অনেক উঁচু নজর। নারীদেহে ওর লোভ থাকলে বিদেশে এত কষ্ট সইতে আসত না।

তা ঠিক।

গোঁ গোঁ শব্দ করে বড় বাসখানা বাগান থেকে বেরিয়ে গেল তাপ্তি চলে গেল। স্টেশনে ফিরে হয়তো দেখা হবে। না হতেও পারে। বললুম ঃ ফিরবে না ?

জল আর রঙে চারিদিকে ইন্দ্রজালের সৃষ্টি হয়েছে। মনে হল, স্বাতি নিজেকে হারিয়ে ফেলছে। অনেকক্ষণ পরে অন্যমনস্ক ভাবে বলল ঃ তাপ্তিকে তুমি ও কথা কেন বললে ?

কোন্ কথা ?

এরই মধ্যে ভুলে গেলে ?

আমি তো তাকে অনেক কথাই বলেছি।

আমার সম্বন্ধে।

তোমার সম্বন্ধে কি কিছু বলেছি ? কই, মনে পড়ছে না তো !

বলেছ বৈকি, আমাকে ভালবাস বলেছ।

আমি, আমি বলেছি এই কথা !

তাহলে সে কেন বলবে, তোমাকে যেন কোনদিন ভুল না বুঝি !

বিস্ময়ে আমার মুখে আর কোন কথা যোগাল না আমাকেও তো সে এই কথাই বলে গেছে। সে কি তবে স্বাতির কথা নয় !

তবু আমি হাসলুম, বললুম ঃ তাপ্তি ঐ রকম। অনেক কথাই সে বানিয়ে বলে।

কিন্তু স্বাতির বোধ হয় এ কথা বিশ্বাস হল না। সে বোধ হয় ভাবল, আমিই বানিয়ে বলছি। সে তাই ভাবুক। আমার তাতে কোন ক্ষতি হবে না। লাভ হবে কি কারও ?

বৃন্দাবনে স্বপ্নের ইন্দ্রজাল হৃদয়কে আচ্ছন্ন করছে।

২৩

বৃন্দাবন গার্ডেনে একটি বাঙালী পরিবারের সঙ্গে আলাপ হল। তাঁরা একটা হোটেলে উঠেছেন। হোটেলটি ভালই বললেন, খরচও বেশি নয়। স্টেশনে আমাদের তিন দিন থাকবার অধিকার। কাল সকালে সেই মেয়াদ পূর্ণ হবে

তাহলে আস্থন না আমাদের হোটেলে।

মামা বললেন : মাইসোরে আর নয়। আজই ফিরব কি না ভাবছি।

সে কি, তিন দিনেই সব দেখা হয়ে গেল ? এত খরচপত্র করে এত দূর এসে—

দেখবার আরও অনেক জায়গা আছে। সেখানেও দু'এক দিন কাটিয়ে যাব।

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে তাকালেন। মামার দৃষ্টিতেও আদেশ দেখলুম, সেই সব জায়গার নাম করবার। বললুম : হাম্পি বিজয়নগর কিষ্কিন্ধ্যা, বাদামি পট্টডকল আইহোলের গুহা, বিজাপুর বিদর গোলকুণ্ডা, ওরঙ্গল ঔরঙ্গাবাদ—

স্বাতি বলল : থাক থাক, আর বলতে হবে না।

ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে বললেন : এত সব দেখবার জায়গা !

তাঁর স্ত্রী তাঁকে রক্ষা করলেন : এমন ছুটোছুটি করে না বেড়িয়ে একটা জায়গাই আমরা ভাল করে দেখব।

ভদ্রলোক সমর্থন করে বললেন : ঠিক ঠিক। দেখব তো ভাল করেই দেখব।

তারপরেই প্রশ্ন করলেন : রাজবাড়িতে আলোর মালা দেখেছেন ?

না।

তবে তো কিছুই দেখেন নি দেখছি।

একটি ছোট মেয়ে বলল ঃ আজও জ্বলবে।

কে বলল ?

চেনাপ্পা।

চেনাপ্পা হোটেলের বেয়ারা। তার কাছে সব খাঁটি খবর। ফেরার পথে দেখে যেতে ভুলবেন না। রাত দশটার পরে তো গাড়ি, এখনও ঢের সময় আছে।

ভদ্রমহিলা বললেন ৷ আলো দিয়ে সাজানো রাজবাড়ির ছবিও কিনতে পাওয়া যায়। বাজার থেকে কিনে নেবেন।

স্বাতি তার ক্যামেরা দেখিয়ে বলল ঃ আমরাই তুলে নেব।

এখানকার ছবি নিয়েছেন ?

নিয়েছি।

কী সুন্দর বলুন। খরচ করে এত দূর আসা সার্থক হয়ে গেল।

স্বাতি হাসল।

রাজবাড়িতে আলোর মালা দেখে স্বাতি বলল ঃ কেমন লাগছে গোপালদা ?

উত্তরটাও নিজে দিল ঃ এমন সহজে যদি খুশী হতে পারতাম তো ভাবনা ছিল না।

আস্তে আস্তে বললুম ঃ মনটা বেয়াড়া কিনা!

বেয়াড়া নয়, বনেদী বল। বাইরের চটক দেখে ভেতরের মন ভবে না

মন্তব্যটা ভাল লাগল। নীতিটাও ভাল। কিন্তু সবার কি সব সময় মনে থাকে!

স্টেশনে ফিরে তাপ্পিকে আমরা দেখতে পেলুম না। বেয়ারা বলল ঃ এক সাহেবের সঙ্গে খেতে গেছে। জিনিসপত্র ঘরে আছে।

মামা বললেন : গাড়ি যদি রিজার্ভ পাওয়া যায়, চল আমরাও বেরিয়ে পড়ি।

মামী বললেন : পেটের ভাবনা বুঝি ফুরিয়ে গেছে ?

বললুম : মুখ হাত ধুয়ে আপনারা নিচে নামুন। আমি গাড়ির ব্যবস্থা করে রিফ্রেশমেণ্ট রুমে আসছি।

মামা পকেট থেকে অনেকগুলো টাকা বার করে বললেন : টিকিটের জন্য রাখ।

হাত পেতে টাকা নিতে আমার লজ্জা করে। হাত পাততে ঘৃণাই বোধ হয়। কিন্তু উপায় নেই। নিজের টাকা থাকলে নিশ্চয়ই নিতুম না। বললুম : সেকেন্দ্রাবাদের টিকিট কাটব তো ?

নির্বিকার ভাবে মামা বললেন : সে তুমি জান।

স্বাতি হেসে বলল : তোমার সেই লম্বা ফর্দটার গোড়াতেই তো সেকেন্দ্রাবাদ ছিল না, বোধ হয় কিষ্কিন্ধ্যা বলেছিলে।

কিষ্কিন্ধ্যায় নামবে নাকি ?

মামা বললেন : পূর্বজন্মের স্মৃতি বোধ হয় ভালই লাগবে।

আমি হেসে উঠেছিলুম। স্বাতি বলল : গোপালদাকে বললে তো !

মামা এ কথার উত্তর দিলেন না।

এখান থেকে ব্যাঙ্গালোর যাবার গাড়িতে ভিড় হয় না। একখানা পুরো কামরাই পাওয়া গেল। স্বাতি আমার সঙ্গে ছিল। তাদের সঙ্গে এক গাড়িতে যেতে সেই আমাকে বাধ্য করল। তাপ্তিদের সঙ্গেও দেখা হল। সে তার টিকিট বদলে নিয়েছে। সেই ফরাসী যুবকের সঙ্গে এক গাড়িতে যাবে। আমাকে একটু আড়ালে ডেকে বলল : আপনি ফ্রান্সে কখনও গেছেন ?

হেসে বললুম : ভাবছি আপনার পরে যাব।

আমার যাবার কথা কেন মনে এল ?

জায়গাটা ভাল বলে শুনেছি।

মেয়ে বলে নাকি সারাক্ষণ সতর্ক থাকতে হয় না।

ওটা সভ্যতার লক্ষণ।

যাবার আগে তাপ্তি বলল: আপনার সমর্থন পেয়ে ভাল লাগছে।

গাড়ি ছাড়বার অনেক আগেই আমরা গাড়িতে এসে উঠলুম। মামা আজ দুপুরে ঘুমিয়েছেন। এত তাড়াতাড়ি শুতে রাজী হলেন না। পাইপ ধরিয়ে আমাকে বললেন: তোমার কিষ্কিন্ধ্যাব গল্প বল।

স্বাতির মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, মামাব এই আদেশ সে বেশ উপভোগ করেছে। গল্প শুনতে তার ভাল লাগে কিনা সে কথা বলবে না, গল্প বললে সে নানান মন্তব্য করবে। স্কুলেব পড়া ইতিহাস আর রামায়ণ মহাভারতের গল্প শুনিয়ে আমাব সবজান্তা নাম হচ্ছে। এই সবজান্তা কথাটার ভিতর শ্রদ্ধার চেয়ে বিদ্রূপ আছে বেশি। তবু আমার শুনতে ভাল লাগে। দেশেব শিক্ষা কত হাল্কা হয়ে গেছে যে সামান্য জ্ঞানেব কথাও একটা মন্তব্যের বিষয় হয়েছে. খানিকটা বেদনাও বোধ করি। স্বাতি অনুবোধ জানাল: বল।

কিষ্কিন্ধ্যার কথা তিন জায়গায় পড়েছি। পুবাণে ইতিহাসে আব খববের কাগজে।

মামা আশ্চর্য হচ্ছিলেন। বললুম: কিষ্কিন্ধ্যার রাজা বালি আব সুগ্রীবের কথা পড়েছি রামায়ণে। তারপব সেই মাটির উপর হল বিজয়নগর রাজ্য। সে ইতিহাসের কথা। আজ বিজয়নগব নেই। কিন্তু সেইখানেই তুঙ্গভদ্রা বাঁধা পড়েছে। বিরাট পরিকল্পনা। খবরের কাগজে তার ছবি আর সংবাদ বেরিয়েছে।

আজ রাবণ বললে আমরা রাক্ষস বুঝি, আর বালি বললে বানর।

বাবণ আর বালির দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথাও মনে পড়ে। বালি সমুদ্রতীরে জপ তপ করছেন। পিছন থেকে রাবণ আসছেন আক্রমণ করতে। বালি বুঝতে পেরেও চুপ করে আছেন। কাছাকাছি আসতেই তাঁর লেজ লম্বা করে রাবণকে পেঁচিয়ে ধবলেন। তারপর সাত সমুদ্র তের নদীর জল। এ তো কাহিনী, এর পিছনে কি কোন সনাতন সত্য নেই!

বালি আজ বানর বলে চিহ্নিত। কিন্তু তিনি যে অপরাজেয় বীর ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। দানবভ্রাতা মায়াবী দুন্দুভি তাঁর হাতে শাস্তি পেয়েছে। পাতালে প্রবেশ কবেও পরিত্রাণ পায় নি। রাক্ষসরাজ বাবণ তাঁকে পিছন থেকে আক্রমণ কবতে আসেন। সুগ্রীব দ্বন্দ্বযুদ্ধে এগিয়েছিলেন বামের সাহসে। কিন্তু বাম সম্মুখ-সমবে না এসে আড়াল থেকে বাণ নিক্ষেপ করে বালিকে বধ কবেন। রামের জীবনে এত বড় কলঙ্ক বুঝি আর নেই।

রামায়ণে বালিবধের প্রসঙ্গ মনে আছে, কিন্তু বালির বিস্তৃত বিবরণের কথা মনে নেই। তার রাজ্যের সমৃদ্ধির কথা, তাঁর প্রজা শাসনের কথা, কোনখানে পড়েছি কিনা তাও স্মরণ নেই। কিষ্কিন্ধ্যার পরিসর কতদূর ছিল, আজ তা অজ্ঞাত। লঙ্কার সীমানাও আমরা হারিয়ে ফেলেছি। লঙ্কা যে সমুদ্রেব এপারে ছিল না, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যেতে পারে। সীমানা এপারে হলে অবাধে বামচন্দ্র সমুদ্রতীরে পৌঁছতে পারতেন না, পারতেন না সেতু-বন্ধ করতে। কিষ্কিন্ধ্যা থেকে বেবিয়ে রামেশ্বর পর্যন্ত রাম কোন বাধা পান নি, আমরাও পাই নি কোন নতুন বাজ্যেব নাম। তবে কি কিষ্কিন্ধ্যাব সীমানা ছিল সমুদ্রতীর পর্যন্ত! বিচিত্র নয়। বালির মতো পরাক্রান্ত রাজার বিস্তৃত রাজ্যই হয়তো ছিল।

বামচন্দ্র এই বালির সাহায্য পান নি। সীতার বিরহে মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন, তাই সুগ্রীবের সাহায্য প্রত্যাশায় বালিকে হত্যা কবেছিলেন। বালি বেঁচে থাকলে লঙ্কার যুদ্ধ বোধ হয় হত না।

তিনি একাই সবাইকে সায়েস্তা করতে পারতেন। সীতাকে ফিরিয়ে দিতে রাবণ বাধ্য হতেন। রামায়ণ অন্য রকম হত।

মামা বললেন: এসব কিছুই আর মনে নেই। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডও ভুলে গেছি! সে কি আজকের পড়া!

দক্ষিণ ভারতের তীর্থ প্রসঙ্গে আমি কিষ্কিন্ধ্যার বৃত্তান্ত পড়েছি। ব্যাঙ্গালোর থেকে সেকেন্দ্রাবাদের পথে গুণ্টাকল বড় জংসন স্টেশন। সেখান থেকে ছোট লাইন গেছে পশ্চিমে হুব্‌লির পথে। হস্পেট একটা স্টেশন। তারই কাছে হাম্পি গ্রাম। লোকে সেখানে বিজয়নগরের ধ্বংসস্তূপ দেখে, আর দেখে প্রাচীন কিষ্কিন্ধ্যা। তুঙ্গভদ্রার উভয় তীরে সত্যযুগের নানা নিদর্শন এখনও ছড়িয়ে আছে। ঋষ্যমূক্ পর্বত, অঞ্জনা পাহাড়, পম্পা নদী ও সরোবর, মতঙ্গ ঋষির তপস্যাস্থল, আরও সব পবিত্র স্থান। লোকে আজকাল তুঙ্গভদ্রার বিরাট বাঁধও দেখে।

মামী এতক্ষণ কোন কথা বলেন নি, এবারে বললেন: এসব বুঝি আমাদের দেখাবে না?

মামা আমার মুখের দিকে তাকালেন।

বললম: একটু কষ্ট স্বীকার করতে হবে। একেবারে আকাট গ্রাম। একটা রেস্ট হাউস আছে শুনেছি, সেখানে জায়গা না পেলেই বিপদ। তারপর গরুর গাড়ি, নৌকোয় নদী পার।

মামা ভয় পেলেন, বললেন: বল কি গোপাল!

এ সব অবশ্য আমার পড়া কথা, পুরনো আমলের বইএ। নতুন কিছু সুবিধে সুযোগ হয়েছে কিনা, গেলেই দেখতে পাওয়া যাবে।

স্বাতি বলল: অভিজ্ঞতাটা মন্দ হবে না।

মামী বললেন: আগে থেকে খবর নেওয়া যায় না?

মামা বললেন: মহাবীরের ভক্ত তো নই, না হয় নাই গেলে।

এ তাঁর দুর্ভাবনার কথা। হস্পেটের মতো ছোট স্টেশনে রাত কাটানো সম্ভব নয়, গরুর গাড়িতে ওঠাও চলবে না। তারপর পেটের

সমস্যা। খাদ্য এমনই প্রয়োজনীয় জিনিস যে তার অভাবের আশঙ্কাই পীড়াদায়ক। না গেলে যখন কোন দুর্ভাবনা নেই, তখন যাবার অত তাগিদ কিসের!

স্বাতি বলল: আমাদের ভ্রমণটা বড় পান্‌সে মনে হচ্ছে। সব জায়গায় গাড়ি রিজার্ভ পাচ্ছি, থাকবার জায়গা পাচ্ছি, নিশ্চিন্তে খেতে পাচ্ছি চার বেলা। বেড়ানোর মজা তেমন জমছে না।

হেসে বললুম: তোমার ভ্রমণ কাহিনীও তেমন জমবে না। লোকে বলবে বানানো গল্প।

তার ভ্রমণ কাহিনী লেখার বাসনা মামা আমাদের শুনিয়েছিলেন। আমি তাই তামাসা করবার সুযোগ পেলুম।

স্বাতি বলল: ঠাট্টা নয়। বেড়াতে বেরিয়ে কত লোকের কত দুর্ভোগ হয়। কারও জায়গার অভাবে রাত জাগতে হয় গাড়িতে, ঘুমতে হয় ধর্মশালার বারান্দায়, কোনদিন খাবার হয়তো জুটলই না। তারপর মোটর বেগড়ানো, পথ ভুলে ঘুরে মরা, চুরি হাঙ্গামা হুজ্জৎ।

মামী বললেন: বলিহারি শখ!

মামা বললেন: কথাটা স্বাতি মন্দ বলে নি। সব কিছুই রুটিন মাফিক হলে বাড়ির বাহিরে বেরিয়েছি মনে হয় না। একটু ব্যতিক্রম দরকার।

বললুম: এখনও অনেক পথ বাকি আছে।

মামী বললেন: দোহাই তোমাদের, বিপদ আর সাধ করে ডেকো না।

তাপ্তির কথা আমার মনে পড়ল। বিপদ সে সাধ করেই বরণ করছে। তার পিতার গৃহে সে নিরাপদ ছিল। সেখানে কেউ তাকে বিপন্ন করতে পারত না। নিজের ইচ্ছায় ঘর থেকে বেরিয়ে সে বিপদের মুখোমুখী দাঁড়াতে চাইছে। আমার মনে হয়, দেশ ছেড়ে চলে যেতেও সে দ্বিধা করবে না। হয়তো সে ঐ ফরাসী

যুবকের সঙ্গে তারই দেশে গিয়ে পৌঁছবে। তার ভিতর আমি আগুনের শিখা দেখেছি। সে আগুন পোড়াবার আগুন নয়, সে আগুন আলোর সঙ্কেত। মাদ্রাজে গিয়ে সে যদি পাসপোর্ট সংগ্রহ করে, সে কথা শুনে আমি আশ্চর্য হব না। একই দিনে একই প্লেনে যদি তারা দুজনেই ফ্রান্সে চলে যায়, তাহলেও আমি চমকে উঠব না। তার স্বাধীন মুক্ত জীবনের তৃষ্ণা আমি দেখতে পেয়েছি, দেখতে পেয়েছি তার নারীজীবনের প্রতি শ্রদ্ধা। এরই জন্য তাপ্তিকে আমার ভাল লেগেছে।

গাড়ি ছাড়তে আর বেশি দেরি নেই। ইচ্ছে হল, একবার তাদের দেখে আসি। তারপরেই সেই বিশ্রী লোকটার কথা মনে পড়ল। জানি না এখন সে কী করছে! আমার অন্বেষণ, না তাপ্তির অনুসরণ। কিছু যে একটা করছে তাতে সন্দেহ নেই।

স্বাতি বলল: কী ভাবছ?

বললুম: নানা কথা।

বুঝি বলা যায় না?

এলোমেলো কথা বলতে নেই। লোকে পাগল ভাবে।

না বললেও ভাবে।

লোকের ভাবনার ওপর হাত থাকলে ভাবতে দিতুম না।

স্বাতি হেসে বলল: বড় সুবিধে হত তাতে, না?

মামাও হাসলেন।

গাড়ি বুঝি দুলে উঠল।

২৪

ব্যাঙ্গালোরে পৌঁছেই তাপ্তিরা মাদ্রাজের ট্রেন ধরল, আমাদের ট্রেন আরও ঘণ্টা তিনেক পরে। ইচ্ছে করলে খানিকটা ঘুরে আসাও যায়। অন্তত স্বাতির তাই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মামা রাজী হলেন না। বললেনঃ তার চেয়ে তুমি কিষ্কিন্ধ্যার খবর জোগাড় কর। আমরা এই ওয়েটিং রুমে খানিক অপেক্ষা করি।

আমার দিকে তাকিয়ে স্বাতি বলল ঃ ভয় পেলে নাকি ?

ভয় পাওয়া উচিত কিনা ভাবছি।

স্বীকার করলে তোমার ক্ষতি হত না, আমি সঙ্গে যেতে পারি।

হেসে বললুম ঃ তাহলে আমার একটুও ভয় করবে না।

মামা হেসে উঠলেন। কিন্তু মামী দেখলুম গম্ভীর হয়ে রইলেন।

দরজার বাহিরে এসে বললুম ঃ মামীমা পছন্দ করেন না এমন কাজ কেন কর ?

পরম কৌতুকে স্বাতি বলল ঃ কেন পছন্দ করেন না বলতে পার ?

বোধ হয় তোমার ওপর ভরসা পান না।

আমার নয়, তোমার ওপর। তুমি যে মানুষটি সুবিধের নও, তা টের পেয়ে গেছেন।

তুমি বলেছ বুঝি ?

তুমি নিজেই তো প্রকাশ করে ফেল। বললেই তো পারতে যে তুমি ভয় পাও না, একাই খোঁজ খবর নিতে পারবে।

তা বললে তুমি বেরতে কী করে ?

বেরতে আমার বয়েই গেছে।

আমি নিশ্চয়ই জানি যে মনের হাসি চেপে রেখেছিলুম। কিন্তু স্বাতি তবু বলল ঃ হাসছ যে !

হেসেছি বুঝি ?

হাসছই তো।

প্রতিবাদ করে লাভ নেই, তাই বললুম : তোমার কাণ্ড দেখে। তুমি তো যেচে আমার সঙ্গে এলে। নিজের প্রয়োজন অস্বীকার করে আমার প্রয়োজন বলছ। সে একই কথা।

কেন ?

কান্তি নাথের দরকারে তুমি যেতে ?

না।

রামখেলাওনের দরকারে ?

তাহলে তো আমাকে একাই যেতে হত।

আর আমার বেলায় সঙ্গে আসতে হল !

স্বাতি ভ্রূকুটি করল। বললুম : হেরে গেলে।

এবারে স্বাতিও হাসল। সলজ্জ স্মিত হাসি। এই হাসি দেখবার আমার লোভ বেড়েছে।

খবর সংগ্রহ করা যে কত শক্ত কাজ স্বাতি তা সহজেই স্বীকার করল। শুধু একটু মন্তব্য করল : এ কাজে তোমাকে পাকা বলে জানতাম।

আত্মাভিমানে আঘাত লাগবার মতো কথা। তাই মুখ দিয়ে উত্তরটা বেরিয়ে গেল : ট্রেনে এ কাজ সোজা, স্টেশনে কঠিন।

কেন ?

ঐ পথে যারা যাচ্ছে, তাদের কেউ না কেউ পুরনো যাত্রী, স্থানীয় লোকও অনেক সময় পাওয়া যায়। শুধু চিনে বার করার অভিজ্ঞতা চাই।

এখানে তো বেশি যাত্রী !

কিন্তু কে কোন দিকে যাচ্ছে জানা নেই। আমাদের সঙ্গে যারা যাবে, তারা ট্রেনের সময়েই আসবে।

স্বাতি এ কথা মেনে নিতেই বললুম : হার মানলে চলবে না।

চল ঐ এনকোয়ারি অফিসে। আমি পেছনে থাকব, তুমি কথা কইবে।

কেন?

এসব কথার উত্তর দেওয়া হয়তো ওদের দায়িত্ব নয়। আমাকে এড়িয়ে যাবে।

স্বাতি বলল: বুঝেছি। মেয়েদের সম্মান যে বেশি তা তুমি স্বীকার করলে।

আমি কেন, সে তো দুনিয়ার সব লোকই সাবাস্ত করে।

স্বাতির বিশ্বাস হল না, বলল: তোমার মুখে একথা ঠাট্টার মতো শোনাচ্ছে।

তাও মিথ্যে নয়। মেয়েদের দিকে তাকিয়ে আবার অন্য কথা ভাবি। একটা না একটা পুরুষকে তারা দেবতার মতো সম্মান করে। নিজের সম্মান তার পায়ে লুটিয়ে দিয়েও নিজেকে কৃতার্থ ভাবে।

ও তোমার ধারণা।

আমি তো নিজের ধারণার কথাই বলব।

বলে স্বাতিকে এগিয়ে দিলুম। এনকোয়ারির ভদ্রলোকের সঙ্গে স্বাতি কথা বলবে।

যে ভদ্রলোক সামনে বসেছেন তিনি চোখ তুললেন না, দূরের ভদ্রলোক কলম তুলে চেয়ে রইলেন। যিনি চোখ নামিয়ে আছেন, তিনি কোন কাজ করছেন বলে দেখতে পেলুম না। বরং চোখ বুজে আছেন বলেই মনে হল। অন্য সবাই দেখেও দেখছেন না, শুনেও শুনছেন না। পিছন থেকে আমি বললুম: এই হল আধুনিক সরকারি নীতি। যার কাজ তিনি চোখ বুজে থাকেন, অন্যরা মজা দেখেন।

স্বাতি আমার দিকে ফিরে তাকাতে বললুম: সেদিন কাগজে দেখনি বুঝি! চোর চুরি করছে, আর পুলিশ দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। প্রশ্ন করে জানা গেল যে ঐ চুরি হচ্ছে তার আওতার বাইরে। যার

দেখবার কথা সে কোথায়? উত্তর হল, জানি নে। এই নীতি মেনে চললে সরকারের কাছে সুনাম অনিবার্য।

স্বাতি বিরক্ত হল। বলল: তোমার বক্তৃতা রাখো।

কথাটা বোধহয় স্বাতি জোরেই বলেছিল। ভদ্রলোক মুখ তুলে তাকালেন।

স্বাতি বলল: কিষ্কিন্ধ্যা সম্বন্ধে কোন খবর দিতে পারেন?

না।

বিজয়নগর সম্বন্ধে?

বিজয়নগরম?

আমি এগিয়ে এসে বললুম: হাম্পি রুইন্স্।

স্টেশনের নাম বলুন।

স্বাতি বলল: ধন্যবাদ। এস গোপালদা, আমরা নিজেরাই চেষ্টা করি।

প্ল্যাটফর্মে আমরা বই-এর দোকানে এলুম। গাইড-বই চাই। যা পাওয়া গেল তা স্বাতির আছে। তাতে নাকি হাম্পির উল্লেখ আছে, বর্ণনাও আছে। ছবিও যে দু'একখানা নেই তা নয়। কিন্তু তাতে প্রয়োজনীয় নির্দেশের অভাব। স্বাতি বলল: এসবের গাইড নাম কেন হল বুঝি নে।

কী করবে তাহলে?

বাবাকে জিজ্ঞাসা কর।

মামা বোধহয় তাঁর কর্তব্য স্থির করেই ছিলেন, বললেন: সেকেন্দ্রাবাদের টিকিট কাট। রাত কাটাতে হলে রিজার্ভ করে নিও।

তথাস্তু। ব্যবস্থা করে ফিরে আসতে আমার সময় লাগল না।

মামা বললেন: তুমি পার না এমন কাজও তাহলে আছে দেখছি।

অহঙ্কার থাকা উচিত নয়, তবু এ কথা মেনে নিতে ইচ্ছে হল না। বললুম: আপনি কি কিষ্কিন্ধ্যা যাবার কথা বলছেন?

মামার ঠোঁটে পাইপ ছিল, শুধু মাথা নাড়লেন।

বললুম : গুণ্টাকল জংসনে গাড়ি বদল করে মাত্র সাড়ে তিন ঘণ্টার রাস্তা হস্পেট। একটা নয়, তিনটে রেস্ট হাউস সেখানে। একটা স্টেশনের মাইল খানেকের মধ্যে, দ্বিতীয়টি একেবারে তুঙ্গভদ্রার বাঁধের ওপর, আর তৃতীয়টা কমলপুরমে। শেষেরটায় খানসামাও আছে।

স্বাতির দৃষ্টিতে আমি বিস্ময় দেখলুম।

বললুম : থাকবার যখন অতগুলো জায়গা আছে, তখন কি আর গাড়ি ঘোড়া নেই! দুর্গা বলে রওনা হয়ে গেলে ব্যবস্থা একটা হয়েই যাবে।

স্বাতি বলল : সব তৈরি কথা।

বললুম : যে বইগুলো নাড়াচাড়া করলে তারই শেষ দিকে লেখা ছিল।

স্বাতির এ কথা বিশ্বাস হল না। মামা বললেন : না বলে ভালই করেছ। মাঠে-ঘাটে অনেক ঘুরেছি। এবারে বাড়ি চল।

সমর্থন করে মামী বললেন : ঘোরাঘুরি আর ভাল লাগছে না।

স্বাতি বলল : বেড়াতেই তো আনন্দ।

মামা মামী না থাকলে বলতুম, মনের মতো একটি সঙ্গীও চাই। সঙ্গিহীন ভ্রমণ হয়তো প্রাণহীন জীবনের মতো, শাস্তির মতো। অভাবের উপলব্ধি না থাকলে পাবার আনন্দ আমরা বুঝি না।

মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে মামা বললেন : গোপাল কিছু বল।

মামাকে আমি চিনে ফেলেছি। তাঁর দেখবার ও জানবার বাসনা কারও চেয়ে কম নয়। শরীরটা আয়েসী বলেই শ্রমের নামে ভয় পান। অথচ জানবার ইচ্ছা থাকে জমে। তাইতেই জিজ্ঞাসা করেন। যা দেখা হল না, শুনে তার যতটা জানা যায় তারই চেষ্টা। বললুম : কী বলব বলুন।

কী বলবে তা কি আমি বলে দেব!

স্বাতি বলল : বিজয়নগরের গল্প বল।

সে গল্প অবিশ্বাস্য মনে হবে। সত্যিই অবিশ্বাস্য। একজন মন্ত্রী

এই রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। শঙ্করাচার্যের শৃঙ্গেরী মঠের আচার্য ব্রাহ্মণ মাধব বিদ্যারণ্য। তাঁরই চেষ্টায় তাঁরই বুদ্ধিকৌশলে এই ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য মহিমান্বিত সাম্রাজ্যে পরিণত হল। তার আড়াইশো বছর পর আর এক মন্ত্রীব উদ্ধত অহংকারের জন্য এই শক্তিশালী রাজ্য ধূলিসাৎ হয়ে গেল। বিজয়নগর আজ ইতিহাসের মহাশ্মশান। এর জন্য দায়ী রাজা সদাশিব রায়ের মন্ত্রী রাম রাজা।

স্বাতি বলল: জমিয়ে ফেলেছ। এবারে আস্তে আস্তে গল্পটা বল।

বললুম: গল্পের মাঝখানটা ভাল লাগবে না। একেবারেই ইতিহাস। কার পর কোন্ রাজা, লড়াই করেছিলেন কার সঙ্গে, জিতলেন না সন্ধি করলেন, নতুন রাজ্য হাতে এল না পিছিয়ে এলেন—এর মধ্যে গল্পের রস নেই। তোমাব কাছে নীরসই লাগবে। যা নীরস লাগবে না, তেমন জিনিসই বলব।

ঘবেব কোণেব দিকে একখানা আরাম চৌকিতে মামী চোখ বুজে শুয়েছিলেন।

মামা বললেন: আর এক রাউণ্ড চায়ের সঙ্গে গল্পটা জমত ভাল।

বললুম: তাহলে রিফ্রেশমেণ্ট রুমে যেতে হবে।

কেন?

ওরা মেয়েদের ওয়েটিং রুমে চা দেবে, এখানে দেবে না।

ভারি আবদার তো!

বলে মামা পাইপটাকেই একটু ঝেড়ে-ঝুড়ে নিলেন। বুঝতে পারলুম, তাঁর উঠবার ইচ্ছা নেই।

স্বাতি স্মরণ করিয়ে দিল: তুমি মাধব বিদ্যারণ্যের কথা বলছিলে।

মাধব বিদ্যারণ্য দরিদ্র পণ্ডিত ছিলেন। ঐশ্বর্য লাভের প্রত্যাশায় তপস্যা করতে এসেছিলেন হাম্পির ভুবনেশ্বরী মন্দিরে। দেবী স্বপ্নাদেশ করলেন, এ জন্মে নয়, আশা সফল হবে পরজন্মে। মাধব

বিত্যারণ্য আর মুহূর্ত বিলম্ব করলেন না। শৃঙ্গেরী মঠে গিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। কিন্তু সেখানে তাঁর মন টিকল না। তাঁর কানে অন্য কোন কর্তব্যের ডাক পৌছয়। মাধব ফিরে এসে ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে আবার হত্যা দেন, আদেশ কর, কী করতে হবে বল। উত্তর দিল দেবীর চিন্ময়ী মূর্তি, ভারতে আজ হিন্দুর ধর্ম বড় বিব্রত, হিন্দু-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কর। মাধব বললেন, আমি যে সন্ন্যাসী। দেবী বললেন, তোমার পুনর্জন্ম হয়েছে। মাধব বিত্যারণ্য বিত্যানগর প্রতিষ্ঠা করলেন। বিত্যানগরেরই নাম হল বিজয়নগর।

বিজয়নগরের একটা ইতিহাস আছে। এখানে তা ভাল লাগবে না। সঙ্গম নামে এক ক্ষত্রিয়ের ছুই পুত্র হরিহর ও বুক্ক হয়শালরাজ তৃতীয় বীর বল্লালের সাহায্য পেয়েছিলেন। বছর দশেক পর হয়শাল বংশ লোপ পেল। মাথা নাড়া দিয়ে উঠল বিত্যানগরের সঙ্গম বংশ। অন্য দিকে বাহমনী বংশের প্রতিষ্ঠা। সে আর এক ইতিহাস। কৃষ্ণার উত্তরে বেরার পর্যন্ত বাহমনীর অধিকার, তার রাজধানী গুলবর্গায়। কৃষ্ণার দক্ষিণে কাবেরী পর্যন্ত বিজয়নগরের। শুধু রায়চুর দোয়াবের অধিকার নিয়ে বুক্কর সময়েই যে বিবাদ সৃষ্টি হল, বাহমনীর দেড়শো বছরের রাজত্বকালে তার অবসান হল না। সঙ্গম বংশে একে একে অনেক রাজা হলেন—হরিহর, প্রথম ও দ্বিতীয় দেবরায়, আরও অনেকে। অনেক ষড়যন্ত্র ও অনেক হত্যার পরে ক্ষণস্থায়ী শালুব বংশের প্রতিষ্ঠা হল। তারপর এল তুলুব বংশ। বীর নরসিংহ, কৃষ্ণদেব রায়, অচ্যুত রায়, সদাশিব রায়। এই সদাশিব রায়ের আমলেই বিজয়নগর ধ্বংস হয়ে গেল।

এই বিপর্যয়ের জন্য মন্ত্রী রাম রাজাকেই দায়ী করতে হয়। রাম রাজার ক্ষমতার চেয়ে আত্মবিশ্বাস ছিল বেশি। তাতেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু শক্তির গর্বে শত্রুকে তিনি হীনবল ভাবতেন। তাচ্ছিল্য করতেন প্রতিবেশী সুলতানদের। এ রাজনীতি নয়। কূটনীতির নির্দেশ অন্যরকম। প্রতিবেশী শক্তি তিনটি থাকলে ছুটি হাতের

মুঠোয়, একটি শূন্যে। দুজন মিত্র, শত্রু একজন। তবেই কোন বিপদের আশঙ্কা থাকবে না। শত্রুর শক্তির পরিমাণ করতে গেলে তার একার শক্তির পরিমাপ করতে নেই। তার মিত্ররাও যেমন শত্রু পক্ষে, তেমনি নিজের অন্যান্য শত্রুরাও সেই দলে। যারা শত্রুও নয় মিত্রও নয় তাদেরও শত্রুপক্ষে ধরে রাখা ভাল।

স্বাতি হেসে বলল ঃ তুমি কি আমাদের রাজনীতি শেখাচ্ছ?

বললুম ঃ রাম রাজাকে শেখাতে পারলে খুশী হতুম। বিজয়নগর বেঁচে থাকলে ভারতের ইতিহাস আজ অন্যরকম হত।

মামা বললেন ঃ রাম রাজার কী হল?

বললুম ঃ একদা যে রাজ্যের দুঃসাহসী শক্তিমান রাজা কৃষ্ণদেব রায় শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করে দেশের শক্তিবৃদ্ধি করেছেন, পরে সেই রাজ্যেরই মন্ত্রী দেশের অর্থব্যয় করে শত্রুসৃষ্টি করেছেন। শুধু রাজার নয় মন্ত্রীরও বিলাস ব্যসনে রাজকোষ শূন্য হয়েছে।

একদিন প্রতিবেশী সমস্ত সুলতানেরা সংঘবদ্ধ হল—বিদর বিজাপুর গোলকুণ্ডা আহমদনগর। তালিকোটের মাঠে যুদ্ধ বাধল ১৪৬৫ সালের ২৩শে ডিসেম্বর। আশীবছরের বৃদ্ধ রাম রাজা যুদ্ধ পরিচালনা করলেন।

স্বাতি বাধা দিল, বলল ঃ রাজ্যের বুড়ো মন্ত্রী যুদ্ধ করতে গেলেন, সেনাপতির কী হল?

রাম রাজার দুজন জোয়ান ভাই ভেঙ্কটাদ্রি আর তিম্মরাজও যুদ্ধ করেছিলেন। ভেঙ্কটাদ্রিই হয়তো সেনাপতি ছিলেন।

গম্ভীর ভাবে স্বাতি বলল ঃ রামায়ণ মহাভারতের পর সেনাপতির কদর আর দেখা যায় না। রাজা নিজেই সে যুগে সেনাপতি হয়ে লড়তেন।

আর সেনাপতিরাই সুযোগ পেয়ে রাজা হয়ে বসতেন।

মামা বললেন ঃ যেমন?

এই বিজয়নগরেরই ব্যাপার দেখুন। প্রথম রাজা বুক্ক ও হরিহর

ওরঙ্গলের রাজার ছোটখাট সেনাপতি ছিলেন। তুলুব বংশের প্রথম রাজা বীর নরসিংহ ছিলেন রাজা নরসিংহ শালুবের সেনাপতিপুত্র। তালিকোটের যুদ্ধে হেরে না গেলে হয়তো ভেঙ্কটাদ্রিই বিজয়নগরের রাজা হয়ে বসতেন। হেরে গিয়েও রাজ্যস্থাপন করেছেন চন্দ্রগিরিতে। জোর যার মুলুক তার। মধ্যযুগে সত্যিই বসুন্ধরা বীরভোগ্যা ছিল।

মামী এতক্ষণ চোখ বুজে ছিলেন। এইবারে চোখ খুলে বললেন: আমাদের গাড়ির আর কত দেরি?

প্রশ্ন শুনে মামা যেন চমকে উঠলেন, বললেন: তাই তো, আমাদের যে গাড়ি ধরতে হবে।

হেসে বললুম: তার সময় আছে।

না না গোপাল, ও কাজের কথা নয়। গল্প না হয় গাড়িতে উঠেই করা যাবে। তুমি কুলি ডাক।

অগত্যা উঠতে হল।

স্বাতি বলল: বিজয়নগরে কী দেখবার আছে গাড়িতে বসে শুনব।

২৫

মামা ভাবতে পারেন নি যে আমি গিয়ে আবার তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠব। নিজের মঙ্গলের জন্য তাঁর বিরাগভাজন হবার দুঃসাহস আমি সঞ্চয় করেছি। শুধু আত্মমর্যাদার প্রশ্ন নয়, জ্ঞানার্জনের চেষ্টাও এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ভাবতে কষ্ট হয় যে মামা-মামীর পরিচর্যাব জন্য আমি বেরিয়েছি। দেখবাব ও জানবার সাধ তো আমারও আছে। সারাক্ষণ কথা বললে কি দেখা আর জানা হয়! নিজের মুখ বন্ধ না করলে চোখের ঠুলি সরে না, কানে যায় না প্রকৃতির নীরব সঙ্গীত। বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য মৌন হবার প্রয়োজন, চোখ বন্ধ করে হয় আত্মদর্শন। শ্রীঅরবিন্দ সপ্তাহে একদিন মৌন থাকতেন, হিমালয়েব দুর্গম গুহায় মৌন সন্ন্যাসীর সংখ্যা অগণিত। আমার বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজন ছিল অন্যের কাছে কিছু শোনবার। তৃতীয় শ্রেণীর কামরা তার অনুকূল স্থান।

এই কামরা নির্বাচন একটা কঠিন ব্যাপার। যেখানে সেখানে উঠলেই চলবে না। এমন লোক সেখানে মেলা চাই যে ইংরেজী জানে, আর জানে বলাব মতো কথা। নিজে থেকেই বলতে ভালবাসে, এমন লোকের সন্ধান পাওয়া তো ভাগ্যের কথা। বাহির থেকে মুখ বাড়িয়ে আমি যাত্রীদের দেখছিলুম।

আমাকে রক্ষা করলেন স্টেশনের সেই বাবুটি। পিছন থেকে জিজ্ঞাসা করলেন : জায়গা খুঁজছেন ?

বললুম : সঙ্গী খুঁজছি।

সঙ্গী!

ভদ্রলোক বোধ হয় তাপ্তির কথা ভাবলেন। ব্যস্তভাবে এদিক সেদিকে চেয়ে বললেন : দেখছি না তো!

হেসে বললুম: পুরনো সঙ্গী নয়, এই গাড়িতেই নতুন সঙ্গ খুঁজছি। অনেকটা পথ যেতে হবে তো!

তা বটে।

ভদ্রলোক লজ্জিত হয়ে স্থির হলেন।

বললুম: এমন একজন সঙ্গীর দরকার যার কাছে পথের কথা আর মানুষের কথা শুনতে পাব।

একটু দাঁড়ান।

বলেই ভদ্রলোক অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

খানিকক্ষণ পরে আবার তাঁকে দেখতে পেলম। আব একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইতে কইতে এগিয়ে আসছেন। সৌম্যদর্শন চেহারা, পবনে খদ্দব, হাতে একটা চামড়াব স্যাচেল। কাছে এসেই বেলেব বাবুটি বললেন: আপনার ভাগ্য খুব ভাল। মিস্টার কৃষ্ণরাও এই গাড়িতে যাচ্ছেন। জর্নালিস্ট ইনি।

বললুম: সৌভাগ্য যে আমার একার তাতে সন্দেহ নেই। আমি কলকাতার কেরানী, আমার নাম গোপাল।

কৃষ্ণরাও-এর আচবণে কোন অবহেলাব লক্ষণ দেখলুম না। বললেন: মানুষের যে দুটো রূপ আছে, সে অতি পুবনো কথা। তার ঘরের ও বাহিরের রূপ, আলোর আর অন্ধকাবেব। আমি বলি তার পরিচয়ও দুটো। একটা সরকারী আব একটা ব্যক্তিগত। শৈশবের কথা মনে আছে?

উত্তর না দিয়ে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

কৃষ্ণরাও বললেন: স্কুলের হেডমাস্টারমশাই যখন বাবান্দা দিয়ে যেতেন, ভয়ে আমাদের বুক দুরদুর করত। সেই ভয়ে তাঁর বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে আমরা হাঁটতুম না। বেশি হাঁটতে হলেও ঘুরে যেতুম। একদিন সন্ধ্যাবেলায় বাবাব সঙ্গে যাচ্ছি। উপায় নেই, ও রাস্তায় যেতেই হবে। কিন্তু তাঁব বাড়ির সামনে গিয়ে চমকে গেলুম। হেডমাস্টারমশাই হাসছেন। ঠিক আমাদের মতো হাসি,

কটুও অন্যরকম নয়। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, চমকে উঠলি যে! য়ে ভয়ে বললুম, হেডমাস্টারমশাই যে হাসছেন!

রেলের বাবুটি বোধহয় এই গল্পের মানে বুঝতে পারেন নি। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে কৃষ্ণবাও বললেন: গোপালবাবু কেরাণী শুনে এই গল্পটি আমার মনে পড়ল। রেলে চাপতে যিনি সঙ্গী খোঁজেন, তাঁর আরও একটা পরিচয় নিশ্চয়ই আছে।

লজ্জিতভাবে বললুম: আপনি রসিক লোক, তাই এ কথা ভাবছেন। আলাপ হলে এই ধারণা আপনার পালটে যাবে।

অন্য কিছু প্রমাণও তো হতে পারে।

বলে কৃষ্ণবাও হাসলেন।

রেলের ভদ্রলোক খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন: শেয়ানায় শেয়ানায় কোলাকুলি। আমি তাহলে আসি।

কৃষ্ণরাও বললেন: দেখে দেখে শেয়ানাদেব আপনি চিনে বাব করছেন, আপনিই বা শেয়ানা কম কিসে!

লজ্জিতভাবে ভদ্রলোক বললেন: আপনাদেব জন্যে একটু জায়গা দেখব?

আমার জন্য দরকার নেই। আমি জনতা গাড়িতে উঠব।

আমিও একই গাড়িতে।

তবে এই পাশেরটিই ভাল হবে। পিছনেব দিকে বিপদেব ভয় কম।

আমরা পাশের গাড়িতেই উঠে পড়লুম।

পরিচয় হল। আমি তাঁর কাগজের নাম শুনলুম, তিনি আমাব অফিসের নাম জানলেন। আমবা বেড়াতে বেরিয়েছি, আব তিনি তার বোনের বাড়িতে যাচ্ছেন তুঙ্গভদ্রা ড্যাম সাইটে। ভগ্নীপতি চাকরি করতে এসেছেন, আর বোন অনেকদিন থেকে ডাকছে। দুদিনের ছুটি নিয়েই তিনি যাচ্ছেন। একটা প্রবন্ধ লিখে আর্থিক ক্ষতিটা পূরণ করবেন।

মনে মনে আমার অনেক বাসনা গুঞ্জরণ করে উঠেছে। কিন্তু কী করে শুরু করব ভেবে পাচ্ছিলুম না। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণরাও আমাকেই প্রশ্ন করে বসলেন বাঙলা দেশ সম্বন্ধে, এ দেশের মানুষে কী প্রভেদ দেখছি।

উত্তরে কিছু বলতেই হল, তুলনাটা এড়িয়ে গেলুম। সে চেষ্টা হাস্যকর হবে। দৌড়বার সময় পথের দৃশ্য যেমন চোখে পড়ে না, এই রকম ভ্রমণে তেমনি মানুষের পরিচয় থাকে অজ্ঞাত। সেই অজুহাত দেখিয়ে আমি বললুম: তার চেয়ে কানাড়ী সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলুন।

কৃষ্ণরাও যেন চমকে উঠলেন, বললেন: আমার সম্বন্ধে কোন কৌতূহল নেই তো?

এ কথা কেন বলছেন?

কানাড়ী সাহিত্যে কৃষ্ণরাও একটি স্মরণীয় নাম। আমি সে ব্যক্তি নই, আমার সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধও নেই।

হেসে বললুম: আপনার ভাবনা নেই। এক মাস্তি ছাড়া আর কোনও নাম আমি জানি নে।

মাস্তিকে জানেন?

ইংরেজীতে তাঁর ছোট গল্পের অনুবাদ পড়েছি।

পড়েছেন! কেমন লেগেছে আপনার?

কোনদিন সমালোচনা করতে হবে ভেবে আমি গল্প পড়িনি। এখন দেখছি, বিপদ আমি নিজে ডাকি। পড়িনি বললেই ভাল ছিল। এখন আর উপায় নেই, উত্তর একটা দিতেই হবে। বললুম: কয়েকটা মাত্র গল্প পড়েছি। যতদূর মনে পড়ছে, কোন চমক দেখি নি। নিতান্তই সাদাসিধে ঘরোয়া কথা। দুবেলা যা দেখছি শুনছি তাই। তবে পড়তে ভাল লেগেছিল।

কৃষ্ণরাও যে প্রসন্ন হলেন তা তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারলুম। বললেন: আশ্চর্য, আপনি তাঁর খাঁটি রূপটিই চিনতে পেরেছেন

দেখছি। তাঁর পুরো নাম মাস্তি ভেঙ্কটেশ আয়েঙ্গার। শুধু ছোট গল্পে নয়, কবি ও ঔপন্যাসিক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি আছে। বাঙলার মতো আমাদের সাহিত্যে দিকপাল নেই, কিন্তু মাস্তি সত্যিই জনপ্রিয় লেখক। জীবনে অন্তর্দৃষ্টি ও লেখায় আন্তরিকতার জন্যেই তিনি জনপ্রিয়।

কানাড়ী ভাষার অগ্রগতির ইতিহাসে দুটো অধ্যায় চিহ্নিত হয়ে আছে। হিন্দু সাম্রাজ্য বিজয়নগর ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রথম অধ্যায় শেষ হয়ে গেল। ছোট ছোট মুসলমান রাজ্য আর কিছু মারাঠী অধিকার। এই পরিবেশে কানাড়ী ভাষা প্রশ্রয় পেতে পারে না। সংস্কৃত ভাষার প্রাণ যেমন মুষ্টিমেয় পণ্ডিতের চেষ্টায় আজও কোনরকমে ধুক ধুক করছে, কানাড়ীও তেমনি জীবন্মৃত হয়েই বেঁচে রইল। সাধারণ্যে তার সমাদর গেল লুপ্ত হয়ে।

গত শতাব্দীর শেষভাগ থেকে কানাড়ী সাহিত্যের দ্বিতীয় অধ্যায়। মহিস্থরের মহারাজা আড়াইশো বছর ধরে এই ভাষার প্রসারের চেষ্টা করছেন। প্রচুর অর্থব্যয়ে প্রাচীন পুরাণগুলি প্রকাশ করেছেন। কয়েকটি মঠও কিছু ধর্মগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। সে আধুনিক সাহিত্যের জাগরণ নয়। এই কাজে প্রথম নামলেন কর্ণাটক বিদ্যাবর্ধক সংঘ। তাঁদের 'বাগ্‌ভূষণ' প্রথম সাহিত্য পত্র। কানাড়ী সাহিত্য একাডেমির প্রতিষ্ঠা হয় প্রথম মহাযুদ্ধের সময়। তখন থেকেই এই সাহিত্যে একটা গতি এসেছে।

গালাগানাথের 'মাধব করুণাবিলাস' প্রথম মৌলিক উপন্যাস, না কেরুর ইন্দিরা, তা জানা নেই। প্রথমটি ঐতিহাসিক, বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠার কথা। দ্বিতীয়টি সামাজিক। এর আগে বাঙলা ও মারাঠী উপন্যাসের অনুবাদ হয়েছে। অনুবাদ হয়েছে ইংরেজী ও সংস্কৃত কাদম্বরীর।

নামধাম বেশি করলে আলোচনা ভারাক্রান্ত হবে। আবার কয়েকটি নাম না করলে আলোচনা সম্পূর্ণ হবে না। তাঁদের একজন

হলেন শিবরাম করন্থ। খুবই জনপ্রিয় লেখক। আর একজন কৃষ্ণরাও। এঁর লেখায় অবাস্তবতা আছে, অশ্লীলতাও আছে। তবু এঁর নাম করতে হয়। গোকক, পুট্টাপ্পা, আন্নারাও—এঁদের নামও বাদ দেওয়া যায় না।

ছোট গল্পে মাস্তির পরেই নাম করতে হয় যোশী, কৃষ্ণকুমার, গরুর ও বেত্তিগেরীর। প্রেমের গল্প লিখে নাম করেছেন 'আনন্দ'।

খুব সম্প্রতি নাটক লেখা শুরু হয়েছে। কৈলাসম কর্ণাটকের ইবসেন নামে পরিচিত হচ্ছিলেন। অকালে তিনি মারা গেছেন। একালের ঔপন্যাসিকরা সকলেই কিছু কিছু নাটক লিখেছেন। তার মধ্যে শ্রীরঙ্গমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁর আসল নাম জাগীরদার। ইনি লেখেন নি এমন বিষয় নেই।

কৃষ্ণরাও থামতেই আমি বললুম: আপনি কবিতার কথা কিছুই বললেন না!

উত্তরে ভদ্রলোক হাসলেন।

হাসলেন যে?

ভদ্রলোক সংক্ষেপে বললেন: আমাদেব খববের কাগজের কারবার।

আমি তো খবরটুকুই চাইছি।

কবিতার রস আমার নেই।

নাই বা থাকল।

তিনটি নাম জানি। শ্রীকান্তিয়া, বেন্দ্রে, আর মঙ্গেশরাও। শ্রীকান্তিয়া ইংরেজী কবিতার অনুবাদ করেছেন 'ইংলিস গীতগল্‌'। মৌলিক কবিতাও রচনা করেছেন। বেন্দ্রে গীতিকবি, আর মঙ্গেশ রাও শুধু কবি নন, শিশু-সাহিত্যিকও বটে। আর যাঁরা কবিতা লেখেন, তাঁদের কথা আপনি আর কারও কাছে জেনে নেবেন।

কবিতায় গভীর বিতৃষ্ণা এমন লোক বাঙলাদেশেও অনেক আছেন। রবীন্দ্রনাথের পর তাঁরা কোন নতুন কবিকে প্রশ্রয় দিতে

পারেন নি। এখন ধারা বদলেছে, কিন্তু বিতৃষ্ণা যায় নি। কবিতার প্রতি কৃষ্ণরাও কেন বিমুখ সে কথা বললেন না।

বললুম : দেশনেতা দিবাকর শুনেছি এদেশের মানুষ এবং কৃতী লেখক।

আমাদের দেশনেতারা সবাই অনেক কিছু লিখেছেন। মহাত্মা গান্ধী পণ্ডিত নেহেরু বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ শ্রীরাজাগোপালাচারী কে এম মুন্সী আর আর দিবাকর—এরা সবাই সাহিত্যিক। কেউ বড় কেউ ছোট। মুন্সীর মতো মুন্সীয়ানা না থাকলেও দিবাকরেব নাম আছে। তাঁর কাব্যজীবনেব স্মৃতিকথা আব উপনিষদ ও প্রাচীন কবিদের আলোচনা মূল্যবান লেখা। অন্যান্য গদ্যলেখকের কিছু জীবনী আছে, রম্যরচনাও সম্প্রতি লেখা হচ্ছে। লেখক যখন আছে, কলম তো থামে না। কাজেই নানা রকমের বই নিয়মিত বের হচ্ছে।

বললুম : আপনার আলোচনা শুনে মনে হচ্ছে যে তেমন যুগন্ধর লেখক এখনও জন্মান নি।

একেবারে খাঁটি কথা।

তেমন প্রতিশ্রুতিবান কাউকে দেখছেন না?

অসঙ্কোচে ভদ্রলোক বললেন : না।

এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে আমার মন প্রসন্ন হল না। আশা নিয়ে মানুষ বাঁচে। সাহিত্যের বেলাতেও তাই। সাহিত্যকে ভালবাসলে আশা আমাদের রাখতেই হয়। আজ নেই বলে কি কোনদিন হবে না! আমাদের সম্মিলিত বাসনা থেকেই নতুন যুগের সূচনা হবে, জন্ম হবে যুগন্ধরের। কৃষ্ণরাও-এর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, ভদ্রলোক একান্তভাবে খবরের কাগজের লোক। যা ঘটে গেছে, তাই নিয়ে কারবার। যা ঘটবে বা ঘটতে পারে, সে সম্বন্ধে কোন উদ্বেগ নেই, নেই প্রতীক্ষা।

আপনি একটু বিমর্ষ হলেন দেখছি।

বললুম : তা একটু হয়েছি বৈকি।

হওয়া উচিত ছিল না।

কোন আশা রাখব না?

পৃথিবীর কোন দেশ আজ কোন আশা করতে পারছে না। সামনে একটা শূন্যতা দেখছে, একটা মস্ত ফাঁকা। তারপর কুয়াশা। ঐ কুয়াশার আড়ালে ভাল আছে না মন্দ, তা জানতে পারলেও খানিকটা সাহস পাওয়া যায়। ফাঁকা জায়গাটা চোখ বুজে পেরিয়ে যাব।

কৃষ্ণরাওকে একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। অস্পষ্ট ভাবে বললেন : শুধু সাহিত্য নয়, সমাজেরও এই অবস্থা। সাহিত্য তো সমাজেরই ছবি। সমাজের গোড়া মাটিতে শক্ত হলে ফুলে ফলে সাহিত্য হবে পল্লবিত।

সত্যি কথা।

২৬

সমাজের কথায় আরও অনেক কথা এসে পড়ে। সেগুলি প্রশ্ন করে জানবার নয়, মনোযোগ দিয়ে দেখে শিখবার জিনিস। এ কাজে আমি কোনদিন অবহেলা করি না। কোন দেশের মানুষ যদি তার নিজের দেশের মানুষের মতো আচরণ করে, তাহলে আমার ভুল হবার আশঙ্কা থাকে না।

কৃষ্ণরাও সুতোর একটা কোট গায়ে দিয়েছেন, আর মাথায় বেঁধেছেন পাগড়ি। এখনও শীত পড়ে নি, গরম জামার প্রয়োজন বোধহয় আরও কিছুদিন পরে হবে। আরও কয়েকজন প্রৌঢ় লোকের গায়ে কোট আর মাথায় পাগড়ি দেখে আমি ধরে নিলুম যে এই বেশ এঁদের বৈশিষ্ট্য। এ যুগের ছেলেরা হয়তো মানে না, আর অর্থনৈতিক কারণে তারা প্রশ্রয় পায়।

আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করেছি। গাড়ি ব্যাঙ্গালোর ছাড়বার আগে ভদ্রলোক আমাকে কফি খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলেন। একবার অনুরোধ করেই ক্ষান্ত হন নি। এই অনুরোধের আড়ালে আমি আন্তরিকতা দেখেছি। রাজী হই নি অন্য কারণে। স্টলে গিয়ে খেতে হত। গাড়ি ছাড়বার পূর্ব মুহূর্তে তাড়াহুড়ো আমার ভাল লাগে না।

গাড়ি ছাড়বার পরে কৃষ্ণরাও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন ঃ আদর যত্ন আমরা আর কী-ইবা করতে পারি। শুধু একটু কফি।

ভদ্রলোক যে দুঃখ পাবেন, আমি তা ভাবতে পারি নি। বললুম ঃ আপনার আন্তরিকতা কি আমি বুঝি নি! এই আদরের কি মূল্য নেই!

ভদ্রলোক আস্তে আস্তে বললেন ঃ ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে।

ভেবেছিলুম ভদ্রলোক আরও কিছু বলবেন, কিন্তু বললেন না। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বললুম ঃ কী মনে পড়ে?

সে বোধহয় বলবার মতো কথা নয়।

যে কথা মনে আসে, সে শোনবার মতো কথা।

অন্যমনস্কভাবে ভদ্রলোক বললেন ঃ হাতে তখন পয়সা থাকত না, অথচ সঙ্গে বন্ধু আছে। হোটেলে গিয়ে কফি চাইতুম ওয়ান বাই টু, মানে এক পাত্র কফিকে দু ভাগে দিতে হবে। কিংবা ডোসা ওয়ান বাই থ্রি। একখানা ডোসা তিন বন্ধুতে ভাগ করে খাব। আপনাদের হয়তো লজ্জা করবে, আমাদের করে নি। ঐ ভাগটুকু দিতে না পারলেই বরং আমাদের লজ্জা হত। এ মন শুধু ছেলেদের নয়, এ হলো দেশের সমস্ত দরিদ্র জনের মন। এ প্রথা আজও আছে।

উত্তরে আমি বললুম ঃ এর পরের স্টেশনে আমরা কফি খাব।

কিন্তু সব স্টেশনে তো কফি পাওয়া যায় না।

কোথাও নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

তারপরেই অন্য কথা বললুম ঃ এ দেশের একটা বিয়ে দেখবার আমার শখ ছিল।

এ কথা সত্য নয়। নিজের দেশে আমি বিয়ে দেখি নি। অন্য দেশের বিয়ে দেখবার জন্য কেন ব্যস্ত হব! এ প্রশ্ন করবার আগে আমি কি স্বাতির শখের কথা ভেবেছিলুম, না নিজেরই অজ্ঞাতসারে এ প্রশ্ন করে ফেলেছি!

কৃষ্ণ রাও কী বুঝলেন তিনিই জানেন। একটুখানি হেসে বললেন ঃ শখ হওয়া স্বাভাবিক।

নিজের ভুল আমি বুঝতে পেরেছি। তাড়াতাড়ি বললুম ঃ এ দেশের সর্বত্র দেখছি আচারের প্রভেদ। উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণের তো কিছুই মেলে না।

ভদ্রলোকের হাসি তখনও মিলিয়ে যায় নি। বললেন ঃ স্মৃতি-শক্তি ভাল হলে অনেক কিছু বলতে পারতুম।

কৃষ্ণ রাও প্রৌঢ় হয়েছেন, কাজেই অনেক কিছু ভুলে গেছেন বললে দোষ হবে না। মেনে নিয়ে আমি বললুম : যা মনে আছে, ততটুকুই যথেষ্ট হবে।

মনে রাখবার মতো কথা হচ্ছে কাশীযাত্রা। ব্রহ্মচারী জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে একদিন সকাল বেলায় কাশীযাত্রা করেছিলুম। সংকল্প ছিল যে কোন সন্ন্যাসীর কাছে মন্ত্র নিয়ে সন্ন্যাসী হব। অনেকটা দূর এগিয়েও গিয়েছিলুম। কিন্তু এক ভদ্রলোক বাধা দিলেন। বললেন : কোথায় যাচ্ছ ? এই বয়সেও সংসারে এমন বিরাগ কেন ? ব্রহ্মচারী, বিয়ে হয় নি? তাই সংসারে মন নেই! চল চল, আমি তোমার ব্যবস্থা করছি। আমার ভাগনীও বড় হয়েছে, ফুলের মতো সুন্দর মেয়ে। কদিন থেকে তারও মন দেখছি উড়ু উড়ু। তাকে আমি তোমার সঙ্গেই বেঁধে দেব। দেখি তোমার সংসারে মন লাগে কিনা।

ভারি অদ্ভুত শোনাচ্ছিল কৃষ্ণ রাও-এর কথাগুলো। এমন ঘটনাও মানুষের জীবনে কখনও ঘটে!

মেয়ের বাড়ি পৌঁছে দেখি, সে আজব ব্যাপার! লোকজন ফুলমালা চাঁদনাতলা—সবই তৈরি হয়ে আছে। বরের জন্যই শুধু অপেক্ষা। দরজায় পা দিতে না দিতেই নাগস্বরমে আলাপ শুরু হল শঙ্করাভরণ।

এ নিশ্চয়ই আপনার বানানো গল্প।

গল্পটা বানানো নয়, ঘটনাটা সাজানো। আমার গুরুজনেরা সাজিয়ে গুছিয়ে আমাকে বার করেছিল কাশীযাত্রায়, আর সমস্ত আয়োজন করে মেয়েব মামা পথের ধারে অপেক্ষা করছিলেন।

ভদ্রলোক মৃদু মৃদু হাসছেন।

আমার কাছে তখনও সব হেঁয়ালি মনে হচ্ছে।

বললেন : এ শুধু আমার বেলায় নয়, সকলের বেলাতেই এই নিয়ম। সব বরকেই কাশীযাত্রা করতে হয়। পরনে শৌখিন বেশ, কানে কোড়বেলে। কোড়বেলে বোঝেন ?

না।

এক রকমের গোল নিমকি, মাকড়ির মতো পরা।

ভারি আশ্চর্য তো!

সবই দেশাচার। এর আগের কথা শুনবেন?

শুনব বৈকি!

বিয়ের চেয়ে বিয়ের উদ্যোগ পর্বটা ছোট নয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে শুনেছি বিয়েটাই সব চেয়ে ছোট পর্ব। তবে ভরসা এইটুকু যে আমাদের দেশের উদ্যোগ পর্বে ছেলেমেয়ের কোন কাজ নেই, কাজ সব অভিভাবকদের। 'লগ্ন পত্রিকায়' ঠিকুজী বিচার হবে, 'নিশ্চয়ার্থমে' হবে বরকন্যাকে আশীর্বাদ আর বিবাহের দিনস্থির, তার নাম মুহূর্তম। দিনকাল যখন ভাল ছিল তখন চারদিন ধরে উৎসব হত। প্রথম দিন 'ব্রত' দিয়ে শুরু হত, আর শেষ হত 'শেষ হোম' দিয়ে। বিয়ের আগের দিন বিষ্ণু বা শিবের পূজা, উপবাসী থাকবে বর-কনে। বিয়ের দিন 'ব্রত' উদযাপন, অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক ভাবে তার ব্রহ্মচারী জীবনের সমাপ্তি ঘোষণা। মঙ্গলস্নান হবে, নতুন কাপড় পরা, 'ফালি' পরানো। বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব সম্পর্কে পুরোহিত উভয়কে সতর্ক করে দেবেন। তারপর গানের আসর বসবে।

আমি হেসে প্রশ্ন করলুম: 'কাশীযাত্রা'?

'কাশীযাত্রা' করেই তো বর কনের বাড়ি আসবে। বিবাহের সমস্ত অনুষ্ঠান হবে কনের বাড়িতেই।

আমি যখন নূতন কী জানতে চাইব ভাবছিলুম, কৃষ্ণ রাও আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনার দেশে কী আচার?

বিপদে ফেললেন।

কেন বলুন তো?

একটা বিয়েও আমি মনোযোগ দিয়ে দেখি নি।

নিজেও বিয়ে করেন নি বুঝি?

বিয়ে করতে কেউ রাজী হচ্ছে না।

কৃষ্ণ রাও হাসলেন, বললেন: নিজের ঘাড়ে দায়িত্ব না রেখে অন্যের হাতে ছেড়ে দিন, ব্যবস্থা এখুনি হয়ে যাবে।

বলেন কি!

ঠিকই বলছি। যতদিন আমি মেয়েদের পিছু পিছু ঘুরেছি, ততদিন একটা মেয়েও পছন্দ হয় নি। যেদিন অন্যের পছন্দে নির্ভর করে ছাঁদনাতলায় বসলুম, সেদিন শুভদৃষ্টিতে মেয়ের রূপ দেখে নিশ্চয়ই মুগ্ধ হয়েছিলুম। তা না হলে এমন নিশ্চিন্ত মনে এতদিন সংসার করতে পারি।

ভদ্রলোক আগেই তাঁর রসিক মেজাজের পরিচয় দিয়েছেন। সময়টা ভাল কাটবে। হেসে বললুম: আপনার মতো দায়িত্বশীল মানুষও যে খুঁজে পাচ্ছি না।

কৃষ্ণ রাও এ কথার উত্তর দিলেন না, বললেন: এত দূরের পথে নিশ্চয়ই একা বেরন নি।

সঙ্গী আছে।

সম্পর্ক বোধ হয় নেই?

এমন অনুমান কেন করছেন?

এই শ্রেণীর বিচার তাহলে হত না।

বুঝতে আমার একটুও কষ্ট হল না যে তিনি অনেক কিছু লক্ষ্য করেছেন, কিংবা সেই রেলের ভদ্রলোক তাঁকে জানিয়েছে। হেসে বললুম: ও তো দেশেরই বিচার। মনুর বর্ণাশ্রমের বদলে পয়সার বর্ণাশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

গম্ভীর ভাবে কৃষ্ণ রাও বললেন: ঠিক কথা। সগোত্রে বিবাহ আইন করে কায়েম হল, এ অন্য গোত্র। এ সব গোত্রের নতুন নাম শুনছি।

এ আলোচনায় আজ আর লাভ নেই। তাই বললুম: তুঙ্গভদ্রা তো আপনি আগেও দেখেছেন?

কৃষ্ণ রাও আমাকে ঠিকই বুঝেছেন, বললেন: দেখেছি বৈকি। কিন্তু আপনি যা জানতে চাইছেন, সে সম্বন্ধে বেশি কিছু বলতে

পারব না। ইচ্ছে করে নয়, মনে নেই বলে। হাম্পির ধ্বংসাবশেষ আমি শৈশবে দেখেছিলুম।

শুনেছি যে একবার দেখলে আব ভোলা যায় না।

মিথ্যা নয়। মনের ওপব এমন একটা গভীর ছাপ পড়ে যা ভোলা যায় না। কী খেয়েছি কোথায় থেকেছি তা ভুলে গেছি। কিন্তু চোখ বন্ধ করলে আজও সেই বন্য প্রান্তবেব রুক্ষতা দেখতে পাই। ছোট ছোট ধূসব পাহাড় দিগন্তেব গায়ে প্রহবীব মতো দেখেছি। পাথবেব ওপব পাথব চাপানো আছে বিপজ্জনক ভাবে। একখানা সরু মাথাব পাথবেব ওপব বিবাট ভাবি পাথব, হাত দিয়ে ছুঁলেই মনে হয় গড়িয়ে পড়বে। কোথাও একটা গাছপালা নেই, কোথাও নেই শ্যামলিমা। শুধু শব্দ আছে। উত্তবে দুরন্ত তুঙ্গভদ্রা সঙ্কীর্ণ খাদের ভেতব দিয়ে বইছে গম্ভীর গর্জনে।

একদা বিজয়নগরেব তিন দিক ঘেরা ছিল প্রস্তবেব প্রাচীরে। যেখানে প্রাচীর নেই, সেখানে পাহাড়। আব একদিকে বেগবতী তুঙ্গভদ্রা। তুঙ্গভদ্রা আজ তেমনি আছে, পাহাড়ও আছে, নেই শুধু প্রাচীব। ভেঙ্গে পড়েও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। নয় বর্গমাইল শহবেব সীমানা আজও বাঁচিয়ে বেখেছে। অতগুলো ইট আর পাথব। তাব বাহিরেও যে শহব ছিল বিস্তৃত, এ কথা অনুমান কববাব যুক্তি-সঙ্গত কারণ আছে। ধ্বংসস্তূপের মাঝখান থেকে ঠিক ন মাইল দূবে এক সুদৃঢ় দুর্গতোবণ, দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে শহরে প্রবেশের পথ। পূর্ব সীমায় কামপ্লি ও উত্তবে আনেগুন্দি। বিজয়নগর ধ্বংস না হলে এই আনেগুন্দি তাব রাজধানী হত।

ভূমি যেখানে নিম্ন, সেখানে এখন ধান ও আখেব চাষ হচ্ছে। তুঙ্গভদ্রা থেকে একটি খাল কেটে ক্ষেতে জলসেচ হচ্ছে। এ বর্তমানেব ব্যবস্থা নয়। বিজয়নগবেব সমৃদ্ধিব যুগে এখানে যখন ফল ও ফুলের বাগান ছিল, এই ব্যবস্থা তখনকার।

কৃষ্ণ রাও বললেন: চাবিদিকের ছড়ানো পাথব দেখিয়ে কে

একজন বলেছিলেন, ওসব বাঁদরের কীর্তি। কিষ্কিন্ধ্যার বাঁদর ঐ পাথর নিয়ে খেলা করত। বিচিত্র নয়। হনুমান যদি হিমালয় থেকে গন্ধমাদন বয়ে আনতে পারে তো এরাই বা কেন একটার উপর আরেকটা পাথর তুলতে পারবে না!

হাম্পিতে আরও অনেক কিছু দেখবার আছে শুনেছিলুম। সেই কথা আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম।

কৃষ্ণ রাও মেনে নিয়ে বললেনঃ সত্যিই দেখবার আছে। একেবারে অক্ষত কিছু না থাকলেও যতটুকু আছে তাও মূল্যবান। অন্তত পর্তুগীজ পরিব্রাজক পাএস যা লিখে গেছেন তা কল্পনা করে নিতে একটুও কষ্ট হবে না। এটুকু না থাকলে যেন বিস্মৃত বিজয়-নগরের গল্প স্বপ্ন বলে মনে হত।

বিঠল স্বামীর মন্দির আমাদের সবচেয়ে ভাল লেগেছিল। তার পাথরের রথটা কিছুতেই ভুলব না। পাথরেব চাকা যে পথের উপর চলতে পারে, না দেখলে এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের তৈরি এই রথ একদিন রথের মতো ব্যবহৃত হত। এই বিঠল স্বামীর মন্দির নাকি সম্পূর্ণ হবার আগেই ধ্বংস হয়ে যায়। রাজা দ্বিতীয় দেবরায় কিংবা তাঁর আগে এই মন্দিরের নির্মাণ শুরু হয়েছিল, অচ্যুত রায়ের আমলেও যে কাজ চলছিল তা জানা গেছে। বিরাট মন্দির তাব তিনটি দরজা। মূল মন্দিরের চারিধারে আরও পাঁচটি স্তম্ভযুক্ত গৃহ। কী সুন্দর ভিত্তি, তার খাঁজে খাঁজে কারুকার্য। মানুষ কত যত্নে কত ধৈর্যে এমন কাজ করতে পারে, সেই ভেবে আশ্চর্য লেগেছিল।

মন্দির এখানে একটা নয়। হাজারা রামের সুন্দর মন্দিরটি ভাল ভাবে রক্ষিত হয়েছে। বোধ হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে দ্বিতীয় বিরূপাক্ষের তৈরি। বাহিরের দেওয়ালে আমরা রামায়ণের চিত্র ক্ষোদিত দেখেছিলুম। একটার পর একটা গল্প এমন চমৎকার সাজানো যে দাঁড়িয়ে দেখতে ইচ্ছে করে।

পম্পাপতির মন্দিরে বিরূপাক্ষের বিগ্রহ। বিজয়নগর বংশের ইষ্টদেবতা। রাজচিহ্নে কিন্তু বিরূপাক্ষের মুখ নয়, বিষ্ণুর বরাহ অবতার অঙ্কিত ছিল।

মন্দির ছিল মতঙ্গ পর্বতে।

রাজধানীর আর কী অবশিষ্ট আছে?

প্রথমে কী উল্লেখ করা দরকার মনে করতে পারছি না। তবে প্রথমেই একটা উঁচু ভিতের কথা মনে পড়ছে। উঁচু বললে ঠিক ধারণা হবে না। কম করেও একতলার সমান উঁচু হবে দশেরা ডিব্বা। উৎসবের দিনে রাজার সিংহাসন পাতা হত। কৃষ্ণদেব রায় উড়িষ্যা জয় করে এসে এটি নির্মাণ করেন।

পর্তুগীজ পরিব্রাজক পাএসের গল্প আমার মনে পড়ল। কৃষ্ণদেব রায়ের আমলে এক মহানবমীর উৎসব তিনি দেখেছিলেন। রাজা বসেছিলেন এই মণ্ডপের উপর পাত্র-মিত্রদের নিয়ে। সামনে তাঁর সেনাদল, সামন্ত রাজারাও এসেছেন তাঁদের সৈন্য নিয়ে। সবাই মিলে কুচকাওয়াজ হবে। সে কী রাজকীয় ব্যাপার! চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। পাএস নিজের চোখে দেখে এই অবিশ্বাস্য কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

রাজপ্রাসাদেরও এখন শুধু ভিৎটুকু আছে। তাতে প্রচুর কারুকার্য। দশেরা ডিব্বায় দেখেছি সেনাদল চলেছে, দেখেছি নৃত্যপরা সুঠাম কন্যা, হাতি আর ঘোড়ার শোভাযাত্রাও দেখেছি। রাজপ্রাসাদের ভিতে হাতি আর ঘোড়ার সঙ্গে শিকারের দৃশ্য দেখেছি। দরবার গৃহ আজ আর নেই। কাঠের স্তম্ভের উপর কয়েক তলা উঁচু বাড়ি ছিল। আজ শুধু ভাঙা ভিৎটা তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

আরও অনেক দেখবার জিনিস আছে—জেনানা মহল কনসার্ট হল কাউন্সিল রুম হাতিশালায় সারি সারি হাতি থাকবার ব্যবস্থা ছিল। কৃষ্ণরাও বললেন: আর একটি গৃহ আমরা দেখেছিলুম।

তার ভিতর অসংখ্য সুড়ঙ্গ। কী কাজে এই সুড়ঙ্গগুলি ব্যবহৃত হত, এখনও তা আবিষ্কৃত হয় নি।

আর কিছু?

আরও আছে। একখানা পাথর থেকে খুদে বার করা বিরাট নরসিংহ মূর্তি। দুধারে দুই স্তম্ভ, মাথার ওপরে বাসুকির ফণার মতো ছাদ। নরসিংহ বসে আছেন। তাঁর হাত পা এখন ভেঙ্গে গেছে। এমনি এক পাথরের মূর্তি আরও দুটি আছে। শিবের মূর্তিটি আমার ভাল লেগেছিল।

কৃষ্ণ রাও বলতে লাগলেন: একটা জিনিস এখন আমার মনে পড়ে। বিজয়নগরের স্থাপত্য রীতিতে যে নূতনত্বের আমদানী হয়েছিল, তখন সেকথা বুঝতে পারি নি। এখন বই পত্রে ছবি দেখে অনুমান করতে পারি। অনেক গম্বুজে খিলানে মুসলমানী ঢং দেখেছি হিন্দুরীতির পাশাপাশি। মনে হয়, হিন্দু ও মুসলমান স্থপতি এক সঙ্গে কাজ করেছে। আজ এই পদ্ধতিকে ইণ্ডো-সেরাসেনিক শৈলী বলা হচ্ছে। তার অজস্র নমুনা।

গাড়িটা একটা স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছিল। স্টেশনের নাম আমি পড়তে পারি নি, কিন্তু কৃষ্ণ রাও কফির গন্ধ পেয়েছেন। হেসে বললেন: গলাটা না ভিজিয়ে আর গল্প বলতে পারছি না।

আমার রাজী না হবার আর কারণ নেই।

২৭

সন্ধ্যা ছটায় ট্রেন গুন্টাকলে পৌঁছল। কৃষ্ণ রাও এখান থেকে হস্পেটের ট্রেন ধরবেন ঘন্টাখানেক পরে। তিরিশ মাইল রাস্তা, রাত সাড়ে দশটাতেই পৌঁছে যাবেন। আমরা সোজা উত্তরে যাব সেকেন্দ্রাবাদের দিকে।

স্বাতি এসে উপস্থিত হল। গম্ভীর মুখে বলল : বাবা তোমাকে ডাকছেন।

কেন ?

তোমার অনেক ধৃষ্টতা সহ্য করেছেন, আর নয়।

এটা তোমার কথা, না মামার ?

যার কথাই হোক, কথাটা সত্যি। সত্য কথা বলবার অধিকার সবারই সমান।

ভুল হল।

কেন ?

সরকার কি সব সত্য কথা বলতে দেয় ! ইংরেজের আমলে গুজব ছিল যে রুশ দেশের একটা লোকেরও সত্য বলার অধিকার নেই।

তর্ক নয় গোপালদা, তর্কে হেরে আমি তোমায় রেখে যেতে আসি নি। আমি তোমাকে ধরে নিয়ে যাব।

কৃষ্ণ রাও কিছু বুঝতে পারেন নি। তাঁর দিকে চেয়ে বললুম : আমার মামাতো বোন। বলছে, মামা মামী আমার জন্যে খুবই ব্যস্ত হয়েছেন।

কৃষ্ণ রাও তাড়াতাড়ি নমস্কারটা সেরে নিলেন, বললেন : তাহলে আপনার আর দেরি করে দেব না।

নমস্কার করে আমরাই আগে সরে গেলুম।

আমি সরাসরি মামার গাড়ির দিকে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিলুম। বাধা দিয়ে স্বাতি বলল: স্টেশনটা একটু দেখব না?

আমি এই স্টেশন দেখার মানে বুঝি। হেসে বললুম: কিছু গোপন কথা আছে বুঝি?

স্বাতি একটা তাচ্ছিল্যের নিঃশ্বাস ফেলল: হুঁ, গোপন কথার লোকই বটে।

বললুম: তাপ্তিকে কী বলেছ?

কী বলেছি?

কী বলনি!

স্বাতি যে একটু ভাবনায় পড়েছে তা দেখতে পেলুম। বিব্রত ভাবে বলল: নিশ্চয়ই কিছু তৈরি করে বলেছে।

তৈরি করে বলেছে, না সত্যি বলেছে, সে বিচার পরে হবে। এখনও অনেক পথ আমাদের এক সঙ্গে চলতে হবে। এখন নতুন কী বলবে বল।

বলতে আমার বয়ে গেছে।

হেসে বললুম: এ তোমার হারের কথা স্বাতি, জিতলে মাথাটা সুস্থ থাকত।

স্বাতি যে আমার কথা মেনে নিয়েছে তা তার আচরণেই প্রকাশ পেল। বলল: আমাদের গাড়িতে একটা বার্থ খালি আছে। বাইরের একটা লোক ঢুকলে মা বাবা কি রাতে ঘুমতে পারবেন?

এই ভাবনা?

আমি তোমার চাদর বিছিয়ে এসেছি। কেউ এলে লোক আছে বলা হবে।

আশ্বস্ত হবার ভান করে বললুম: আমার আর কোন কাজ নেই তো?

আর কী কাজ থাকবে?

নাচ গান বক্তৃতা?

স্বাতি হেসে উঠল : আমাকে ভয় পাও বুঝি ?

পাই বৈ কি।

তবেই দেখ, তোমাকেও হারিয়ে দিয়েছি।

ভুজনের হারার ভেতর কোন তফাৎ নেই কি ?

কোন প্রশ্ন না করে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : আমি হেরেছি তোমার মুখের কাছে, আব তুমি—

তোমার মনের কাছে বলবে, এই তো! বুদ্ধি থাকলে বুঝতে যে মন জিনিসটা সকলের থাকে না। আমরা তোমার হ্যাংলামিব কাছে হেরেছি।

প্রায় একই কথা হল। লোভ চেপে রাখলে ভদ্রভাষায় বলি মন, আর প্রকাশ হয়ে পড়লে হ্যাংলামি। মেয়েরা শুনেছি হ্যাংলামি ভালবাসে।

তোমার নিজের অভিজ্ঞতা ?

কিছু হয়েছে বৈ কি!

একটুখানি পথ চলতে আমাদের অনেক সময় লাগছে। স্বাতি সেই কথা মনে কবিয়ে দিল : গাড়িটা ছেড়ে গেলে কি তোমাব ভাল লাগবে ?

বোমান্সে কার লোভ নেই বল।

গাড়ি ফেল করার মধ্যে রোমান্স কোথায় ?

রোমান্স তো তার পরে। তোমাব হাত ধবে স্টেশনের বাইরে নতুন পথে নেমে পড়ব। মামা নেই মামী নেই, শুধু -

ঐ যে বাবা আসছেন!

সত্যিই মামা তোমাকে ভয় পান দেখছি।

আমাকে নয়, তোমাকে।

মামার গাড়িব দিকে তাড়াতাড়ি এগোতে এগোতে বললুম : আমাকে তিনি আর কতটুকু জানেন! তোমাকে তো মানুষ করেছেন, তোমাকে চেনেন ভাল করে।

মামা গাড়ি থেকে নামেন নি, দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ছিলেন। আমাদের দেখতে পেয়ে নিশ্চিন্ত হলেন।

গাড়িতে উঠেই স্বাতি বলল: সাংঘাতিক লোককে তুমি খুঁজে আনতে বলেছিলে বাবা, গাড়ির ভেতর লুকিয়ে ছিল। ভাগ্যি সেই ভদ্রলোকের দেখা পেয়েছিলাম।

কোন্ ভদ্রলোক?

যিনি নেমে পড়লেন এইখানে, তিনিই তো জিজ্ঞেস করলেন, কাউকে খুঁজছি কি না। বললাম, গরু খোঁজা করছি। ভদ্রলোক হেসে বললেন, আসুন আমার সঙ্গে, এক বাঙালীবাবু এখানে পৌঁছতেই মুখ গুঁজে শুয়ে পড়েছে।

ইচ্ছে হল, সত্যি কথাটা আমি বলে দিই। কিন্তু মামী তা পছন্দ করবেন না। তার চেয়ে যা পছন্দ করবেন তাই বলি: একটু দূরে থাকাই ভাল।

মামা যে ব্যস্ত হয়েছিলেন তা তাঁর কথাতেই ধরা পড়ল। বললেন: দূরে অনেক থেকেছ, এবারে কাছে থেকে উদ্ধার কর।

আমি বসবার পরে বললেন: এর চেয়ে মাদ্রাজ হয়ে দেশে ফেরাই ভাল ছিল, এই সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি শুয়ে বসে গড়িয়ে আর ভাল লাগে না।

বললুম: ভোর বেলাতেই সেকেন্দ্রাবাদ পৌঁছব।

সেরকম তো বাড়িতেও একদিন পৌঁছব।

স্বাতি মুখ টিপে হাসছিল। মামী বললেন: তা চটছ কেন, গোপাল কী করবে!

কী করবে মানে! গল্পও তো করতে পারে।

স্বাতি আর চুপ করে থাকতে পারল না। খিলখিল করে হেসে উঠল। মামা চটে উঠলেন: হাসছিস যে!

গোপালদা ভারি খুসী হয়েছে। বলছিল—

মামা বললেন: তামাসা এখন থাক। মুখ বন্ধ দেখে হাঁপিয়ে উঠেছি।

সে কি বাবা, আমরা তো সারাক্ষণ তোমার সঙ্গে কথা বলেছি।

মামী বললেন: কাজের কথা কি ওঁর কানে গেছে!

আমার দিকে চেয়ে বললেন: এবারে কোথায় পাহাড় আছে আর কোথায় টিপি আছে, সেই কথা ওঁকে শোনাও। খুব মন দিয়ে শুনবেন।

মামা বললেন: হতভাগা কফি আনতে তো বড় দেরি করছে।

দেরি হলেও কফি এল। গাড়ি অনেকক্ষণ দাঁড়ায় বলেই তা পাওয়া গেল। ছোট ছোট পেয়ালায় ঢেলে আমরা তা শেষ করে ফেললুম। মামী খেলেন না। কফির গন্ধ তার হুঁকোর জলের মতো মনে হয়েছিল। একবার নাক সেঁটকালে আর উপায় নেই। অনেক সাধ্য-সাধনাতেও আর মত ফিরবে না।

কফির দাম চুকিয়ে মামা পাইপ ধরালেন। গাড়ি চলতে শুরু করেছে। মামার মনও হয়েছে প্রসন্ন। বললেন: বুঝলে গোপাল, সেকেন্দ্রাবাদটা ঠিক ব্যাঙ্গালোরের পরেই নয়। মাঝখানে আরও অনেক দেখবার জায়গা আছে, যা আমরা পেরিয়ে যাচ্ছি। ভারতবর্ষ কি আর আজকের দেশ, না কালোবাজারীর মতো এ ভুঁইফোড় বনেদী!

স্বাতি গম্ভীর ভাবে বলল: কী কী দেখবার জায়গা আমরা না দেখে চলে যাচ্ছি, তাই বল।

বলে একখানা মানচিত্র আমার সামনে এগিয়ে দিল।

বললুম: ওটার দরকার হবে না। নিজের দেশের সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা আছে।

তাহলে শুরু কর।

গুণ্টাকলে নেমে আমরা হুবলির গাড়িতে উঠলুম না। উঠলে ঘণ্টা তিনেক পরে আমরা হস্পেট পৌঁছতে পারতুন। সকালবেলায় হাম্পি বিজয়নগর কিষ্কিন্ধ্যা। সবই কাছাকাছি। সেখানেও যদি না নামতুম তো হুবলি। পৌঁছবার আগে গডগ নামে একটা জংসন আছে।

সেখান থেকে শোলাপুরের গাড়ি। এই লাইনে দুটো স্টেশন আছে দেখবার মতো। প্রথমটা বাদামি, গডগ থেকে চল্লিশ মাইল। আর দ্বিতীয়টা বিজাপুর। বিজাপুরের গোলগম্বুজ দেখতে বোম্বাই থেকেও লোক আসে। কিন্তু বাদামি পুরনো বনেদী। চালুক্য রাজাদের রাজধানী ছিল বাতাপীপুর বা বাদামি।

মামা মামীর মুখের দিকে এমন ভাবে তাকালেন যেন এই গল্প শোনবার জন্যেই সারাদিন ছটফট করেছেন। আমি এই সব খবর সংগ্রহ করেছি কৃষ্ণ রাও-এর কাছে। দুপুরে ঘুমোবার অভ্যাস তাঁরও নেই। কাজেই সারা দুপুর আমরা গল্প করে কাটিয়েছিলুম। আমি জানতুম, এসব আমার কাজে লাগবে।

বাদামির কথাই আগে বলি।

বাদামি একা সম্পূর্ণ নয়, প্রতিবেশী আরও দুটো সুন্দর স্থান নিয়ে সম্পূর্ণ। পট্টডকল ও আইহোল। পট্টডকল বাদামি থেকে মাত্র দশ মাইল। লোক টাঙ্গায় চড়ে যায়। এখান থেকে আইহোল আট মাইল কিন্তু মাঝখানে মলপ্রভা নদীর জন্য কিছু অসুবিধে। লোকে বাদামি থেকে ট্রেনে একটা স্টেশন এগিয়ে যায়। কিংবা দুটো। বগলকোট স্টেশনে ট্যাক্সিও পাওয়া যায়। বাদামি থেকে বগলকোট ষোল মাইল দূরে।

ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাতাপি ছিল চালুক্যদের রাজধানী তখন রাজা ছিলেন দ্বিতীয় পুলকেশী। শক্তিমান খ্যাতিমান পুরুষ। মনের মতো করে তাঁর রাজধানী গড়েছিলেন। কিন্তু এই রাজধানীর উপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে। ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে পল্লবরা এই নগর অধিকার করে, এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই তার হৃতগৌরবের পুনরুদ্ধার হয়। রাষ্ট্রকূটরা অধিকার করে ঠিক একশো বছর পর— ৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর মারাঠার অধিকার। ব্রিটিশ প্রভুত্ব পেয়েছে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে।

এই নগরের উপর সবারই যেন লোভ ছিল। তার একটা কারণ

বোধ হয় সৌন্দর্য। দুটি পাহাড়ের পাদদেশে এর প্রাকৃতিক শোভা বড় মনোরম। সেইটিই বোধ হয় লোভের কারণ।

যাঁরা পুরাতত্ত্বের ছাত্র কিংবা স্থাপত্য বিদ্যায় অনুরাগী, তাঁদের কাছে এই গুহা ও মন্দিরগুলি গবেষণার অপূর্ব বিষয়। কোন্‌টা আগে এবং কোন্‌টা পরে, এই নিয়ে স্থাপত্যের ক্রমবিবর্তন অনুসরণ করা চলে। গবেষণা যে হয় নি তা নয়। সে আলোচনা আমাদের জন্য নয়। এইটুকু জেনেই আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি যে বাদামির ব্রাহ্মণ মন্দির তিনটি নির্মিত হয়েছে ষষ্ঠ শতাব্দীর ঠিক মধ্য ভাগে, আর জৈন মন্দিরটি তার একশো বছর পরে। গুহা মন্দিরের ভিতর তখন কয়েকটি নূতন জিনিস দেখা দিয়েছে—বাহিরে একটা স্তম্ভযুক্ত বারান্দা, তারপর একটি বড় ঘর আর পাহাড়ের গভীর অংশে বিগ্রহের জন্য একটি চৌকো গর্ভগৃহ। বাহিরটা সাদাসিধে, ভিতরে অজস্র কারুকার্য।

এক নম্বর গুহা মন্দিরের পরিকল্পনা বড় সুন্দর। বারান্দায় শিবের অনুচরগণদের নানা ভঙ্গির মূর্তি। বামে দ্বারপাল ও নন্দী, তারই সামনে অষ্টাদশভুজ শিব তাণ্ডব নৃত্যে রত। ভিতরে চতুর্ভুজ বিষ্ণু, তার দক্ষিণে অর্ধনারীশ্বর। পিছনের দেওয়ালে মহিষমর্দিনী দুর্গা। তাঁর দক্ষিণে সিদ্ধিদাতা গণেশ।

দু নম্বর গুহার দুটি দ্বারপাল, সঙ্গে নারী। বারান্দার বামে বরাহ অবতার। গৃহের ছাদে গরুড়ারূঢ় চতুর্ভুজ বিষ্ণু। আর ষোড়শ মৎস্যবেষ্টিত সুন্দর পথ।

তিন নম্বর গুহা বিষ্ণুর মন্দির। তার ভিতর নানা অবতারের মূর্তি শোভা বৃদ্ধি করছে।

চতুর্থ গুহা জৈনদের। এই মন্দিরে পার্শ্বনাথ আছেন। সর্প-বেষ্টিত গৌতম আছেন, আর আছেন মহাবীর। এ ছাড়া আরও একটি আকর্ষণ আছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সামনে একটি চমৎকার সরোবর দেখা যায়।

স্বাতি হঠাৎ বলে উঠল : আর কটা গুহা আছে গোপালদা ?

ভাল লাগছে না বুঝি ?

মামা বললেন : তুমি তো নিজে এসব দেখ নি, এত কথা মনে রাখলে কী করে ?

টাটকা শুনেছি বলেই মনে আছে। দেশে পৌঁছবার আগেই ভুলে যাব। নিজের চোখে দেখলে অনেক বেশিদিন মনে থাকে, ভোলবার চেষ্টা করেও সব ভোলা যায় না।

মামা মেনে নিলেন : কথাটা ঠিক। পড়া জিনিস ভুলে যাই। কিন্তু দেখা জিনিস ভুলি নে।

স্বাতি বলল : শোনা জিনিস ?

উত্তর মামা দিলেন : ও পড়াবই মতো।

তারপর আমাকে হুকুম করলেন : তোমার গল্প বল।

বাদামির গল্প ফুবিয়েছে, এবারে পট্টডকলের গল্প বলি।

তাড়াতাড়ি স্বাতি বলল : সেখানে কটা গুহা ?

এ তার তামাসাব কথা সন্দেহ নেই। উত্তব তব সহজভাবেই দিলুম : ভয় নেই, দুটিমাত্র মন্দিবের নাম মনে আছে। তাব বেশি বলতে পারব না। চালুক্য স্থাপত্যেব নমুনা হল আপনাথেব মন্দিব। দ্রাবিড় শিল্পের নমুনা অনেক, তার মধ্যে বিরূপাক্ষের মন্দিরটিই সবচেয়ে ভাল। জৈন মন্দিরও আছে। সবই প্রায় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর কীর্তি।

মামা বললেন : এই সব শিল্পেব কোন বড় পার্থক্য জান ?

কৃষ্ণ বাও বোঝাতে চেষ্টা কবেছিলেন, কিন্তু পুরোপুরি মাথায় ঢোকেনি। চালুক্যদের কায়দা বলেছিলেন, পলেস্তারার ব্যবহার আব কারুকার্যের অজস্রতা। দ্রাবিড় মন্দিরে একটা শিখর থাকবে চারকোণা পিবামিড। পববর্তী যুগে গম্বুজের ধারণা নাকি এর থেকেই আসে। পরিকল্পনায় সূক্ষ্ম শিল্প-চেতনার অভাব আছে।

এর পর আইহোল। আইহোলের ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠার কথা

জানি নে। কিন্তু সে যে এক সময় মন্দিরের নগর ছিল তাতে সন্দেহ করবার অবকাশ নেই। আজও সেখানে সত্তরটি মন্দির আছে, তার ভিতর তিরিশটি একই প্রাঙ্গণের মধ্যে।

স্বাতি চমকে ওঠার ভান করল: এবারে সত্তরটি মন্দিরের বর্ণনা দেবে তো?

মাত্র দুটির বর্ণনা জানি। হিন্দুদেব দুর্গা মন্দির আর জৈনদের মেগুটি মন্দিব। সবচেয়ে প্রাচীন মন্দিরটির নামও মনে পড়ছে দেখছি—লধ-খন। এই মন্দিরের বাহিবে আসনের যে নমুনা দেখা যায় পরবর্তী যুগে তা অতি প্রিয় অলঙ্কাব হয়ে দাঁড়ায়। এই মন্দিরগুলিও সব সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছে।

স্বাতি একটা তৃপ্তিব নিঃশ্বাস ফেলে বলল: বোধ হয় শেষ করেছ?

শেষ মনে করলেই শেষ।

মামা বললেন: এ সব আমাদের দেখাবে না?

বললুম: দেখবার মতোই জিনিস। কিন্তু দেবতাহীন মন্দির কি আপনাব ভাল লাগত!

মামা বললেন: বুঝেছি।

কী বুঝেছেন তা বললেন না। আমি বললুম: আমরা তো পৃথিবীব শ্রেষ্ঠ গুহা দেখবই। অজন্তা ইলোরা যারা দেখবে, তাদের কাছে এ সব ছেলে খেলা। পশ্চিম ভারতে এ রকম গুহার শেষ নেই।

বল কি!

বম্বেতে এলিফ্যান্টা, কানেরি, যোগেশ্বরী, মণ্ডপেশ্বর। করলা, ভাজা, বেগুসা, নাসিক আর জুনাগড়ের গুহা। আমরা বাদামি, পট্টডকল, আইহোল দেখলুম না। দেখব ইলোরা আর অজন্তা। ভারতের প্রাচীন সভ্যতাকে আবিষ্কার করতে ঐ দুটো নামই যথেষ্ট।

স্বাতি আর কিছু মন্তব্য করল না। আমি তার দৃষ্টিতে নেশার মতো বিহ্বলতা দেখলুম। তার সৌন্দর্য-চেতন সরল মনটাকে সে লুকিয়ে রাখতে পারল না। বাহিরে রাত্রির অন্ধকার গভীর।

ভোর সাড়ে পাঁচটায় আমরা সেকেন্দ্রাবাদে পৌঁছলুম। কাল সারা দিনটা ট্রেনে কেটেছে। দুপুর একটার পরে হিন্দুপুরে নিরামিষ খেয়েছি। রাত আটটায় আমিষ খাবার পাওয়া গেছে দ্রোণাচলমে। শুয়ে বসে গড়িয়ে দেহে ক্লান্তি এসেছে। ভাল করে স্নান সেরে খানিকটা বেড়াতে পারলে মন মেজাজ ভাল হবে।

মামা বললেন ঃ এ রাজ্যে কদিন থাকতে হবে ?

একদিনও না। সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় আমাদের ঔরঙ্গাবাদের গাড়ি।

স্বাতি বলল ঃ এক বেলাতেই সব দেখা হয়ে যাবে ?

দেখবার আর বিশেষ কী আছে !

মামী বললেন ঃ এবারে আর নবককুণ্ডে নিয়ে তুলো না।

ব্যাঙ্গালোরের ওয়েটিং রুমের কথা তাঁর মনে পড়েছে। দশজনের ব্যবহারের জায়গা নিজের বাড়ির মতো পরিষ্কার হয় না। খানিকটা নোংরামি থাকবেই। সেটুকু মেনে নিলে খানিকটা শান্তি পাওয়া যায়। মামা বললেন ঃ তাহলে স্বর্গের সিঁড়িটা দেখ।

কুলিরা মালপত্র মাথায় তুলে নিয়েছে। বললুম ঃ রিটায়ারিং রুমে চল।

ঘর খালি আছে। ব্যবস্থাও ভাল। স্নানের ঘর মামীর পছন্দ হয়েছে। বললেন ঃ কাল বড় কষ্ট গেছে। আজ স্নানটা আগে সেরে নিই।

মুখ হাত ধুয়ে চা খেয়ে আমরা নিচে যখন নামলুম তখন বোধ হয় আটটা বেজে গেছে। একটা গাড়ি ঠিক করে বেরিয়ে পড়বার আগে

আমি রাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলুম। সারারাত আমাদের ট্রেনে কাটাতে হবে। বার্থ রিজার্ভ করা চাই।

মামা বললেন: এইজন্যেই তোমাকে—

আমরা রিজার্ভেসন অফিসের সামনে এসে গিয়েছিলুম। বললুম: এইখানেই টিকিট কাটতে হবে।

এ দেশের গাড়িতে বোধ হয় ভিড় কম হয়। জায়গা পেতে অসুবিধা হল না। টিকিট কেটে রসিদ নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম।

স্টেশনটি যে বেশি পুরনো নয়, তা আমরা ওপরতলা দেখেই বুঝতে পেরেছিলুম। নিচেও একটি পরিচ্ছন্ন আবহাওয়া। প্রশস্ত বাধানো পথ বিস্তৃত হয়ে আছে। তারই শেষ প্রান্তে ছোট বড় একতলা দোতলা বাস যাত্রীর অপেক্ষা করছে। পরিষ্কার সুন্দর বাস। শহরের সমস্ত প্রান্তে নাকি অবাধে যাতায়াত করে। পথ-ঘাট চেনা থাকলে আমরাও যাতায়াত করতে পারতুম। মামা বললেন: ও কাজ ক'রো না। নতুন জায়গায় বাসে উঠলে অকারণে ঘুরে মরবে। তার চেয়ে একটা ট্যাক্সি ধর। সে-ই সব দেখিয়ে দিক।

স্বাতি বলল: আমি সব ব্যবস্থা করছি বাবা।

বলে এগিয়ে গেল।

মামী ব্যস্ত হলেন, বললেন: তুই আবার কোথায় যাচ্ছিস?

কিন্তু সে কথা তার কানে গেল না। মামা চিন্তিত ভাবে আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমি এগিয়ে গেলুম।

চোখের সামনে একটা মস্ত বড় হোটেল। বাহির থেকে বেশ পরিচ্ছন্ন বোধ হচ্ছে। স্বাতি আমার পায়ের শব্দ পেয়ে বলল: স্টেশনের খাবারে অরুচি ধরেছে। আজ আমরা এই হোটেলে খাব। তন্দুরি রুটি আর মোরগ মুসল্লম।

কিসের আচার থাকবে?

স্বাতি একটা কটাক্ষ করল। কিন্তু কিছু বলবার সুযোগ পেল না। একটা ট্যাক্সি ধরে ফেলেছে।

এ শহরে কানাড়ী জানবার দরকার নেই। মারাঠী বা তেলেগু না জানলেও চলে। উর্দু এখানকার প্রধান ভাষা। হিন্দীতেই কাজ চালানো যায়। ট্যাক্সিওয়ালাকে স্বাতি বলল হিন্দীতে : কী দেখাবে বল।

যা দেখতে চাইবেন।

আমরা সব দেখব। চিড়িয়াখানা জাদুঘর—

আমি যোগ করলুম : চার মিনার—

ট্যাক্সিওয়ালা এতক্ষণে বুঝেছে যে আমরা বিদেশী লোক। শহর দেখতে এসেছি। বলল : মক্কা মসজিদ, ফলকনুমা প্যালেস, ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটি, মুসি নদী, পাবলিক গার্ডেন্‌স্, হসপিটাল, হাইকোর্ট—

ব্যস ব্যস, ওতেই হবে। হাইকোর্টের পর আর কিছু দেখাতে হবে না।

পিছন থেকে মামা বাঙলায় এই কথা বললেন।

সবাই আমরা গাড়িতে উঠে বসলুম। দরাদরির প্রশ্ন তখনি ওঠে, যখন খরচ করতে হয় হিসেব করে। মামা বলেন, খরচ করতেই তো বেরিয়েছি। দরাদরির দরকার কী! পয়সা শেষ হলেই বাড়ি ফিরে যাব। আমি বলি না যে এমন কথা এদেশে বেশি লোক বলতে পারে না। সামান্য পুঁজি নিয়ে লোকে রামেশ্বর সেতুবন্ধ আসে, দ্বারকা সোমনাথ যায়, যায় কেদার বদরী অমরনাথ! অনিদ্রায় অর্ধাহারে কোন রকমে তীর্থ সেরে দেশে ফেরে। দেহের স্বাস্থ্য গেছে, কিন্তু মনে সম্পদ জমেছে। আমাদের তীর্থদর্শন সে রকম নয়। আমাদের শখের ভ্রমণ।

গাড়ি চলতেই মামা জিজ্ঞাসা করলেন : এ জায়গাটার নাম সেকেন্দ্রাবাদ না হায়দ্রাবাদ?

শুনেছি এই দুটো পাশাপাশি শহর। হায়দ্রাবাদ পুরনো শহর, আর সেকেন্দ্রাবাদ নূতন। হায়দ্রাবাদেও একটা স্টেশন আছে, সেটা

বড় লাইনের উপর। সেকেন্দ্রাবাদে ছোট বড় দুটো লাইনই আছে। বললুম: এটা তো সেকেন্দ্রাবাদ। কতটা এগোলে হায়দ্রাবাদ সেটা জেনে নিতে হবে।

আমি ড্রাইভারকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করলুম। ড্রাইভার বলল যে এই দুই শহরের সীমানা হল হুসেন সাগর। আসল শহর হল হায়দ্রাবাদ। যা কিছু দেখবার সবই সেখানে। হায়দ্রাবাদ থেকে মাইল ছয়েক দূরে সেকেন্দ্রাবাদ শহরের পত্তন হয়েছিল সেনাবিভাগের প্রয়োজনে। জল হাওয়া ভাল, সুযোগ সুবিধাও অনেক। তাই একটা নতুন শহর গড়ে উঠল।

আজ সৈন্যদল দেখতে পেলুম না। দেখলুম একটা পরিচ্ছন্ন শহর—বাঁধানো পথ ঘাট, সুদৃশ্য ঘর বাড়ি আর শৌখিন দোকান পাট।

এক সময় আমাদের গাড়ি হুসেন সাগরে পৌঁছল। অদ্ভুত সুন্দর জায়গা। একধারে বিস্তৃত জল, অন্যধারেও পথ আর প্রান্তর। গাড়ি ছুটেছে মাঝখানের বাঁধানো রাস্তা ধরে। জলের দিক থেকে শীতল বাতাস আসছে অল্প অল্প। রূপোলি রোদে চারিদিক ঝক্‌ঝক্ করছে। সূর্যাস্তের পরে চাঁদনি রাতে এই স্থান যে মায়াময় হয়ে উঠবে, তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই। পিছন থেকে স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: আজ সন্ধ্যের আগেই কি আমরা চলে যাব?

এ প্রশ্নের মানে বুঝতে আমার সময় লাগল না। বললুম: ইচ্ছে করলে থাকা যায়।

আর কেউ না থাকলে বলতুম: মায়া বাড়িয়ে আর লাভ কী!

মাইল চারেক জায়গা জুড়ে এই হুসেন সাগর লেক। এমন লেক নাকি এ রাজ্যে আরও তিনটে আছে। ওসমান সাগর, হিমায়াৎ সাগর আর নিজাম সাগর। মুসি নামে একটা নদী হায়দ্রাবাদ শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে। ছোট নদী, কিন্তু বড় দুরন্ত। বন্যা লেগেই আছে। ধনে জনে মারে। এই নদীকে জব্দ করবার জন্যে

মাইল দশেক দূরে গাণ্ডিপেটে তাকে বাঁধা হল। চুয়ান্ন লাখ টাকার পরিকল্পনা। লেকের নাম হল ওসমান সাগর। হায়দ্রাবাদ শহরের খাবার জল আসে সেখান থেকে, আর ছুটির দিনে শহরের লোক যায় বাঁধের বাগানে পিকনিক করতে। দুমাইল দূরে হিমায়াৎ সাগর। তেত্রিশ বর্গ মাইল তার পরিধি। আর নিজাম সাগর প্রায় একশো মাইল দূরে। ভারতের দ্বিতীয় বৃহৎ লেক, পঞ্চাশ বর্গ মাইল জায়গা জুড়ে আছে, আর আড়াই লক্ষ একর জমিতে চাষের জল সরবরাহ করতে পারে।

হুসেন সাগরের জল শেষ হয়ে গেল। ড্রাইভার ডান দিকে ফিরে বলল: আগে পাবলিক গার্ডেনটা দেখিয়ে দিই।

মস্ত বড় বাগান। ভিতরে যাতায়াতের জন্য দুটো গেট। মোটর সরাসরি ভিতরে ঢুকে গেল। খানিকটা এগিয়ে ড্রাইভার বলল: কোথায় দাঁড়াব?

তা আমরা কী জানি!

সে কথা সে নিজেও বুঝেছে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বলল: এই বাড়িগুলো আপনাদের চিনিয়ে দিই। টাউন হল, জুবিলী হল আর জাদুঘর। এদিকে চিড়িয়াখানা, বাকিটা বটানিকাল গার্ডেন।

গম্ভীর ভাবে মামা বললেন: তাহলে দেখবার কিছুই নেই।

ড্রাইভারকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম: এইটাই কি হায়দ্রাবাদের বিখ্যাত জাদুঘর?

সে হল সালারজং মিউজিয়ম। বিরাট ব্যাপার। কয়েক দিন ধরে আপনাদের দেখতে হবে।

মামা চমকে উঠলেন: কয়েক দিন!

সাহস পেয়ে ড্রাইভার বলল: তারপর গোলকুণ্ডা ফোর্ট। সেও পুরো একদিনের ব্যাপার।

মামা আমার দিকে তাকালেন কাতর ভাবে। আমি বললুম: এ জাদুঘরের দরজা তো এখনও খোলে নি। বাগানটি ভালই

দেখতে পাচ্ছি। এক সঙ্গে এত রকম রঙের ক্যানা খুব কমই দেখা যায়।

স্বাতি বলল : চিড়িয়াখানা দেখব না ?

ছুনিয়াটাই তো চিড়িয়াখানা হয়েছে। তা দেখে আর সময় নষ্ট কেন !

ড্রাইভার বলল : চিড়িয়াখানাটা তেমন ভাল কিছু নয়।

কাজেই আমরা নামলুম না। রাস্তাটা সমস্ত বাগান ঘুরে আর একটা গেট দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। এক ধারে খানিকটা নিচু জমি। নানারকমের বসবার ব্যবস্থা, ফুল পাতাও বেশি। মনে হল, সন্ধ্যে বেলায় এখানে রং বেরঙের প্রজাপতি আসে।

এবারে আমরা হায়দ্রাবাদ শহর দেখব। অন্য কোথাও না গিয়ে মুসি নদীর পুলের উপর এলুম। আফজলগঞ্জের ঘন বস্তি। সেকেন্দ্রাবাদ স্টেশন থেকে বাস এসে দাঁড়াচ্ছে। অজস্র রিক্স। রিক্সগুলি একটু বেশি উঁচু। চাকা সমানই, উঁচু পাদানিটা। লোকেরা আরাম করে বসতে পাচ্ছে না, বসছে হাঁটু মুড়ে। এমন অস্বস্তিকর আকারের তৈরি করবার কী দরকার ছিল বোঝা গেল না। বাস থেকে নেমেই লোকেরা রিক্সয় উঠছে। নদীর পুল পেরিয়ে আবিদস্ রোড যাবে, কিংবা চার মিনার। দূরের পথ নয়, তবু রিক্সয় উঠছে। ভাড়া নিশ্চয়ই কম। ড্রাইভার সমর্থন করে বলল, দু আনায় এরা অনেকটা পথ নিয়ে যায়। বাঙলা দেশের শহরে দু আনার কোন দাম নেই।

মুসি নদীর ধারে রিভার গার্ডেন আছে। বাগান দেখবার সময় আমাদের নেই। দুপুরে আহারের আগেই আমাদের সবকিছু দেখে নিতে হবে। তার পরের জন্য আর কিছু রাখলে চলবে না। মামা-মামীর বিশ্রামের পর বেরবার আর সময় থাকবে না।

নদীর এপারে আমরা ওসমানিয়া হাসপাতাল দেখলুম, ওপারে হাইকোর্ট। অদ্ভুত সুন্দর বাড়ি। নদীর জলে ছায়াও পড়েছে। গাড়ি থেকে নেমে স্বাতি ছবি নিল হাসপাতালের। মনে হচ্ছিল

দুটো বাড়ি। একটা জলে আর একটা আকাশে। হেমন্তের খণ্ড মেঘ স্থানে স্থানে ঘন হয়ে আছে। তারও ছায়া জলে পড়েছে।

আস্তে আস্তে বললুম: হাইকোর্টের ছবি নেবে না?

তোমাকে তো দেখিয়েই দিলাম, আবার ছবির কী দরকার!

দেশে বুঝি দেখবার লোক নেই?

আরও আস্তে আরও সন্তর্পণে বললুম: সেই বিলেত-ফেরৎ সাহেব?

তুমিই ভাল করে দেখ।

চার মিনারে আসবার আগে আমরা আবিদস্ রোড দেখে নিলুম। হায়দ্রাবাদের ব্যবসাকেন্দ্র। ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটি আর ফলকনুমা প্যালেস। হায়দ্রাবাদে সুন্দর প্রাসাদ আরও আছে— চৌমহল্লা আর কিং কোঠি। নিজাম বাহাদুর নাকি এক প্রাসাদে বেশিদিন থাকতে ভালবাসেন না। দিল্লীতেও তাঁর গোটা কয়েক প্রাসাদ আছে। একটা প্রাসাদে এক হপ্তার বেশি থাকেন না। ভারত সরকার এখন একটা রেখে বাকি প্রাসাদগুলো নিয়ে নিয়েছেন। নিজাম বাহাদুরের কষ্ট হচ্ছে।

মামার মুখে এই গল্প শুনলুম। বললেন: সত্যি মিথ্যে জানি নে। তবে চালু গল্প।

নিজাম বাহাদুরের গল্প মামা আরও একটা বললেন। সুইজারল্যাণ্ডে তাঁর সিনেমা দেখার গল্প। নিজাম বাহাদুরের শখ হল, ছবিঘরে তিনি একা বসে ছবি দেখবেন। ম্যানেজারকে বললেন, তুমি একদিনের সমস্ত আয় আমার কাছে নাও। কিন্তু ম্যানেজার রাজী নয়, তিনি একজনের খেয়ালে অসংখ্য লোক ফেরাতে পারবেন না। নিজাম বাহাদুরেরও জেদ আছে। হলটা তিনি কিনেই নিলেন। ছবি দেখলেন, তারপর বিক্রি করে দিলেন।

স্বাতির বোধ হয় এ গল্প বিশ্বাস হয় নি। কিন্তু সে সন্দেহ প্রকাশ করা উচিত হবে না বলেই নীরব রইল। মামার নিজেরও

যে সন্দেহ ছিল, তা বোঝা গেল তাঁরই কথায়। বললেন : এ সমস্তই গাল-গল্প। বড় লোকের নামে অনেক গল্পই চলে। সত্য মিথ্যা ভগবানই জানেন।

চার মিনারের একটা ইতিহাস আছে। মুহম্মদ কুলি কুতব শাহর আমলে একবার প্লেগে এ দেশ ছারখার হয়ে যাচ্ছিল। একদিন রোগ বন্ধ হল, দেশের লোক হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। রাজা যেমন দেশ জয় করে এসে বিজয়স্তম্ভ তোলেন, কুতব শাহ তেমনি রোগ জয় করে চার মিনার তুললেন। এ গল্প আমরা ইতিহাসে পড়ি নি, শুনলুম স্থানীয় লোকের মুখে। গাড়ি থেকে নেমে তখন আমরা চার মিনার দেখছিলুম।

বাজারের ভিতর ঘণ্টাঘরের মতো একটা সৌধ। সদর রাস্তা দুভাগ হয়ে বেড় দিয়ে আবার মিলে একটা হয়েছে। চারদিকে চারটি খোলা খিলান আর চার কোণায় চারটি মিনার। একশো আশি ফুট উঁচু। মনে হয় না যে ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে এটি তৈরি হয়েছিল।

চার মিনারের নাম আজ ভারতের সর্বত্র প্রচলিত। এই চার মিনার যারা দেখে নি, নামও শোনে নি কোনদিন, তারাও অনেকে চার মিনার বলতে অজ্ঞান। এমন সরস সিগারেট নাকি নেই। এমন সস্তাও নয় কোন সিগারেট। আমার সহকর্মীরা বলে 'ফোর কাস্‌ল্‌স্'। মধ্যবিত্তরা কাঁচি খায়, ক্যাপ্‌স্টান খায়, কিন্তু চার মিনার চলে বড় ঠাকুরের সমাজেও। ধীরে ধীরে নাকি নামছে, একদিন সব স্তরে সমান চলবে।

কয়েক পা এগিয়ে আমরা মক্কা মসজিদ দেখলাম। শোনা গেল, এ মন্দিরও নির্মাণ শুরু করেছিলেন মুহম্মদ কুতব শাহ। কিন্তু শেষ করে যেতে পারেন নি। দিল্লীর বাদশাহ ঔরঙ্গজেব এটি সম্পূর্ণ করেন। কুতব শাহী বংশের শেষ রাজাকে তো তিনিই পরাজিত করেছিলেন। ভিতরে গিয়ে বিস্ময় জাগে। সমস্ত

মসজিদটি পাথরে তৈরি, পালিশওয়ালা প্লাস্টারের কাজ, তার উপর ফ্রেস্কো আর জেনো। একসঙ্গে নাকি দশ হাজার লোক নমাজ পড়তে পারে।

স্বাতি বলল ঃ পায়রা দেখেছ গোপালদা ?

পায়রাও দেখবার মতো। এত অসংখ্য পায়রা বোধ হয় আমরা কোথাও দেখি নি।

এখান থেকে আমরা সালারজং মিউজিয়মে এলুম। ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল, কতক্ষণ পরে আসবে।

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। মামা তার ভাড়া মিটিয়ে দিলেন। বললেন ঃ বেলা একটার মধ্যে ফিরতেই হবে। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার দরকার নেই।

জাদুঘরের টিকিটের দাম একটু বেশি। একখানা টিকিট কাটলে সব ঘরই প্রায় দেখা যাবে, অস্ত্রশস্ত্র ও হীরে-জহরতের ঘর দেখতে আর একখানা টিকিট। শিশুদের মহলের জন্য তৃতীয় টিকিট। অসংখ্য ঘর। দরজার উপরে নম্বর দেওয়া। সেই নম্বর দেখে দেখে ঘুরতে হয়, একের পরে দুই, তারপরে তিন। নম্বরের দিকে নজর না রাখলে গোলকধাঁধা থেকে বেরনো কঠিন হবে।

সালারজং নিজাম বাহাদুরের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। শৌখিন লোক। সারাজীবন ধরে যা সংগ্রহ করেছেন, তাই এখন জাদুঘর হয়েছে। নিজের পৈতৃক বাড়িতেই এই জাদুঘর। ভারত সরকার নিজের হাতে নিয়ে সাধারণের জন্য খুলে রেখেছেন।

আমরা কতকটা রুদ্ধশ্বাসে সব দেখতে লাগলুম। থামবার সময় নেই, ভাল করে ঘুরে ঘুরে দেখাও চলবে না। কয়েকদিন ধরে যা দেখতে হয়, আমরা তার জন্য কয়েকটা ঘণ্টাও পাচ্ছি না। নিতান্ত চোখ ফেরাতে না পারলে আমরা খানিকটা দাঁড়িয়ে দেখছি, আবার ছুটছি।

এ আমাদের কলকাতার মতো জাদুঘর নয়। উল্কার পাথর এখানে নেই, প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীবজন্তুর কঙ্কাল নেই একটাও, নেই মহেঞ্জোদারোর মাটি খুঁড়ে পাওয়া প্রাচীন শিল্পের নমুনা। এখানে যা আছে, তা নিতান্তই বড় লোকের ব্যবহারের জিনিস বা শখের জিনিস। বিচিত্র আসবাব, কিংখাবের পোষাক, ঝাড় লণ্ঠন, পুতুল, ছবি, কী নেই! হাতির দাঁতের সূক্ষ্ম কাজ আছে, কোরাণের এত ছোট বই আছে যা চোখে না দেখলে ধারণা করা যায় না। কত কী যে আছে, তার হিসেব দেওয়া একরকম অসম্ভব ব্যাপার!

সেই ফরাসী যুবকটির কথা আমার মনে পড়ল। ওয়ার্ধা থেকে মহিস্থরে আসবার পর সালারজং মিউজিয়ম সে দেখেছে। তার ভাল লাগে নি। কেন লাগে নি, সে কথাও গোপন করে নি। সে এটাকে একটা বড়লোকের খামখেয়ালি সংগ্রহশালা বলে মনে করে। সুরুচির অভাবও সে লক্ষ্য করেছে।

সুরুচির অভাব?

না না, নিন্দা আমি করছি না। এমন অনেক জিনিস সেখানে দেখলাম, যা এই জাদুঘরে স্থান পাওয়া উচিত ছিল না।

কী রকম?

খুব সস্তা ফুটপাথের জিনিস। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা কিনে খানিকক্ষণ খেলে, তারপর ফেলে দেয়। সে সমস্তও যত্ন করে রাখা হয়েছে।

এ ভদ্রলোকের ভাষার দারিদ্র্য আছে। ভারতবর্ষ দেখবার জন্যেই সামান্য ইংরেজী শিখেছে। যা বলতে চায়, তার সবটুকু এখনও প্রকাশ করতে পারে না। সুরুচির অভাব আমরা দেখি নি, বুঝতে পারলুম যে সে তার মনের মতো কিছু দেখতে পায় নি। অজন্তা-ইলোরা যার ভাল লাগে, ভাল লাগে মহাত্মাজীর সহকর্মীদের, বেলুর আর হালেবিদের পরিত্যক্ত মন্দির দেখেও যে মুগ্ধ হয়, তার রুচি জানতে আমার বাকি নেই। সালারজং মিউজিয়ম

তার ভাল লাগবে কেন! আবাব এই একটি মাত্র জায়গা দেখে পরিপূর্ণ অন্তরে ফিরে যাবার মতো লোকও সব দেশে আছে।

ফেরার পথে গোলকুণ্ডার দুর্গ দেখার সময় আমাদের হল না। সে প্রায় মাইল চারেক দূরে। মামা বললেন: গোপাল তো সঙ্গেই রইল। খেয়ে দেয়ে ওরই মুখে গল্প শুনব।

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে হাসল।

ঘুরে ঘুরে যে দুর্গ দেখতে গোটা একটা দিন সময় লাগে, আমি তার ভিতরের খবর কী বাখি। আমার তো শুধু নামের সঙ্গে পরিচয়। শুধু গোলকুণ্ডা কেন, বিদর বিজাপুর আমেদনগর নামও তো জানি। বাহমনি বংশের ধ্বংসের পর এই সব ছোট ছোট বাজ্য গজিয়ে উঠেছিল। সম্মিলিত ভাবে তারা হিন্দুদের বিজয়নগর ধ্বংস করেছে। তাবপর নিজেরাও একদিন হাবিয়ে গেছে। আজ শুধু হায়দ্রাবাদ আছে বেঁচে। কিন্তু এ সব তো ইতিহাসেব গল্প। এ গল্প সবার ভাল লাগবে কেন!

মামী বললেন: আর কোথাও নয়, সোজা স্টেশনে চল।

স্বাতি বলল: আমরা কিন্তু সেই হোটেলটায় খাব গোপালদা।

উত্তর মামা দিলেন: বহুৎ আচ্ছা।

২৯

স্টেশনে পৌঁছবার আগে একটা সমস্যা জেগেছিল। হোটেলের সামনে আমরা নেমে পড়ব, না স্টেশনে যাব। দূরত্ব কিছুই না। মুখোমুখি না হলেও সামনা-সামনি বলব। মাঝখানে যানবাহন দাঁড়াবার ও চলাচলের জন্য প্রশস্ত জায়গা, আর একটা চওড়া রাস্তা। সেটি পার হতে হয়। মাইলের নয়, ফার্লঙের নয়, মাত্র কয়েক গজের ব্যবধান। মামী বললেন: খাবার আগে মুখ হাত ভাল করে ধুয়ে নাও।

অর্থাৎ স্টেশনে চল।

মামা বললেন: খেয়ে দেয়েই একেবারে স্টেশনে চল না। এই দুপুর রোদে হাঁটাহাঁটিটা বাঁচে।

মামী বললেন: দূর তো কলকাতা দিল্লী, খুবই কষ্টের কথা।

মামার কাছে কষ্টের কথাই। স্টেশনে যাওয়া মানে দোতালার রিটায়ারিং রুমে উঠতে হবে। আবার নামা, আবার ওঠা। খেয়ে দেয়ে গেলে একবারের কষ্ট লাঘব হতে পারে। মামা আমাকে বললেন: গোপাল কী বল?

আমি দুজনের মনটাই দেখতে পাচ্ছি। মামীর পরিচ্ছন্নতা বোধ, আর মামার দৈহিক কষ্ট। স্বাতির দিকে তাকিয়ে দেখলুম, সে আমার অবস্থাটা উপভোগ করছে। বোধ হয় একটু দয়াই হল, বলল: হোটেলে নিশ্চয়ই মুখ হাত ধোবার ব্যবস্থা আছে।

আলবৎ আছে।

এ আমার কথা নয়, মামার কথা। তিনি জোর পেয়েছেন, বললেন: এ না হলে মেয়ের বুদ্ধি।

স্বাতি তাঁর পক্ষ না নিলে মামার অনিবার্য হার হত।

হোটেলে খাবার বিরাট ঘর আছে, তাতে ছোট ছোট টেবল আর চেয়ার ছড়ানো। এ ছাড়াও আছে সারি সারি ছোট ঘর, তাতে চারজন একসঙ্গে খেতে পারে। বেয়ারা এমনি একটি ঘরে আমাদের নিয়ে এল।

অর্ডার ?

কাঠের পার্টিসনে ছাপানো মেনু টাঙানো আছে। স্বাতি বলল : আমি অর্ডার দেব। তার পরেই তার মুখ হল মলিন। মামা লক্ষ্য করেছিলেন, বললেন : কী হল ?

কিছু না। তন্দুরি রুটি আর—

চিকেন ?

না না, চিকেন নয়, মাটন দাও।

মামী বললেন : দাঁড়াও আমি বলছি। কী কী আছে বলত ?

উত্তর বেয়ারা দিল : চিকেন বিরিয়ানি ফাউল রোস্ট—

মামী বললেন : সবই এক এক প্লেট দাও।

স্বাতি আশ্চর্য হল। মার কি আজ মাথা খারাপ হয়েছে যে এক সঙ্গে এক টেবলে বসে মুর্গি খাবেন! নিজের কান দুটোকেই বোধ হয় সে বিশ্বাস করতে পাচ্ছে না।

বেয়ারা চলে যাচ্ছিল, মামী তাকে ডেকে বললেন : আমি মুর্গি খাই নে।

আমি তাকে হিন্দীতে সে কথা বুঝিয়ে দিলুম।

মামী আর স্বাতি পাশাপাশি বসেছিলেন। আস্তে আস্তে স্বাতি বলল : ওসব ফরমাস কেন করলে মা! এক টেবিলে—

স্বাতিকে মামী ধমক দিলেন : তুই থাম।

মামা কী বলবেন ভেবে পেলেন না।

খেয়ে দেয়ে দাম দেবার সময় মামা চটে উঠলেন : ইয়ার্কি পেয়েছ! গণ্ডে পিণ্ডে গিলিয়ে তার এই দাম! আমরা কি ভিখিরি যে দরিদ্র-ভোজন করাচ্ছ!

আশ্চর্য হবার কথাই বটে। মামী যা খেয়েছেন তার দাম দশ আনা। আধপ্লেট করে বিরিয়ানি আমরা খেতে পারি নি। পয়সা নষ্ট হবে বলে আমরা আকণ্ঠ গিলেছি। তার দাম চার টাকাও হল না। খুচরো পয়সা মামা আর ফেরৎ নিলেন না। বললেন: ঐ পয়সায় তোমরা গেলো।

বাহিরে বেরিয়ে পানের দোকান দেখলুম। কিন্তু পেটে আর জায়গা নেই। বললুম: ছোট ছোট করে সাজ, পয়সা পুরোই দেব।

পরে শুনেছিলুম, হায়দ্রাবাদে খাদ্য বেশি। সেখান থেকে অন্যত্র চালান যাচ্ছে। মামা বললেন: এমন জানলে মাইসোরে না থেকে হায়দ্রাবাদেই কদিন থেকে যেতুম।

আমি জানতুম, আমার কাজ শুরু হবে বিটাযাবিং রুমে পৌঁছে। মামা ইজি চেয়ারে বসে পাইপ ধরাবেন। তারপর দেহটা এলিয়ে দিয়ে বলবেন। এবারে শুরু কর। সেই ভয়ে তাঁকে ঘরে পৌঁছে দিয়েই বললুম: আমি একটু ঘুরে আসি।

কোথায় যাবে?

এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রস্তুত ছিলুম না। মিথ্যা কথাও মুখে এল না। বললুম: একটু ঘুরে আসব।

মামা বললেন: কোথায় যাবে সেই কথাই তো জিজ্ঞেস করছি।

স্বাতি আমাকে রক্ষা করল, বলল: মোল্লার দৌড় তো মসজিদ পর্যন্ত। নিচে নেমে বেলের কোন লোক পাকড়াবে। গোপালদার ভাণ্ডার মনে হচ্ছে ফুরিয়ে এসেছে।

মামা নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন: তবু ভাল। আমি ভেবেছিলুম বোধহয় গোলকুণ্ডা যাবে।

গোলকুণ্ডার ভয়েই তো গোপালদা পালাচ্ছে।

ভয় কিসের?

খেয়ে দেয়ে গোলকুণ্ডার গল্প শুনবে বলেছিলে!

গম্ভীর মুখে মামা বললেনঃ তোমার তো এখন যাওয়া হবে না গোপাল, গোলকুণ্ডার গল্পটা আমায় শুনিয়ে যেতে হবে।

মামী একখানা চাদর টেনে খাটের উপর শুয়ে পড়েছিলেন। স্বাতি বসে ছিল তাঁরই পাশে। লুকিয়ে একটা কটাক্ষ করল। ভাবখানা এই যে কী হল এবার!

গোলকুণ্ডার গল্প বলতে হলে বাহমনি রাজ্যের কথা দিয়ে গল্প শুরু করতে হয়। দিল্লীতে মুহম্মদ তুঘলুকের শাসন তখন শিথিল হয়ে গেছে। সেই সুযোগে হাসান নামে এক যোদ্ধা দক্ষিণে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করল। বাহমনি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হল ১৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দে। বাহমনি নাম কেন হল, তা নিয়ে তর্ক আছে। লোকে বলে হাসান তার শৈশবে এক ব্রাহ্মণের ভৃত্য ছিল। সেই কৃতজ্ঞতায় নিজের নাম নিয়েছিল আলাউদ্দীন হাসান বাহ্মন শাহ। কিন্তু ইতিহাস বলে, হাসান নিজেকে প্রাচীন পারস্যের বাহ্মন শাহ নামে এক রাজার বংশধর বলে মনে করতো। ব্রাহ্মণের ভৃত্য হিসেবে যে পরিচয় গোপন রেখেছিল, রাজা হয়ে সেই পরিচয় প্রচার করল।

এই রাজ্যের রাজধানী হল গুলবর্গায়। তার নূতন নাম হল হাসানাবাদ। ১৫১৮ পর্যন্ত এ রাজ্যের চোদ্দ জন সুলতানের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু কারও সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল। রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, আবার অত্যাচার ষড়যন্ত্র নরহত্যা ও হিন্দুবিদ্বেষে এঁদের শাসনকাল কলঙ্কিত। তারই সুযোগ নিয়ে ষোড়শ খ্রীষ্টাব্দে পাঁচটি নূতন রাজ্যের সৃষ্টি হল বাহমনির বদলে—বেরার বিদর আহমদনগর বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা।

বেরার বিদর ও আহমদনগরের ইতিহাস স্বল্পকালের। দাক্ষিণাত্যে তাদের সবচেয়ে বড় কীর্তি হল বিজয়নগর আক্রমণ ও ধ্বংস। নিজেদের তারা দীর্ঘকাল রক্ষা করতে পারে নি। পেরেছিল

বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা। শাহজাহান বাদশাহর সময় এই তুই রাজ্য পরাধীন হবার উপক্রম হয়েছিল। ঔরঙ্গজেব তখন দাক্ষিণাত্যের সুবেদার। তিনিই আক্রমণ চালিয়েছিলেন। কিন্তু পিতার আদেশে যুদ্ধ বন্ধ করতে হয়। শোনা যায়, দারা শাহজাহানকে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন। ঔরঙ্গজেবকে বেশি বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। দারা ঘুষ খেয়ে এই পরামর্শ দিয়েছেন বলেও লোকে সন্দেহ করে।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই তুই রাজ্য আর রক্ষা পেল না। ঔরঙ্গজেব তখন নিজে বাদশাহ। শেষ বয়সে দাক্ষিণাত্যে এসে বসবাস করছেন। তিনি এদের জয় করলেন।

মামা এতক্ষণ নীরবে সব শুনছিলেন। এইবারে বললেন: হায়দ্রাবাদের নিজাম তাহলে কোথা থেকে এলেন?

১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে চিন্-কিলিচ খাঁ নিজাম উল মুল্‌ক্ এই নতুন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সময় তিনি অনেক স্থানে সুবেদারি করেন। দিল্লীর দরবারে প্রধান মন্ত্রীও হয়েছিলেন। এসবে বিরক্ত হয়ে দাক্ষিণাত্যে নিজেই রাজা হয়ে বসলেন।

তখনও মামার ঘুম পায় নি। স্বাতি বলল: গোলকুণ্ডার কথা কিছুই শুনলাম না।

পুরাকালে সমতলভূমির উপর রাজধানী হয়তো স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু তুর্গ কোনদিন হয় নি। দিল্লী আগ্রা শ্রীরঙ্গপত্তনের তুর্গ অনেক পরের যুগের। তার আগে পছন্দ মতো একটা পাহাড় বেছে নেওয়া হত। সেই পাহাড়ের উপর তুর্গ হত তৈরি। গোলকুণ্ডার তুর্গও একটা পাহাড়ের উপরে। তু হাজার ফুট উঁচু একটা ত্রিকোণ পাহাড়ের মাথায় এই তুর্গ। ইতিহাসে এ তুর্গ কুতব শাহী রাজাদের বলেই পরিচিত, কিন্তু পুরাতাত্ত্বিক অন্য কথা বলে। তুর্গের ভিতরে তাঁরা প্রাচীন হিন্দু স্থাপত্যের নমুনা দেখেছেন।

দুর্গের প্রাচীর আজ বিধ্বস্ত। পুরনো হয়ে ভেঙ্গে পড়ে নি, ভেঙ্গেছে অবরোধে যুদ্ধে। দাক্ষিণাত্যে শান্তিতে আর কে কবে রাজ্য করেছে! দুর্ধর্ষ ঔরঙ্গজেবও তো এই দুর্গের উপর হানা দিয়েছিলেন। জয় করতে পারেন নি। দশ বছর পরে যে জয় করেছিলেন, সে তো শক্তি দিয়ে নয়, সে কৌশলে। এ গল্প শুনতে হলে গোলকুণ্ডার দুর্গে যেতে হবে।

স্বাতি বলল না যে চল দুর্গে যাই। একথাও বলল না যে তোমার মুখেই গল্প শুনব। বললুম: এই দুর্গের কাছেই গোলকুণ্ডার কবর। কুতব শাহী রাজারা সব মাটির নিচে শুয়ে আছে।

আমি দেখছিলুম, স্বাতি মামার চোখের দিকে চেয়ে আছে। মামীকে দেখবার দরকার নেই। তিনি চাদর দিয়ে চোখ পর্যন্ত ঢেকে ফেলেছেন। স্বাতি বলল: তোমার বিজাপুরের গল্প কি বেশি বড়?

কেন বল তো?

যদি ছোট হয় তো তাড়াতাড়ি শুনিয়ে দাও।

আর বড় হলে?

বিকেলের জন্যে থাক।

বললুম: ইতিহাস শোনবার তো দরকার নেই, যা দেখবার আছে তাই বললেই যথেষ্ট। সে আর কতটুকু সময়!

মামা বললেন: আমার ঘুমের কথা ভেবো না। একটা দুপুর আমি বসেও কাটাতে পারি।

হঠাৎ তাঁর মাদ্রাজের কথা মনে পড়ল। বললেন: একটা দুপুর কি ট্যাক্সিতে বসে কাটাই নি!

তা কাটিয়েছেন। কিন্তু শোবার ভাল ব্যবস্থা থাকলে কেনই বা শোবেন না!

মামার পাইপে তখনও খানিকটা ধোঁয়া ছিল। ছাই ঝেড়ে ফেললেই যে তাঁর শুতে ইচ্ছে করবে, তা আমি জানি। তাই

বললুম : বিজাপুরে এখন সবাই গোল গুম্বজ দেখতে যায়। শ্রীরঙ্গপত্তনের মতো এই গুম্বজও একটা কবর। বিজাপুরের সুলতান মুহম্মদ আদিল শাহের। নিচের বাঁধানো চত্বর ছ শো বর্গফুট। চারিদিকে চারটি মিনার সাততলা উঁচু। মাঝখানে বিরাট গম্বুজ, একশো চব্বিশ ফুট চওড়া তার ব্যাস। পৃথিবীতে এর চেয়ে বড় গম্বুজ আর নাকি একটি আছে। কোথায় তা জানি নে।

স্বাতি বলল : ভিতরে কিছু দেখবার নেই ?

আছে বৈকি। লোকে তাকে হুইস্পারিং গ্যালারি বলে। ফিস ফিস্ শব্দ, আর একাধিক প্রতিধ্বনি।

সে আবার কী ?

তাহলে গিয়ে দেখতে হবে। গম্বুজের এক দেওয়ালে ফিসফিস করে কথা কইলে একশো চব্বিশ ফুট দূরের দেওয়ালেও কান পেতে তা পরিষ্কার শোনা যায়।

গিয়ে যখন শোনা আর হবে না, তখন আর কী দেখবার আছে বল।

সান ফোর্ট, সাত মঞ্জিলি, ইব্রাহিম রোজা, জুম্মা মসজিদ, মেহতার মহল, আসর মহল, গগন মহল, সবগুলো জায়গার বর্ণনা দিতে পারব না। শুধু গগন মহলের কথা জানি। আদিল শাহী মহল আর নেই। এখন নব্বুই ফুট খিলান একটা আছে। এরই নিচে দিয়ে নাকি বিজাপুরের শেষ সুলতানকে বিজয়ী ঔরঙ্গজেবের সামনে আনা হয়েছিল।

তাজ বাউরি আর চাঁদ বাউরি নামে দুটো সুন্দর পুষ্করিণী আছে। আর আছে দুটো কামান। তার একটার নাম মালিক-ই-ময়দান। তালিকোটের যুদ্ধে নাকি এটি ব্যবহার করা হয়েছিল।

মামা বোধ হয় ঝিমচ্ছিলেন। বললেন : ইতিহাসের গন্ধ না থাকলে গল্প কিছুতেই জমে না।

আদিল শাহী ইতিহাস তো দুশো বছরের। তার আগে হিন্দুদের

ইতিহাস আছে। তখন বিজাপুরের নাম ছিল বিজয়পুর। আর কল্যাণপুরার চালুক্যদের অধীন ছিল এই শহর। সে একাদশ শতাব্দীর কথা। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ছিল দেবগিরির যাদবদের অধীন। হিন্দু অধিকার গেল মালিক কাফুরের হাতে চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়াতেই আলাউদ্দীন খিলজীর পুত্র করিম উদ্দীন হলেন বিজাপুরের শাসনকর্তা। তারপর বাহমনী অধিকার।

মোগল বাদশাহর পরে নিজামের হাতে। তাঁর হাত থেকে মারাঠাদের হাতে। তারপরে সাতারার রাজাদের হাতে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্রিটিশের অধিকার কায়েম হল।

স্বাতি হাসছিল। আমি তার হাসির অর্থ না বুঝে বিস্মিত হলুম। তারপরে আমিও হাসলুম। মামা ঘুমিয়ে পড়েছেন।

স্বাতি উঠে গিয়ে তাঁর হাত থেকে পাইপটা সংগ্রহ করল। রেখে দিল টেবলের উপর। আস্তে আস্তে বলল ঃ চল এইবারে।

কিন্তু দরজা যে খোলা থাকবে!

দুপুর রোদে টৈ টৈ করতে বেরিও না।

মামার আদেশ শোনা গেল চাদরের নিচে থেকে। স্বাতি বলল ঃ আমরা বাইরে বারান্দায় বসছি।

৩০

রিটায়ারিং রুমের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে আমরা বাহিরে এলুম। স্বাতি বলল ঃ এখানকার ওয়েটিং রুম দেখছি ভারি পরিচ্ছন্ন।

উপর তলায় ওয়েটিং রুম পরিচ্ছন্ন হওয়াই উচিত। উপর তলার নিয়মই তাই। যত ময়লা, সব নাকি নিচের তলায়। সরকার তা একতলা বস্তি রাখবেন না। শুনতে পাচ্ছি, এবারে কলকাতার বস্তি হবে কয়েক তলা উচু। তাহলে আর নোংরামি থাকবে না। বললুম ঃ মনে হচ্ছে। তুমি এরই অপেক্ষা করছিলে।

কিসের অপেক্ষা ?

ইচ্ছে হল বলি, এই অভিসারের। কিন্তু মুখে আটকে গেল। পরিচয়ের পুঁজি খুব ভারি নয়। সৌজন্যের অভাব হলে হয়তো বড় কিছু হারাতে হবে। তাই সযত্নভাবে বললুম ; এমনি করে বেরিয়ে পড়বার।

এ কথা মনে করবার কোন কারণ ঘটেছে ?

অনেকবার হল কি না। ত্রিচিতে ব্যাঙ্গালোরে—

তারপর ?

আর মনে পড়ছে না।

আমার কী মনে হচ্ছে জান ?

জানি নে।

তুমি গোপালদা না হয়ে আর কেউ হলে আমার অনুসরণ করতে না।

হাত ধরে টেনে আনত, তাই না !

স্বাতি উত্তর দিল না, প্রতিবাদও করল না। আমার মনে হল,

নীরব থেকে স্বাতি আমাকে তার ক্ষোভের কথা জানিয়ে দিল। এর পরে আমি কী বলব, ভেবে পেলুম না।

স্টেশনের বাহিরে প্রখর রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করছে। ভিতরের প্ল্যাটফর্মে অনির্দিষ্টকাল পায়চারি করা চলে না। কাজেই আমাদের ওয়েটিং রুমে এসে বসতে হল। সমুদ্র সৈকত হলে কবিত্ব করতে পারতুম, পাহাড় হলেও কল্পনা-বিলাস চলে। কিন্তু পথে ঘাটে হাটের মাঝে কি মনের দোর খোলে! টেবিলের কাছ থেকে দু খানা চেয়ার সরিয়ে নিয়ে আমরা পাশাপাশি বসলুম। স্বাতিকে বড় অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে।

হঠাৎ আমার ঘরের কোণার দিকে নজর পড়ল। এক দম্পতি মুখোমুখী বসে গল্প করছেন। ভারতবর্ষের কোন্ প্রান্ত থেকে এসেছেন, তা বোঝবার উপায় নেই। কেননা পুরুষের বিলিতি পোষাক আর স্ত্রীর ভারতীয় শাড়ি। বাঙালী হলে সিঁথিতে সিঁদুর থাকবে, কিন্তু পাশ থেকে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আমি তাঁদের দিকে তাকিয়ে বয়সের অনুমান করতে লাগলুম।

মহিলার পরিধানে সূক্ষ্ম রেশমি শাড়ি, হাওয়ায় উড়ছে, ঘরের পাখা বন্ধ নয়, অল্প করে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই হাওয়াতেই আচল খসে পড়ছে। মহিলা তাঁর নিজের হাত বাড়িয়ে বুকের আঁচল তুললেন না। ভদ্রলোক উঠে এসে আচল তুলে দিলেন।

স্বাতি বলল : অমন হাঁ করে কী দেখছ?

ঐ মহিলাকে দেখছি, আর বুঝতে চেষ্টা করছি যে কে কাকে হাত ধরে টেনে এনেছে।

মহিলাদের দিকে তো তুমি কখনো তাকাতে না?

সত্যি কথা।

তবে আজ কেন হ্যাংলার মতো তাকাচ্ছ?

হ্যাংলামি করি না বলেই তো আমার বদনাম।

ও কাজ করলে আরও বেশি বদনাম হত। ভদ্রলোকের বাড়িতে ঢুকতে পেতে না।

এমনিতেই কি পাই! মোল্লার দৌড় তো মসজিদ পর্যন্ত—ট্রেনের কামরা আর এই ওয়েটিং রুম। এরই মধ্যে গাছের খাওয়া আর তলার কুড়নো। পেট ভরে খেতে গেলে তো তলার কুড়বো?

এ সব বুদ্ধি তোমার নতুন হয়েছে দেখছি!

বললুম তো, এই বুদ্ধির অভাবেই নিন্দা হচ্ছে।

এবারে দেখলুম, স্বাতিও সেই মহিলার দিকে তাকিয়েছে। বেশ ভারি চেহারা, কিন্তু তা লুকোবার চেষ্টা করছেন। অধোবাস একটু উৎকট দেখাচ্ছে। স্বাতি আমাকে বলল: ওদিকে তাকিয়ো না।

কেন বল তো?

অশোভন আচরণ।

আমার, না তাঁর?

স্বাতি বুঝি রাগ করেই বলল: দুজনেরই।

এই সময়ে মহিলা তাঁর মুখ ফেরালেন। আমি চমকে উঠলুম। প্রসাধন বললে ঠিক বোঝাবে না, মহিলা রঙ মেখেছেন। স্নো পাউডারের প্রলেপ তো অনেক আগে থেকেই দেখতে পাচ্ছিলুম, এবারে গালের আর ঠোঁটের রঙও দেখতে পেলুম। ভ্রূ নেই, চোখের উপর দুটো কালো দাগ দেখতে পেলুম। রূপের কথা বলব না। বিধাতার দান নিয়ে মন্তব্য করা উচিত নয়। চোখ আমি ফিরিয়ে নিয়েছিলুম। তবু মনে হল, মহিলা তাঁর থলির ভিতর থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছলেন। রুমালখানা পড়ে গেল?

তাকিয়ে দেখি, ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠে সেখানা মেঝে থেকে কুড়িয়ে তুললেন, কিন্তু মহিলার দিকে এগিয়ে দিতেই তিনি নাক সেঁটকালেন। সঙ্কুচিতভাবে ভদ্রলোক হাত গুটিয়ে বাথরুমের দিকে চলে গেলেন।

আমি নজর রেখেছিলুম। দুহাতের আঙুলের ডগা দিয়ে ভিজে রুমালখানা ধরে ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। চেয়ারে বসেও সেখানা নাকের উপর নাড়তে লাগলেন। হাওয়ায় শুকোবে।

এবারে ভদ্রলোককে দেখা দরকার। নিঃসন্দেহে তাঁর বয়স হয়েছে, কিন্তু কত তা অনুমান করা শক্ত। মাথার চুল একটু বেশি কালো, দাঁতও একটু সাদা বেশি। তিনি যদি কলপ দেওয়া চুল আর বাঁধানো দাঁত বলেন, তাহলেও বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে না।

স্বাতি বলল ঃ শোন।

কিন্তু আমার দৃষ্টি আবার মহিলার দিকে পড়েছে। তাঁর শাড়িব আচল খসে পড়েছে। ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। রুমালের একটা কোণা ছেড়ে দিয়ে আচলের একটা কোণা ধরলেন। নিজের হাত দুখানা নামিয়ে মহিলা তাঁকে আচল তুলে দেবার সুবিধা করে দিলেন।

ঘরের আরও কোন যাত্রী কি এঁদের লক্ষ্য করছে! বোধহয় কেউ নয়, কিংবা তাঁদের কৌতূহল শেষ হয়ে গেছে। ঘরে যাঁরা আছেন, তাঁবা চোখ বুজে বিশ্রাম নিচ্ছেন।

স্বাতি বলল ঃ কী করছ বলত ?

চোখ যে ফেরাতে পারছি নে!

তবে এস, আমরা ঘুরে বসি।

বলে সত্যিই সে তার চেয়ার ঘুরিয়ে নিল।

আমিও ঘুরে বসে বললুম ঃ কাজটা ভাল হল না।

কেন ?

প্রথমত অশোভন হল, আর দ্বিতীয়ত এবারে নিজেদের কথা ভাবতে হবে।

তাকিয়ে থাকার চেয়ে মুখ ফিরিয়ে থাকা বেশি অশোভন হবে না। আর ভাবনার কথা! পরের ভাবনা আমরা কেন ভাবতে যাব!

কাজেই নিজেদের ভাবনা ভাবব।

স্বাতি আর তর্ক করল না। তার কাজের কথা ছিল, বলল ঃ তোমার পূজোর ছুটি কত দিন ?

সে বোধহয় ফুরিয়ে গেছে।

তবে কী হবে ?

স্বাতির ভাবনা দেখে আমার হাসি পেল। বললুম ঃ চাকরিটা যাবে।

গম্ভীরভাবে স্বাতি বলল ঃ সত্যি বলছ ?

যাওয়া উচিত, কিন্তু যায় না। সরকারী চাকরির নানা আইন কানুন, নানা মারপ্যাচ। কারও চাকরি যেতে যত কষ্ট স্বীকার করতে হয়, তার চেয়ে পরিশ্রম কম জ্বালাতন সহ্য করায়। ইচ্ছে করে আসি নি বললে মাইনে দিও না। দু টাকা দিয়ে ডাক্তারের সার্টিফিকেট কিনে দিলে সাত খুন মাপ। এ সব বিষয়ে আমাদের কোম্পানী ভাল। অত শত বাঁধাবাধি নেই। ট্যা-ফোঁ করলেই তাড়িয়ে দেবে।

ফিরে গিয়ে তুমি কী বলবে ?

সত্যি কথাই বলব। সঙ্গী এমন ভাল পেয়েছিলুম যে ফিরে আসতেই ইচ্ছে ছিল না।

তামাসা রাখ।

তামাসা কেন বলছ! তোমারই কি আজ ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে, না ফিরে গিয়ে তোমার ভাল লাগবে!

তুমি বেশ মন-গড়া কথা বলতে পার।

মনের কথা মনই গড়ে। নিজের মনের কথা যদি সত্যি হয় তো পরের মনের কথাই বা কেন মিথ্যে হবে!

পরকে চেন না বলে।

আর যাকে চিনি ?

তাকে সারাক্ষণই ভুল বোঝ।

বললুম ঃ একটা সত্যি কথা বলবে ?

আমি তো মিথ্যা বলি না।

উত্তর তাহলে এড়িয়ে যেয়ো না।

বললুম ঃ অঘ্রাণে কি সত্যিই তুমি বিয়ে করছ ?

স্বাতি হেসে বলল ঃ এ তো আমার ব্যক্তিগত প্রশ্ন। তোমার দরকার ?

তোমার ব্যক্তিগত বলেই জানতে চাইছি। তুমিও তো আমার ব্যক্তিগত কথা জেনে নিলে।

সব কি জেনেছি ! জানবার কথা তো সবই রয়ে গেছে।

অঘ্রাণে যদি তোমার বিয়ে না হয় তো সবই জেনে নেবার সুযোগ পাবে।

বিয়ে হলে বুঝি সুযোগ পাব না ?

কী করে পাবে ? দুদিন পর পরের স্ত্রী হবে জেনেও কি সব কথা বলা যায় ?

স্বাতির দৃষ্টিতে অপরিমিত পুলক দেখলুম। বলল ঃ হিংসে হচ্ছে তো !

তারপরেই বলল ঃ ভাবনা কিসের, তোমারও বিয়ে হবে।

স্বাতি সত্যিই আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেছে। বললুম ঃ আমার প্রশ্নের উত্তর এখনও পাই নি।

তোমার দরকারটা প্রমাণ করতে পার নি।

এ রকম কোন চুক্তি ছিল না।

আমি বাজে কথা আলোচনা পছন্দ করি না।

আমার প্রয়োজনটা যদি বেয়াড়া হয় ! যদি বলি—

থাক থাক, বলতে হবে না।

স্বাতি আমায় থামিয়ে দিল।

হেসে বললুম ঃ এবারে বল।

কিন্তু বলবার সুযোগ সে পেল না। ওধারে সেই মহিলার চাপা গর্জন শুনে আমরা ফিরে তাকালুম। মহিলার হাতে এক গ্লাস জল, সেই জল তিনি দেওয়ালের গায়ে ছুঁড়ে ফেললেন। ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন চোরের মতো। বুঝতে কষ্ট হল না যে স্বামীর গড়িয়ে

দেওয়া জল মহিলার পছন্দ হয় নি। ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীর হাত থেকে গেলাসটা সংগ্রহ করে ফ্লাস্কের মাথায় পেঁচিয়ে রাখলেন। তারপরে বাহিরে ছুটে গেলেন। তার হাঁকডাকও শুনতে পেলুম। রিফ্রেশমেণ্ট রুমের বেয়ারাদের বোধ হয় ডাকাডাকি করছেন।

চুপি চুপি স্বাতি বলল: প্রার্থনা করি, তোমার এমনি একটি বউ হোক।

ও তো দশ বছর পরের অবস্থা।

মানে?

প্রজাপতির কথা শোন নি বুঝি?

না।

প্রজাপতি সবই লিখে রেখেছেন। বিয়ের পর প্রথম দশ বছর স্বামী কথা কইবে আর স্ত্রী শুনবে, আর তার পরের দশ বছর স্ত্রী কথা কইবে আর স্বামী শুনবে। তারপর স্বামী স্ত্রী তুজনেই কথা কইবে, কিন্তু কেউই শুনবে না।

স্বাতি তার ছোট রুমালখানা মুখে চেপে হেসে উঠল। বললুম: এই প্রবাদটা আমি একটু বদলে দিতে চাই। প্রথম দশ বছর স্বামী কবিতা শোনাবে আর স্ত্রী শুনবে, পরের দশ বছর স্ত্রী 'সারমন' দেবে, মানে উপদেশ—

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল: বিয়ের আগে কী হবে বললে না?

গম্ভীরভাবে বললুম: প্রজাপতির যুগে তো পূর্বরাগ ছিল না। তাই তিনি কিছু লিখে যান নি। বলতে সাহস হচ্ছে না যে তুজনেই কথা কইবে আর তুজনেই শুনবে। নিজেদের অভিজ্ঞতার জন্যে অপেক্ষা করে থাকতে হবে।

আবার হঠাৎ সোরগোল উঠল। সোরগোল কেন, মনে হল একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। কাচের গ্লাসে বরফ জল নিয়ে বেয়ারা আসছিল। ওধারের ভদ্রলোক ছুটে যাচ্ছিলেন, দেওয়ালের ধারে জলের উপর তাঁর পা হড়কে গেছে। পড়ে যান নি, কিন্তু দেওয়ালে তাঁর মাথা

ঠুকে গেছে। ব্যাপারটা এত অল্প সময়ে ঘটল যে আমরা সবাই চমকে উঠেছিলুম। যাত্রীরা যাঁরা জেগে ছিলেন, তাঁরা হায় হায় করে উঠেছেন, বেয়ারা হতভম্ব হয়ে গেছে। স্বাতি আমার হাত টেনে না ধরলে আমি হয়তো ছুটে চলে যেতুম।

পরে বুঝলুম যে স্বাতি আমার হাত চেপে ধরেছে সঙ্গত কারণে। ভদ্রলোক কপালে হাত দিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়েছিলেন। আর তাঁর স্ত্রী এবারে তৎপর হয়ে উঠেছেন। বেয়ারার হাতের জলে রুমাল ভিজিয়ে স্বামীর কপালে ধরেছেন চেপে। তাঁর রেশমি শাড়ির হাল্কা আচল খসে পড়বার আগেই একটা কোণা কোমরে গুঁজে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

স্বাতি আমার হাত ছেড়ে দিল তার বিস্ময়ের ঘোর কাটবার পর। বলল: কী যে কর, বুঝি নে।

বসে বসে মুখ ফিরিয়ে আমরা দেখলুম যে ভদ্রলোক অনেকটা সুস্থ বোধ করছেন। তার কপালটা কেটে যায় নি। একটু ফুলে উঠেছে মাত্র। বেয়ারাকে আর এক গ্লাস জল আনতে বললেন।

মহিলা যখন তাঁর চেয়ারে ফিরে এলেন, তখন তাঁকে বড় অসুস্থ বোধ হল। গায়ের জামা ভিজে দেখাচ্ছে, মুখের রঙও মনে হল অনেকটা মুছে গেছে। বিড়বিড় করে কী বললেন, শোনা গেল না।

এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে তিনি স্নানের ঘরে গেলেন। ভদ্রলোক দেখলুম, ছোট একটা এটাচি কেস তাঁকে পৌঁছে দিয়ে এলেন।

আমার কৌতূহলের সীমা নেই। স্বাতিকে বললুম: তুমি একটুখানি একা বস, ব্যাপারটা আমি বুঝে আসি।

বলে সেই আহত ভদ্রলোকের কাছে গেলুম।

আপনাকে কিছু সাহায্য করতে পারি?

আমি ইংরেজীতে প্রশ্ন করেছিলুম, কিন্তু ভদ্রলোক উত্তর দিলেন বাঙলায়, বললেন—আমাকে?

এবারে আমিও বাঙলায় বললুম: আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

তা হবে। সারা রাত ট্রেনে কেটেছে, রিটায়ারিং রুমে জায়গা পাই নি। সন্ধ্যাবেলায় জায়গা পাবার ভরসা পেয়ে স্টেশনেই বসে আছি। বাইরে যা রোদ!

ভদ্রলোক বোধ হয় স্ত্রীর কথা ভেবেই বেরতে সাহস পান নি। বললুম: বেড়াতে এসেছেন বুঝি?

কতকটা তাই। বম্বে এসেছিলুম কেনাকাটা করতে। উনি বললেন, হায়দ্রাবাদেও কিছু কেনবার আছে। ঐ যে কী বলে আপনাদের—সুতোর শাল—

নামটা ভদ্রলোক মনে করতে পারলেন না।

কেনা কাটা হয়ে গেছে বুঝি?

পাগল হয়েছেন! এই তো পৌঁছলুম। দশটার বদলে প্রায় বারোটায়। রাতে থাকবার একটা ব্যবস্থা হোক, তারপর দেখব।

কেন জানি না ভদ্রলোকের জন্য আমার [illegible] হল। বললুম: আমি আপনার ব্যবস্থা করে দেব।

ভদ্রলোক সোজা হয়ে বসলেন, বললেন: সত্যি বলছেন?

আশ্বাস দিয়ে বললুম: আমাদের রিটায়ারিং রুম আমরা পাঁচটার পরেই ছেড়ে দেব। আপনার জিনিসপত্র [illegible] আপনার নাম লিখে তবে ছাড়ব।

ভদ্রলোক আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরলেন, বললেন: কী বলে আপনাকে ধন্যবাদ দেব জানি নে।

তার দরকার নেই।

একটু ইতস্তত করে ভদ্রলোক বললেন: হায়দ্রাবাদ আপনাদের দেখা হয়ে গেছে?

যতটা পেরেছি দেখেছি।

এখানে একটা বিখ্যাত দরগা আছে শুনেছি, পীরের দরগা।

দরগা! কোন দরগা তো দেখি নি। চার মিনার আর মক্কা মসজিদ দেখেছি।

ভদ্রলোক বললেন : বম্বেতে শুনলুম, হায়দ্রাবাদের দরগায় পীরের সিন্নি দিলে যে কোন মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

সত্যি!

সত্যি বলেই তো অনেকে বিশ্বাস করে!

এই দম্পতি এখানে কেন এসেছেন, আমার সে কথা বুঝতে আর দেরি হল না। সুতোর শাল একটা ছল মাত্র। তার আড়ালে গভীর বেদনা আছে। এতক্ষণ ধরে যা দেখছিলুম, তা এই বেদনারই বিষম ক্রিয়া। এক সময় আমি বিদায় নিয়ে উঠে এলুম। ভদ্রলোক আমার প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিলেন।

ভেবেছিলুম, স্বাতিকে এদের সব কথা বলব। কিন্তু বলতে পারলুম না। মানুষের বেদনা নিয়ে পরিহাস চলে না। চায়ের টেবিলে মামাকে বললুম এদের প্রয়োজনের কথা। মামা রাজী হলেন। বললেন : এখনি ওঁদের আসতে বল না।

স্বাতির মুখে যেন হাসি আর ধরে না। মামী বললেন : অত হাসছিস কেন!

ওঁরা ঘরে এলেই দেখতে পাবে।

দেখে আমার দরকার নেই। আমি বেরুলে তোমাদের যা ইচ্ছে ক'রো।

আমি দেখলুম, হাসিতে স্বাতির বিষম লাগার উপক্রম হয়েছে। ব্যস্তভাবে তার রুমাল খুঁজছে জামার ভিতর। কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছে না। কেন জানি না, আমি আমার রুমালের জন্যে পকেটে হাত দিয়েছিলুম। ছোট একখানা হাল্কা জিনিস আমার হাতে ঠেকল। অনুমানে মনে হল, ওটা স্বাতিরই রুমাল। কিন্তু আমার পকেটে এল কী করে? আমি তো চেয়ে নিই নি, সেও নিশ্চয়ই দেয় নি। দিলে সে কেন অমন করে খুঁজতে যাবে। রুমাল না পেয়ে সে আঁচলের প্রান্তেই মুখ মুছল।

আমি স্মরণ করবার চেষ্টা করলুম। ওয়েটিং রুমের ভদ্রলোক যখন আঘাত পেয়েছিলেন আমি তখন স্বাতির হাতে রুমাল দেখেছি। গন্ধ পেয়েছি চন্দনের আতরের।

তারপর ?

তারপরের কথা আর মনে পড়ছে না।

বিকেল পাঁচটার পরেই আমরা সেই বাঙালী দাম্পতিকে ঘর ছেড়ে দিলুম। আর্দ্র চোখে ভদ্রলোক অজস্র ধন্যবাদ দিলেন। আমাদের ঔরঙ্গাবাদের গাড়ি ছটার পরে ছাড়বে।

ঔরঙ্গাবাদের গাড়িতে গুছিয়ে বসেই মামা বললেন : আমাদের এবারের যাত্রা প্রায় শেষ হয়ে এল।

মামী বললেন : তোমাদের শেষ কি আর কোন দিন হবে? বাড়ি পৌঁছতে না পৌঁছতেই বলবে, চল, দিল্লীতে দরবার বসছে।

তবে এখান থেকেই দিল্লী চল।

স্বাতির বিয়ে বুঝি দিল্লীতেই দেবে?

একথার উত্তর মামা দিলেন না। কিন্তু মামী তাকে নীরব থাকতে দিলেন না, বললেন : তোমার মতলবখানা কী?

মতলব খারাপ নয়। একটি মাত্র সন্তান। সে যাতে সুপাত্রে পড়ে, তার চেষ্টার ত্রুটি করব না।

মামার উত্তরটি আমার ভাল লাগল। সবচেয়ে সত্য কথাটি বললেন, অথচ তার মনের কথাটি ধরা গেল না। মামী বিরক্ত হলেন।

স্বাতি বলল : ঔরঙ্গাবাদ থেকেই আমরা অজন্তা আর ইলোরা দেখব, তাই না?

আমি বললুম : হ্যাঁ।

তারপরে?

তারপর সোজা কলকাতা।

মামা আমাদের দলে যোগ দিলেন, বললেন : আর ক'দিন এমন চলবে?

আমি হিসেব করে বললুম : আজ বাদ দিলে আর দু'দিন, তারপর আমরা কলকাতার ট্রেনে উঠব।

আমাদের এই আনন্দের দিনগুলোর উপর চিরদিনের মতো

যবনিকা পড়বে। ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়েই আছে, শুধু সবার ফেরার অপেক্ষা। দেখতে দেখতে বিয়ের বাজার শুরু হবে। নিমন্ত্রণ পত্র, বাড়ি বাড়ি ঘোরা। রসুনচৌকি, ছাঁদনা তলা। তারপর আর স্বাতিকে দেখতে পাব না। এমন সময় তার সঙ্গে দেখা না হলে কি চলত না!

কিন্তু আমি তো কিছুর প্রত্যাশা করে বের হই নি। আমি বেরিয়েছিলুম এই পরিবারকে সাহায্য করতে। যথাসাধ্য সাহায্য করেছি। কর্তব্য পালন করেছি নিষ্ঠার সঙ্গে। এতেই তো আমার তৃপ্তি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কেন হচ্ছে না! কেতকার মতো বুকে যে কী বিঁধছে। সৌরভের চেয়ে কাঁটার বেদনা আজ বেশি মনে হচ্ছে।

স্বাতি কিছু বলতে চাইল না, কিছু হয়তো বলবেও না। তার দরকার মনে করে নি। সে জানে যে ভাবালুতার বানে গা ভাসিয়ে দেওয়া চলে না। জীবনের একটা গভীর অর্থ আছে। তার নানা সমস্যা নানা প্রয়োজন। মনের বদলে বুদ্ধি দিয়ে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। জীবনে গোঁজামিল চলে না, শখ খেয়ালে প্রশ্রয় দিলে পরে পস্তাতে হবে।

মামা বললেন: গোপাল কী ভাবছ?

কিন্তু উত্তর দেবার সময় আমি পেলুম না। এক ভদ্রলোক হুড়মুড় করে গাড়ির ভিতর উঠে পড়লেন। সঙ্গে শুধু বিছানাপত্রই নয়, দুটো বড় বড় বস্তা। কুলিতেই গাড়িটা ভর্তি হয়ে গেল।

মামী আর্তনাদ করে উঠলেন, মামা বললেন: এ কী হল?

আমি রুখে দাঁড়ালুম: এ রিজার্ভড্ গাড়ি।

আমি ইংরেজীতে বলছিলুম, কিন্তু ভদ্রলোক হাত জোড় করে হিন্দীতে উত্তর দিলেন: দোহাই আপনার, ভর সন্ধ্যের ভয় দেখাবেন না। রাত দশটায় কান ধরে নামিয়ে দেবেন।

এত মালপত্র কেন, কোথায় রাখবেন এসব?

যদি আদেশ দেন তো ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই।

আমি কেন আদেশ দেব?

আদেশ না দেন তো এক টুকরো কাগজে লিখেই দিন।

কী লিখব?

আপনি ফেলে দিয়েছেন।

এ তো আরও মারাত্মক কথা।

তা না হলে আমাব কোম্পানী মানবে না, বলবে বেচে খেয়ে ফেলেছ।

জিজ্ঞাসা করলুম: কী আছে ওর ভিতরে?

দেখবেন! আচ্ছা দেখাচ্ছি আপনাকে।

ভদ্রলোক নিজের জিনিসপত্র সব সাজিয়ে রাখলেন, কুলিদেব পয়সা মেটালেন গুনে গুনে। তারপর একটা বস্তার মুখ খুললেন তার ভিতবের জিনিস বার করবার জন্যে।

স্বাতি উঠে গিয়ে মামীর কাছে বসেছে। আর মামা হয় তো নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না। আমিও হতাশ হয়ে নিজের জায়গায় ফিবে এসেছি।

ভদ্রলোক কতগুলো লোহার যন্ত্রপাতি বার কবলেন। তাবই থেকে একটা আমাব হাতে দিয়ে বললেন: বলুন তো, এটা কী।

হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে বললুম: এ বকম জিনিস সাইকেলেব চাকায় দেখেছি।

ঠিক ধরেছেন। এব নাম হাব্। সরুটা সামনেব চাকার আব পিছনের চাকার জন্য এই মোটা আকারেরটা।

বলে আর একটা হাব্ আমার হাতে দিলেন।

তা এগুলো নিয়ে আপনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন?

সেই কথাই তো আপনাকে বোঝাচ্ছি।

গাড়িটা দুলে উঠল। বোধ হয় ছাড়ছে। ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে দিলেন। একধারে নয়,

দুধারেই লাগালেন। বললেন: তাড়াতাড়ি ভাল করে এঁটে দিই, তা নাহলে আবার কোন শর্মা হয় তো উঠে পড়বে।

আপনার নাম বুঝি শর্মা?

এই কেলেঙ্কারি!

ভদ্রলোক গাড়ি ছাড়তে দেখে নিশ্চিন্ত হলেন, তারপর আমার পাশে এসে বসলেন। বললেন: সব জায়গায় আজকাল এই কেলেঙ্কারি করে ফেলছি। একটু জল আছে স্যর?

মামীর মুখের দিকে চেয়ে আমার আতঙ্ক হল। নিজেদের গ্লাসে দিলে সে গ্লাস জানালা দিয়ে ফেলে দিতে হবে। বললুম: আপনার গ্লাস আছে?

ভদ্রলোক উঠে গিয়ে তার ঝোলা থেকে একটা ঘটি বার করলেন, আমিও আমাদের কুজো থেকে তাকে জল ঢেলে দিলুম। ভদ্রলোক তৃপ্তির সঙ্গে অনেকটা জল খেলেন। তারপর মুখ মুছে বললেন: ব্রাহ্মণত্ব আর কিছু রইল না।

ঘটিটা ঝোলায় রেখে গল্প করতে ফিরে এলেন।

গাড়ি ছাড়বার পরেই ভদ্রলোক তাঁর যন্ত্রপাতি বস্তায় পুরে মুখ বেঁধে ফেলেছিলেন। এই তৎপরতা দেখে আমার বুঝতে বাকি ছিল না যে আমাদের ভুলিয়ে রাখবার জন্যেই এ সব বার করার প্রয়োজন হয়েছিল। তাঁর হয়তো ভয় ছিল, আমরা তাকে বার করে দেবার চেষ্টা করব, অন্তত তার বস্তা দুটো। এ জিনিস সঙ্গে নেবার অধিকার নেই, অথচ সেসব কিছুই করা সম্ভব হল না। শেষটায় আপোস করতে হল, বললুম: কী কেলেঙ্কারির কথা বলছিলেন?

ভদ্রলোক এখন অন্য মানুষ। প্রচুর গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন: নামের। বাপের দেওয়া নাম হল শ্রীরামচন্দ্র শর্মা। বিলিতি কায়দায় আমরা লিখি আর. সি. শর্মা। এটা আমার প্রাইভেট নাম, মানে আত্মীয় বন্ধুর জন্য। একবার চাকরি করব বলে সরকারের খাতায় নাম লিখিয়েছিলাম। বিজ্ঞজনের পরামর্শে লিখেছিলাম এস.

রাম। ঐ রাম শব্দটির ভিতর নাকি বহু যুগের অত্যাচার ও বঞ্চনার ইতিহাস লুকিয়ে আছে। বর্তমান সরকার তাঁদের চাকরির ধাপে ধাপে তার ক্ষতিপূরণ করে দেবেন। তারপর সরকারের চাকরি ছেড়ে যখন কোম্পানীর কাজে গেলাম, দাদামশাই উপদেশ দিলেন শর্মাটাকে ছেঁটে ফেলবার। তিনি নিজে শর্মা, দিল্লীর বড় দপ্তরে বসে বড় বড় কোম্পানীকে চরিয়ে খান। পাছে কেউ কিছু সন্দেহ করে সেই ভয়ে নাতির নাম পালটে দিলেন আর. চন্দ্রা। আমি যে কোন ছুঁদে শর্মার নাতি, সে কথা আর কেউ বুঝতে পারবে না।

আমি হাসছিলুম। শর্মা বললেন ঃ এখনি হাসবেন না। আমি এখন একই সঙ্গে দুটো কোম্পানীর চাকরি করি দুনামে--এস. রাম ও আর. চন্দ্রা। নানা দুর্ভাবনায় বাপের দেওয়া শর্মা নাম মুখে এসে গিয়েছিল। কোনদিন একটা 'কেলেঙ্কারি' করে ফেলব।

ধরা পড়লে কী করবেন ?

ধরা পড়ব! কে ধরবে! সবাই তো আমারই মতো। তফাৎ শুধু সাহসের বেলায়। আমি নিজে করি, নিজের নামে করি। অন্যেও করে নিজে, কিন্তু স্ত্রী পুত্র পরিবারের নাম, এমন কি শালী ভায়রাভাই পর্যন্ত। নিজের মনোবল কম বলেই তো লুকোচুরি করে। তারা আসবে আমায় ধরতে! ছোঃ!

শর্মা হঠাৎ লাফিয়ে উঠলেন, বললেন ঃ দেখেছেন কী ভুল করেছি!

শুধু আমি কেন, সবাই চমকে উঠেছিলেন।

শর্মা তার প্যাণ্টের পকেট থেকে একটা চকচকে সিগারেট কেস বার করলেন। সেটা খুলে আমার দিকে এগিয়ে বললেন ঃ আসুন স্যর।

আমি হাত জোড় করে বললুম ঃ ধন্যবাদ।

খান না ?

বলে মামার দিকে হাত এগিয়ে দিলেন।

মামাও বললেন : ধন্যবাদ।

শর্মা ফ্যাল ফ্যাল করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর .কস বন্ধ করে পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন। আমি বললুম : আপনি :খলেন না ?

আমি! আমি সিগারেট খাই নে।

তবে রাখেন কেন ?

শর্মা গদ গদ ভাবে বললেন : আপনাদের জন্যেই রাখি।

কানের কাছে মুখ এনে বললেন : একেবারে যে খাই নে তা নয়, আপনারা নিলে খেতাম। তবে কেশে কেশে মরে যেতে হত।

অমন করে খাবার দরকার কী!

বুঝলেন না, এ হল বিজনেস—

বুঝেছি বুঝেছি।

ওধার থেকে মামা বললেন : বেশি ভাব জমিয়ো না গোপাল, পরে হয়তো পস্তাতে হবে।

কথাটা বাঙলায় বলেছিলেন, ভেবেছিলেন শর্মা বুঝতে পারবেন না। সে যে কত বড় ভুল, তা পরের মুহূর্তেই বুঝতে পারলেন। শর্মা পরিষ্কার বাঙলায় বললেন : বলেছি তো, রাত দশটাতেই কান ধরে নামিয়ে দেবেন।

স্বাতি আশ্চর্য হল, মামা লজ্জিত হলেন, আর আমি বললুম : বেশ বাঙলা বলেন তো ?

শর্মা বললেন : বললাম তো বাঙলাদেশে বাঙালী সেজে যাই। নাম শ্রীরাম চন্দ্র। অনেকেই চন্দ বলেন।

আমাদের কাছে তো বাঙালী সাজেন নি!

সাহস পাই নি। বাঙালী শুনলে অনেক বাঙালী আজকাল গলাধাক্কা দেয়। বিশেষ করে বাঙালী ব্যবসাদার। বাঙালীকে তারা একেবারেই বিশ্বাস করে না। অফিসেও বড় সাহেব বাঙালী হলে মাদ্রাজীদের রাজত্ব। দিল্লীতে আজকাল পাঞ্জাবীরা জোর

করেছে। দিনে দিনে যাতে প্রাদেশিকতা বাড়ে, তার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা হচ্ছে। ভেদ বজায় না রাখলে লুটে খাবার সুযোগ কম।

মামা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বোধ হয় ভাবলেন, এ আপদ ঘাড় থেকে নামানো যাবে না। কিন্তু না নামালেও চলবে না। মামী তাহলে নিজেই নেমে যেতে চাইবেন। বাহিরের একটা লোক থাকলে তাঁর হয়ত ঘুমই আসবে না। চারখানি মাত্র বার্থ, আমরা চারজন আছি, রিজার্ভ করা আছে। পুরো ভাড়া দিয়ে ভদ্রলোক যে মাটিতেই শুতে চাইবেন, এই কথা ভেবেই আমরা উদ্বিগ্ন হলুম। বললুম: কতদূর যাবেন?

যতদূর যেতে দেবেন।

আপনার কোন গন্তব্যস্থান নেই?

সে অনেক দূর। দিল্লী।

মামা এতক্ষণ সোজা হয়ে বসে ছিলেন, এবারে হেলান দিলেন। একেবারেই যে হতাশ হয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই। বললুম: কোথা থেকে আসছেন?

সেকেন্দ্রাবাদ থেকে।

সে তো দেখতেই পেয়েছি। কিন্তু যাত্রার শুরু তো সেখান থেকে নয়।

যাত্রার শুরু জিজ্ঞাসা করছেন? সে দিল্লা থেকে।

বললুম: আমার প্রশ্নটা নিশ্চয়ই বুঝেছেন। উত্তর দিতে বাধা থাকে, বলুন বলব না।

বুদ্ধির দোষে বুঝতে একটু দেরি হয়। তা না হলে সত্য বলায় বাধা কিসের! দিল্লী থেকে সেকেন্দ্রাবাদ এসেছি কাজিপেট হয়ে। এবারে ফিরে যাচ্ছি।

আর কোন শহর দেখেন নি?

তাও দেখেছি। ওরঙ্গল বলে একটা শহরে কিছু কাজ ছিল। ছ মাইল পথ যেতে আসতে সারাটা দিন গেছে।

ওরঙ্গলের নামে আমার কাকতীয় রাজাদের কথা মনে এল। একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই রাজবংশের অভ্যুদয়। প্রথম রাজার নাম কাকতি প্রলয়। কল্যাণপুরের চালুক্যদের অধীন। তাঁর বাপের দেওয়া নাম ছিল প্রলয়। কাকতি নাম তিনি নিজে নিয়েছিলেন। তাঁর পাটরাণী কাকতি দেবীর উপাসনা করতেন। রাজাও তাঁর পূজা করে একটি শিবলিঙ্গ পান। পরশ পাথরের লিঙ্গ। ধনরত্নে রাজকোষ ভরে গেল। রাজা স্বাধীন হলেন। নাম নিলেন কাকতি প্রলয়।

রাজ্যের রাজধানী ছিল হনমকোণ্ডে। সেই শিবলিঙ্গ সরাতে না পেরে রাজা ওরঙ্গলে রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন। সে হল ১০৬৮ খ্রীষ্টাব্দের কথা।

এই রাজার আর একটি গল্প আছে। তার পিতৃঘাতী পুত্রের গল্প। রাজকুমারের জন্মের পর দৈবজ্ঞ বললেন, এই পুত্র পিতৃঘাতী হবে। আর যায় কোথা। রাজা পুত্রহত্যা করতে না পেরে শিশুকে বনে পরিত্যাগ করলেন। কিন্তু যে ছেলে পিতাকে হত্যা করবে, তার মৃত্যু নেই। কোন গৃহস্থের ঘরে লালিত হয়ে যথাসময়ে পরশলিঙ্গের রক্ষক নিযুক্ত হলেন। একদিন অন্ধকারে রাজা মন্দিরে আসছিলেন দেব-দর্শনে, পুত্র রুদ্রদেব তাঁকে চোর ভেবে হত্যা করলেন। রুদ্রদেব প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন এক সহস্র শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করে।

দেবগিরির যাদব রাজাদের সঙ্গেও এদের যুদ্ধ হয়েছিল। রুদ্রদেবের ভ্রাতা মহাদেব প্রাণ হারিয়েছিলেন, কিন্তু পুত্র গণপতিদেব তাঁকে পদানত করে রাজকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। ইনি জৈন-বিদ্বেষী ছিলেন। জৈন মন্দিরগুলি ধ্বংস করে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন।

এঁর দৌহিত্র প্রতাপরুদ্র ওরঙ্গলের শেষ রাজা। ১৩২৩ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানের হাতে তাঁর পরাজয় হয়। দিল্লীতে তাঁর লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। কোটি কোটি টাকার ধনরত্ন দিয়ে জীবন রক্ষা করেছিলেন

বটে, কিন্তু শেষপর্যন্ত রাজ্য রক্ষা করতে পারেন নি। সে বড় করুণ কাহিনী।

আমি জানি ওরঙ্গল সম্বন্ধে মামা কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। মামার চেয়ে মামীকে ভয় বেশি। গায়ে পড়ে বাইরের লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা মামীর পছন্দ নয়। তাঁকে খুশী করতে হলে নীরব থাকা উচিত। কিন্তু মামা চুপ করে থাকতে পারলেন না, বললেন: ওরঙ্গলের কথা তো তুমি বল নি গোপাল?

হনম কোণ্ডার কথাও বলি নি।

শর্মা বলল: দেখেছি দেখেছি, ও জায়গাটাও দেখেছি। ওরঙ্গল থেকে হনম কোণ্ডা পাকা শড়ক, তার ধারে একটা বিরাট মন্দির দেখেছি। হাজার স্তম্ভের মন্দির। বললে, এ দেশের শেষ হিন্দু রাজবংশের অসম্পূর্ণ কীর্তি। সামনেই প্রায় তিন শো কারুকার্য করা থাম। পশ্চিমের দরজায় অনেক নৃত্যপরা কন্যার মূর্তি।

শর্মা আরও বললেন: কাছেই নাকি হনমন্তগিরি নামে একটা নগর ছিল। আজ সেখানে দেখবার কিছু নেই। শুধু পাহাড়ের গায়ে কিছু জৈন মূর্তি এখনও বর্তমান আছে।

খুব মৃদু স্বরে প্রশ্ন করলুম: ওরঙ্গলে কী দেখলেন?

সত্যি কথা বলতে কি, ওরঙ্গলে আমি বক্‌রম খুঁজেছিলুম। বক্‌রম বোঝেন তো, দরজিরা ব্যবহার করে।

বিস্ময়ের আমার সীমা রইল না। তা লক্ষ্য করে শর্মা বললেন: একটু অদ্ভুত শোনাবে বৈকি। কিন্তু মার্কোপোলোর কথা পড়লে এমন আশ্চর্য হতেন না। উনি দুশো বছর আগে এই জায়গা দেখে গিয়ে লিখেছিলেন যে এই রাজ্যে সবচেয়ে ভাল আর সবচেয়ে মোলায়েম বক্‌রম তৈরি হয়, সবচেয়ে দামীও বটে। মাকড়শার জালের মতো তার সূক্ষ্ম তন্তু। বলেছিলেন, There is no king or queen in the world but might be glad to wear them. আমি এই বক্‌রম দেখতে পেলুম না, তার

বদলে কার্পেট তৈবি দেখে এলুম। এও নাকি অনেক পুরনো শিল্প।

ওবঙ্গলে কার্পেট ছাড়া আব বুঝি কিছু দেখবাব নেই?

পুবাতাত্ত্বিকেব কাছে আছে। শহব তো একটা প্রাচীন দুর্গ, দুটো প্রাচীবে ঘেবা। বাহিবেবটা কাদাব, লোকে তাব পরিধি বলে পঁচিশ মাইল, ভেতবেবটা পাথবেব। বেললাইন এই দেয়ালগুলো এফোঁড় ওফোঁড় কবেছে।

একসময মামা আমাকে কাছে ডাকলেন, বললেন: কাজটা তোমাব ভাল হচ্ছে না গোপাল।

সে কি আমি বুঝি নি। বললুম: দেখি কী কবতে পাবি।

বাত দশটাব আগে ট্রেন নিজামাবাদ পৌঁছবে। সেখানেই আমাদেব বাতেব আহাব। শমাকে যদি সেইখানে নামানো যায তো সবদিক বক্ষা। ঘব থেকে বেবিযে যাও, আব গাড়ি থেকে নেমে যাও, এ কতকটা একই ধবণেব কথা। বলতে ভদ্রতায বাধে, কিন্তু না বলে আজ উপায নেই। তৃতীয শ্রেণীকে আমি এই কারণেই ভালবাসি। সেখানে জাতি বর্ণেব বিচাব নেই, কেউ কাউকে নেমে যেতে বলে না। যতক্ষণ জায়গা থাকে, ততক্ষণ লোক আসে। জাযগা না থাকলে লোকে নিজে থেকেই আসে না। তৃতীয শ্রেণীতেও যে আজকাল বর্ণ বিচাব হচ্ছে, সে উপর থেকে আমদানী কবা। মধ্যম শ্রেণীব যাত্রী যখন পয়সাব অভাবে তৃতীয শ্রেণীতে ওঠে, তখনই তাবা দ্বাব বোধ কবে আপন কৌলীন্য ঘোষণা করে। তৃতীয় শ্রেণীব জাত-যাত্রীবা কাবও জন্যে দবজা বন্ধ কবে না।

প্রাণেব বেলাতেও তাই। হৃদযেব দবজা তাদেব খোলা। ভয় না দেখালে সহজে বন্ধ হয় না। শমা যদি তৃতীয শ্রেণীতে চলতেন আমাব সঙ্গে, তাহলে তাঁকে পাশে ধরে বাখতুম। আবার বলতুম না: কোথায় নামবেন?

বলেছি তো।

দ্বিধা না করে সরাসরি বললুম: নিজামাবাদ পৌঁছবে রাত দশটায়, সেখানেই নামবেন তো?

গম্ভীর ভাবে শর্মা বললেন: নামিয়ে দেবেন।

আবার সেই কথা। ভদ্রলোক কিছুতেই বলছেন না যে নিজে থেকেই নামবেন। এদিকে নিজামাবাদ পৌঁছতে আর দেরি নেই।

এবারে মামী আমাকে কাছে ডেকে বললেন: অত খোসামোদ কিসের? গাড়িতো রিজার্ভ করাই আছে, রেলের লোক ডেকে নামিয়ে দিও।

নিজামাবাদে এসব কিছুই করতে হল না। ভদ্রলোক নিজেই কুলি ডেকে জিনিসপত্র নামালেন। আমরা সবাই খুশী হয়েছিলুম, কিন্তু তিনি মুখে চুনকালি মাখিয়ে দিলেন, বললেন: আমাকে নামতেই হত, আমার কাজ আছে এখানে। শুধু একটু মানুষ চেনার চেষ্টা করলুম।

সত্যি কথা। এত বড় বিরাট পৃথিবীটা দেখতে বেরিয়েও মনের সঙ্কীর্ণতা আমাদের গেল না। দুহাত জুড়ে শর্মা তো আমাদের নমস্কার করল না, যেন আধুনিক সভ্যতার পিঠে মনুষ্যত্বের চাবুক মেরে গেল।

বেদনায় স্বাতির দৃষ্টি কি ছল ছল করছে!

৩২

আমরা ঔরঙ্গাবাদে পৌঁছলুম ভোর সোয়া ছটার পরে। হোটেলের অভাব এ শহরে নেই। সবশ্রেণীর যাত্রীর জন্য সব রকমের হোটেল আছে। স্টেট হোটেলে রাজকীয় ব্যবস্থা। আমরাও একটা চলনসই জায়গা বেছে নিলুম। এ কাজে একজন ট্যাক্সির ড্রাইভার আমাদের সাহায্য করেছিল। পরে জেনেছিলুম, সে নিজেই গাড়ির মালিক, তার আরও খান-দুই গাড়ি আছে। মাইনে-করা ড্রাইভার সেগুলো চালায়। হোটেলে দুখানা ভাল ঘরের ব্যবস্থা করে দিয়ে বলল: আপনারা মুখ হাত ধুয়ে চা খেয়ে নিন। আমি ঘুরে আসছি।

ঘুরে আসবার কারণ মামা বুঝতে পারেন নি। সে নিজেই তা বুঝিয়ে বলল: ইলোরা এখান থেকে আঠারো মাইল। আজই আপনাদের দৌলতাবাদ ইলোরা আর ঔরঙ্গাবাদ দেখিয়ে দিতে পারব। আর কাল অজন্তা।

যাত্রীদের এই নিয়ম। কেউ ইলোরা আগে, কেউ অজন্তা। কেউ ট্যাক্সিতে, কেউ বাসে। কেউ ঔরঙ্গাবাদে ফিরে ট্রেন ধরে, কেউ অজন্তা থেকে জলগাঁওএ যায়। এমন যাত্রী কম, যে ইলোরা দেখে অজন্তা দেখে না। কিংবা রাত কাটায় ফর্দাপুরে বা খুলদাবাদে। ফর্দাপুর অজন্তা গুহার কাছে। সেখানে স্টেট গেস্ট হাউস আছে, পি. ডব্লু. ডি. ডাক-বাংলোও আছে। ঘর ভাড়া পাওয়া যায়, স্টেট গেস্ট হাউসে খাবারও পাওয়া যায়। খরচ একটু বেশি। খুলদাবাদ ইলোরা গুহার কাছে। সেখানেও স্টেট গেস্ট হাউস আছে, আছে ডাকবাংলো। স্টেট গেস্ট হাউসে যাঁরা থাকেন, তাঁরা খাবার ব্যবস্থা করেন পি. ডব্লু. ডি. ডাকবাংলোর খানসামার

কাছে। জলগাঁওএও আছে ট্রাভলার্স বাংলো আর ইন্‌স্‌পেকসন্‌ বাংলো।

কলকাতার দিক থেকে যাঁরা আসেন, তাঁরা ভোরবেলায় জলগাঁওএ থেমে বাসে আসতে পারেন অজন্তা। অজন্তা থেকে বাসে করেই ঔরঙ্গাবাদ আসতে পারেন। জলগাঁও-এর বাস অজন্তা এসে জলগাঁও ফেরে। ঔরঙ্গাবাদের বাস ঔরঙ্গাবাদ। একাধিক বাস। একটার পর একটা আসে, একটার পর একটা যায়। জায়গার অভাব বড় একটা হয় না। তবু দেখা যায় যে বাঙালীরা জলগাঁও-এ না নেমে উজিয়ে যান মনমাড। সেখানে গাড়ি বদল করে ঔরঙ্গাবাদ। একটা গোটা দিন তাতে নষ্ট হয় না।

যারা বম্বে বা হায়দ্রাবাদ থেকে আসেন, তাঁরা ঔরঙ্গাবাদেই নামেন। অজন্তা দেখেও জলগাঁও-এ গিয়ে ট্রেন ধরতে চান না। অজন্তা থেকে জলগাঁও-এর পথে একটা পাহাড়ী নদী কয়েকবার পার হতে হয়। তার উপর উঁচু পুল নেই। এক জায়গায় নিচু রাস্তা আছে, জলের উপর দিয়েই পার হতে হয়। আগে সেখানে মোটর চলত না। হেঁটে পারাপার করতে হত। আজকাল আর হাঁটবার দরকার হয় না। প্রচুর বর্ষা হলে দিনকয়েক অসুবিধা হয়। কিন্তু যাত্রীর ভয় সারা বছর থাকে। পুরানো ভ্রমণ কাহিনী পড়ে ভয় কারও কমছে না।

ইলোরায় একটা চায়ের দোকান আছে, কিছু শুকনো খাবার পাওয়া যায়। দুপুরের আহার তাতে ভাল হয় না। হোটেল থেকেই আমাদের খাবার সাজিয়ে দিল। দৌলতাবাদের দুর্গে উঠতে হবে বলে আমরা খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লুম।

দৌলতাবাদ নামেও একটা স্টেশন আছে। সেখান থেকে মাইল খানেক হাঁটতে হয়। ঔরঙ্গাবাদ থেকে দেখারই সুবিধে বেশি। ইলোরা যাবার রাস্তার উপরেই এই দুর্গ। ন মাইল পথ। চমৎকার বাঁধানো রাস্তা দিয়ে কিছুক্ষণ চলতেই আমরা পৌঁছে গেলুম।

কতগুলি ঘন-পাতার গাছের নিচে জনকয়েক লোক ফলের দোকান নিয়ে বসেছে। কলা পেয়ারা আর বড় বড় আতা। তারই পাশে গাড়ি রাখবার জায়গা। সামনে দুর্গে যাবার পথ। তার পাশে ভিখারী বসেছে ভিক্ষা চাইতে। ভিক্ষা দেওয়া আমরা ধর্মের কাজ বলে মনে করি। তাইতেই বোধ হয় দেশের সবত্র মেলে ভিখারীর সাক্ষাৎ।

দুর্গের দিকে চেয়ে মামা প্রমাদ গণলেন: এই পাহাড়ে আমাদের উঠতে হবে?

বেশি তো নয় দুহাজার আড়াই শো ফুট উঁচু।

মাত্র!

মামা একটা ভেংচি কাটলেন।

মামী বললেন: ওর মাথায় ওঠবার দিব্বি কে দিয়েছে!

নিচে তো কিছুই দেখছিনে। দু একখানা বাড়ি যা দেখছি, সে তো একেবারে মাথায়।

স্বাতি বলল: কেন, ঐ মিনারটা!

চাঁদ মিনার। নিচে থেকে মনে হচ্ছে, ঐ মিনারের মাথা বুঝি পাহাড়ের চেয়ে নিচু নয়। সিঁড়ি নিশ্চয়ই আছে। দিল্লীর কুতুব মিনারের মতো অগণিত সিঁড়ি। নাও থাকতে পারে। কোন মানুষকে উপরে দেখতে পাচ্ছি নে।

ছোট বড় গাছের পাশ দিয়ে সমতল রাস্তা গেছে দুর্গের দিকে। আমরা ধীরে ধীরে এগোতে লাগলুম। কয়েকজন যুবক ফিরে আসছে। তাদের দেখে কলেজের ছাত্র বলে মনে হয়। আমি ভাব করবার চেষ্টা করলুম: কী দেখলেন ওপরে?

একজন হেসে বলল: মজুরি পোষায় নি। যত পরিশ্রম করেছি, আনন্দ পেয়েছি তার চেয়ে কম।

আর একজন বলল: অন্ধকার পথ পর্যন্ত নিশ্চয়ই দেখে আসবেন।

সে আবার কী?

পরিখা পার হয়ে দুর্গ প্রবেশের পথ। সৈন্যরা কী করে শত্রুর আক্রমণ সামলাতো, তা নিশ্চয়ই দেখবার জিনিস।

কিন্তু কে বোঝাবে ?

লোক আছে। মশাল জ্বেলে সব আপনাদের দেখিয়ে দেবে। কোন রকমে এই ব্যাপারটুকু দেখে নিলেই দৌলতাবাদ আসা সার্থক মনে হবে।

আর একজন বলল : রাস্তার বাঁ ধারে ভারতমাতার মন্দিরটা দেখে যাবেন।

দৌলতাবাদ যখন সত্যিই দৌলতের ভাণ্ডার ছিল, তখন তার নাম ছিল দেবগিরি। দেবগিরিতে হিন্দু রাজার অধিকার। যাদব বংশের রাজারা একশো বছরের উপর এখানে রাজত্ব করছেন। এই দুর্ভেদ্য দুর্গ বোধহয় তাঁরাই নির্মাণ করেছিলেন ১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। দেবগিরির ঐশ্বর্যের সংবাদ দিল্লীতে অবিদিত ছিল না। কামিনী কাঞ্চনের উপর বাদশাহ আলাউদ্দীন খিলজীর সমান নজর। তিনি ১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দে দেবগিরি আক্রমণ করলেন। রাজা রামচন্দ্র আপ্রাণ চেষ্টা করেও এই আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত কিছু জমি ও বাৎসরিক করের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিস্তার পেয়েছিলেন। আর যা দিয়েছিলেন, ইতিহাসে তা স্মরণীয় হয়ে আছে। এক হাজার মণ রূপো, ছ শো মণ সোনা আর দু মণ হীরে ও অন্যান্য মণিমুক্তা। দেবগিরি থেকে দিল্লীর দীর্ঘ পথে এই ধনরত্ন দুর্বহ মনে হয়েছিল। সৈন্যেরা নাকি রূপোর জিনিস পথে ফেলে দিয়ে গেছে।

প্রাচীন ভারতে ঐশ্বর্যের অভাব কোনদিন ছিল না। রামায়ণ মহাভারতে বিশ্বাস না হয় নাই থাকল, ইতিহাস তো আমরা মানি। সেই ইতিহাসে এমন ধরণের কথা আরও অনেক আছে। সুলতান মামুদের সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠনের কথা আজ কারও বিশ্বাস হয় না। কাংড়ায় নগরকোট লুণ্ঠন করে তিনি সাত লক্ষ

সোনার মোহর, সাত শো মণ সোনা রূপার বাসন, দুশো মণ খাঁটি সোনা, দু হাজার মণ রূপা এবং কুড়ি মণ হীরা জহরৎ পেয়েছিলেন। কাশিম-পুত্র মুহম্মদও মুলতানের এক মন্দির লুঠ করে সোনা পেয়েছিলেন। এক আধমণ নয়, পুরো এক লক্ষ তিন হাজার দুশো মণ।

ধনরত্নের এই ফিরিস্তি মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরিস্তার লেখা। আরব ও পারস্যের নানা স্থানে তখন এক থেকে চার সেরেও মণ হত। কাজেই ফেরিস্তার মণ চল্লিশ সেরে চলত কিনা, আজ তা জানার উপায় নেই। এই তো সেদিন আমরা চার আনা সেরের আঙুর কিনেছিলাম।

রাজা রামচন্দ্রের পরেই দেবগিরির হিন্দুশাসন শেষ হয়ে গেল। আলাউদ্দীন গুজরাট জয় করে রাণী কমলা দেবীকে আপন অন্তঃপুরে বেগমের সম্মান দিয়েছিলেন। আর রামচন্দ্র দিয়েছিলেন পলাতক রাজাকে আশ্রয়। দিল্লীর দরবারে কর দেওয়াও বন্ধ করেছিলেন। আর যায় কোথা! আলাউদ্দীনের সেনাপতি মালিক কাফুর এলেন দেবগিরি বিজয়ে। রামচন্দ্র সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়ে দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করলেন। দু বৎসর পরে তার পুত্র শঙ্কর স্বাধীনতা ঘোষণা করেই সর্বনাশ ডাকলেন। মালিক কাফুরের হাতে পরাজিত ও নিহত হলেন।

শঙ্করের পরে রাজা হলেন রামচন্দ্রের জামাতা হরপাল। এঁদের চরিত্রে ছিল স্বাধীন দেবগিরির স্বপ্ন। বিদ্রোহী হয়ে তিনিও মৃত্যুবরণ করলেন। সে বড় বীভৎস কাহিনী। খিলজী বংশের বাদশাহ মবারক শাহ হরপালকে বন্দী করে জীবন্ত অবস্থায় তার দেহের চামড়া তুলে নেন। সভ্য যুগে এমন দৃষ্টান্ত বুঝি আর নেই।

এর পর পাগলা রাজা মুহম্মদ তুঘলুকের গল্প।

দিল্লীর লোকেরা তখন পাগলা রাজার নামে মুখে মুখে ছড়া কাটছে। পাগলা রাজা বললেন, দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি। দেবগিরির

কথা তাঁর মনে পড়ল। এই দুর্গ তাঁর সাম্রাজ্যের ঠিক মাঝখানে। রাজ্য শাসনের নিশ্চয়ই সুবিধা হবে। কাজেই চল দেবগিরি। একা নয়, পাত্র মিত্র নিয়ে নয়, দিল্লীর সমস্ত অধিবাসীকে যেতে হবে। না গেলে প্রাণদণ্ডও নয়, পা ধরে টেনে নিয়ে যাও। সত্যি সত্যিই পা ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল এক জনকে। বেচারা অন্ধ। ছ শো দশ মাইল পথ লাঠি ঠুকে চলতে পারবে না বলেই পথের ধারে বসে ছিল। কেন বসে থাকবে। কেন একটা লোকও দিল্লীতে থাকবে? পা ধরে টেনে নিয়ে চল। কিন্তু মানুষটা পৌঁছল না। দেহটা ছিন্নভিন্ন হয়ে পথে পড়ে রইল। পৌঁছল শুধু তার একটা পা। দেবগিরি হল তুঘলুকের রাজধানী দৌলতাবাদ। ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দ।

দৌলতাবাদ জমজমাট ছিল সতেরো বছর। কিন্তু দিল্লীর মায়া কারও কাটে নি। দিল্লী ফেরার অনুমতি পাওয়া মাত্র সবাই তল্পি গোটাল। ছ শো মাইল পথ ছ মাইলের মতো মনে হল। দৌলতাবাদে আর একজনও পড়ে রইল না।

আজও এ জায়গা বড় নির্জন। বাহিরে কয়েকটা ফলের দোকান দেখেছি, আর একটা ভিখারী। ভিতরে চাঁদ মিনারের সামনে দুজন স্ত্রীলোক দেখলুম একরকম খাবার বিক্রি করছে। ভারত-মাতার মন্দিরের পথ তারাই দেখিয়ে দিল।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে এ একটা মসজিদ ছিল, তারও আগে ছিল মন্দির। স্বাধীনতার পর কতকটা জোর করেই এই ভারত-মাতার মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এই গল্প একজন ভদ্রলোক বললেন। একটা মস্ত বড় অনাদৃত প্রাঙ্গণের মধ্যে এই মন্দির। চারিদিকে উঁচু প্রাচীর। অযত্নে ও অবহেলায় বড় বড় ঘাস জন্মেছে। কয়েকজন স্ত্রীলোক সেই ঘাস কাটছে। ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে তাদের কাজ দেখছিলেন।

সেখান থেকে ফিরে আমরা চাঁদ মিনার দেখলুম। চাঁদ মিনার

কে তৈরি করেছেন, আমাদের জানা নেই। পনর ফুট উঁচু ভিত্তির উপর নব্বুই ফুট উঁচু মিনার। বাহিরে হালকা নীলের ডোরা, দেখে মনে হবে পারসী টালি। ভাল করে নজর করলেই ভুলটা চোখে পড়বে। চুনের সঙ্গে রঙ মেশানো হয়েছে। গেছে সবই, আছে অল্প। কিন্তু যেটুকু আছে, তা একেবারে তাজা মনে হবে।

দুর্গের দিকে আমরা এগিয়ে গেলুম।

স্বাতি আজ মামার পাশে পাশে চলেছে। আমাকে শুনিয়ে বলল : গোপালদার আজ মেজাজ খারাপ।

মামা বললেন : কেন ?

ইতিহাস কেউ শুনতে চাইছে না।

মামা হো-হো করে হেসে উঠলেন। নির্জন পরিবেশের মধ্যে এই হাসি বড় অদ্ভুত শোনাল। বললুম : কোন কবি বিধাতা পুরুষকে বলেছিলেন অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ শিরসি মা লিখ। এই কবির সঙ্গে আমি একেবারে একমত।

স্বাতি বলল : কী বললে ?

বললুম, হে বিধাতা, অরসিকের কাছে রস নিবেদন করতে হবে, দয়া করে আমার কপালে এ কথা লিখো না।

দুঃখ প্রকাশের ভান করে স্বাতি বলল : ইতিহাসে রস পায়, এমন লোক আর কোথায় পাবে বল ! যারা পায়, তারা তোমার প্রথম ভাগের বিদ্যায় খুশী হবে না।

মামা হয়তো ইতিহাস শোনবার ফরমায়েস করতেন। কিন্তু তার সুযোগ পেলেন না। আমরা তখন সমতল ছেড়ে ধাপে ধাপে উপরে উঠছি। পায়ের দিকে নজর রাখতে হচ্ছে, পথের দিকেও। খানিকটা উপরে উঠে একটা কামানের খবর পাওয়া গেল। জন কয়েক মজুর কাজ করছে। তাদেরই একজন বলল : গাইড চাই বাবু ? কামান দেখাব, ওপরেও ঘুরিয়ে আনব।

কামান কোথায় ?

লোকটা আঙুল দিয়ে দেখাল। কিছু সিঁড়ি ভাঙতে হবে। তা হোক। দেখতেই তো বেরিয়েছি। মামা বললেন : কামান অনেক দেখেছি।

বলে নিচে মামীর পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন।

আমি আর স্বাতি উপরে উঠলুম খুব ধীরে ধীরে। সিঁড়ি তো বেশি নয়। তাড়াতাড়ি উঠলে এখুনি ফুরিয়ে যাবে।

একটা কুচকুচে কালো লোহার কামান। বাইশ ফুট লম্বা। রোদে বেশ চক চক করছে। কেউ যেন তেল মাখিয়ে রেখেছে। কামানের নাম লেখা মেন্ধা গান। মানে বোধহয় ভেড়ার মুখের কামান। আমি নামতে যাচ্ছিলুম। স্বাতি বলল : অত ব্যস্ত কেন ?

মামা মামী যে নিচে দাঁড়িয়ে আছেন।

আমাদের সঙ্গে কি ওঁরা চলতে পারবেন !

আমার মনে হল এই কথা বোধহয় নিচে থেকেও শোনা যাবে। দিনে দুপুরে এমন খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে সব কথা তো বলা যায় না। স্বাতি নিজেও তা বোঝে। তাই সংক্ষেপে বলল : দেশে ফিরে ভুলে যাবে না তো ?

ভোলা উচিত হবে।

কেন ?

তোমার মঙ্গলের জন্যে।

আমার মঙ্গল ?

নিজে বাউণ্ডুলে বলেই এই কথা বলছি। মেয়েদের নীড় চাই পুরুষকে বাঁধবার জন্যে। একটি মাত্র পুরুষ। তোমার জীবনের ভবিষ্যৎ যে স্থির হয়ে আছে।

স্থির কি কখনও অস্থির হয় না ?

কামানের উপর বসে স্বাতি পা দোলাচ্ছিল। আমি আশ্চর্য হলুম তার নির্বিকার ভাব দেখে। মনে হল, এ তার হাল্কা কথা।

গভীর ভাবে কিছু ভাবেনি বলেই এমন কথা বলতে পারল। বললুম : অস্থির জিনিসই স্থির হয়।

কিন্তু আমার দৃষ্টি তখন অন্যত্র স্থির হয়েছে।

স্বাতি বলল : কী দেখছ ?

একটি বাঙালী পরিবার। একটি নয়, দু তিনটি মনে হচ্ছে। সঙ্গে ছেলেমেয়েও আছে।

স্বাতি লাফিয়ে উঠল। কথা না বলে নিচে নামতে শুরু করল। দেখলুম, সে তরতর করে নামছে। মামীকে দেখতে পেয়েই বলল : অদ্ভুত কামান মা, একেবারে নতুনের মতো ঝকঝক করছে।

আমি জানি, কল্পনার রাজ্য থেকে স্বাতি মাটিতে পা ফেলতে চাইছে।

মেয়ে-পুরুষের দলটি আমাদের এড়িয়ে গেলেন। আমরা এগিয়ে গেলুম।

পরিখার উপর কাঠের পুল। অনেক নিচে শ্যাওলা রঙের জল স্থির হয়ে আছে। এই পরিখা নিশ্চয়ই সমস্ত পাহাড় ঘিরে। আর দুর্গে প্রবেশের পথ মাত্র একটি। আজ এই পুল সরানো যায় না, একদিন নিশ্চয়ই যেত। শত্রুসৈন্য অবরোধ করলে এই সাঁকো সরিয়ে দুর্গকে দ্বীপে পরিণত করত।

আমরা একটা অন্ধকার পথের সামনে এলুম। সেই মুহূর্তে দেখলম দুজন মানুষ ক্ষিপ্রগতিতে বেরিয়ে আসছে। একজন পুরুষ, অন্যজন নারী। আমাদেরই বয়সী, কিন্তু একেবারেই ঝিমিয়ে নেই। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে দ্রুত পায়ে আমাদের পেরিয়ে গেল।

মামী ওদের লক্ষ্য করেছিলেন। স্বাতি আমার দিকে তাকাল। আমি তাকিয়েছিলুম মেয়েটির মুখের দিকে। সুশ্রী কুমারী মেয়ে। খুশিতে উজ্জ্বল, প্রাণ-চঞ্চল। দক্ষিণের বাতাসের মতো মনে দোলা দিয়ে গেল।

সামনে আঁধেরি ফোর্ট। পাহাড়ের ভিতর সাবটেরানিয়ান

প্যাসেজ। লোকে ব্ল্যাক আউট রোড বলে। আলো আর গাইড না নিয়ে এগোন নিরাপদ নয়। চেষ্টা করে এই পথকে বিপদসঙ্কুল করা হয়েছে। শত্রুসেনা যদি পরিখা অতিক্রম করে, তবে প্রথম বাধা এইখানেই পাবে। আমরা একজন গাইড সঙ্গে নিলুম।

লোকটা জমিয়ে গল্প বলতে পারে। শত্রুসেনা দুর্গে ঢুকতে কোথায় কী বাধা পাবে সেই গল্প শোনাল।—এখান থেকে দুটো রাস্তা। শত্রুরা থমকে দাঁড়াবে, ভাববে কোন্ পথে যাবে। দুর্গ-রক্ষী যারা লুকিয়ে আছে আশে পাশে, তারা এদের মেরে ফেলবার সুযোগ পাবে। উপরে গিয়ে দুটো রাস্তাই এক হয়েছে। এক জায়গায় উপর থেকে আলো আসছে। চোকে ধাঁধা লাগছে, দুদিকে রাস্তা। শত্রু থমকে দাঁড়িয়ে ভাবতে যাবে, ওপর থেকে গরম তেল পড়বে। পাহাড়ের উপরে আছে সেই ব্যবস্থা। ভয় পেয়ে উল্টোদিকে ছুটলেই সুড়ঙ্গ দিয়ে গড়িয়ে পড়বে। আরও এগিয়ে দুটো রাস্তা। একদিক থেকে গরম হাওয়া আসছে। আর একদিক থেকে শীতল বাতাস। লোহার জাফরিতে আগুন জ্বেলে গরম হাওয়া ছড়ানো হচ্ছে। শীতল হাওয়ার দিকে ছুটলেই বিপদ। সে পথ শেষ হয়েছে পাহাড়ের গায়ে, টুপ টাপ পরিখার জলে পড়বে। এই গোটা রাস্তার উপরে নিচে দুই পাশে দুর্গরক্ষীরা আত্মগোপন করে থাকতে পারে। শত্রুকে বিধ্বস্ত করতে পারে পদে পদে।

লোকটি একরকমের লোহার কাঁটা দেখাল। মাটিতে ফেললেই একটা কাঁটা উপরে থাকে গজালের মতো। সেকালে নাকি অসংখ্য কাঁটা বিষ মাখিয়ে ফেলে রাখত এই অন্ধকার পথে। সৈন্যেরা বুট পরত না বলে বিষের ক্রিয়ায় মারা পড়ত।

আরও খানিকটা এগিয়ে আমরা উন্মুক্ত আকাশের নিচে পৌঁছলুম। চারিদিকের সব কিছু দেখা যাচ্ছে। যত আলো তত বাতাস। নিঃশ্বাস নিতে আর কষ্ট হচ্ছে না। আগেও হয়তো হচ্ছিল না। কষ্ট হচ্ছিল যুদ্ধের গল্প শুনে।

ব্ল্যাক-আউট রোড ধরে আমাদের আর ফিরতে হল না। নিজাম বাহাদুর একটা সিঁড়ি করে দিয়েছেন। পাহাড়ের গায়ে সেই ধাপ বেয়ে আমরা নিচে নেমে এলুম।

বিদায় দেবার আগে লোকটি নমস্কার করল। কোন দাবী দাওয়া নেই। আট গণ্ডা পয়সা পেলেই সন্তুষ্ট হত, মামা একটি টাকা দিলেন। খুশী হল।

এই তৃপ্তি দেখে আমার ভাল লাগে। অপর্যাপ্ত পেলেও মানুষ আজকাল খুশী হয় না। তার প্রয়োজনের শেষ নেই, দাবীরও নেই। অল্পে সুখী হবার কৌশল যে শিখেছে, সেই সুখী। আশুতোষ মহাদেবের আদর্শ আমরা কোনদিন মানতে পারি নি।

এবারে আমরা ইলোরা দেখব।

৩৩

অজন্তা আর ইলোরাকে নিয়ে আমাদের কল্পনার শেষ নেই। মনে হয়েছে, সৌন্দর্যের শেষ কথা সেখানেই লেখা আছে। আজ তা প্রাণ ভরে দেখবার পরম সুযোগ। আজ আমার অদ্ভুত ভাল লাগছে।

মাইল পাঁচেক এগিয়ে একটা সমৃদ্ধ গ্রাম পেরবার সময় ড্রাইভার বলল ঃ এই গ্রামের নাম রোয়াজা। শেষ জীবনটা ঔরঙ্গজেব এইখানে কাটিয়েছিলেন। এখানে তাঁর কবর আছে।

কবর আমরা দেখলুম না। ড্রাইভার বলল, ফেরার পথে দেখাবে। রৌদ্র প্রখর হবার আগে ইলোরায় পৌঁছনো দরকার। ইলোরা তো ছোটোখাটো জায়গা নয়, সে বিরাট ব্যাপার। পাহাড়ের এক মাথা থেকে আর এক মাথা পর্যন্ত সমানে হাটতে হবে। তার পর পাহাড়ের গায়ের রাস্তা ফুরিয়ে যাবে। তখন মোটরে চেপে অনেকটা পথ ঘুরে যেতে হবে, তার পর আবার। বাসে এলে হাঁটতেই হবে। বাস গিয়ে কৈলাস মন্দিরের সামনে দাঁড়াবে। সেখান থেকেই ফিরবে। যাত্রীদের শুধু হাটার পরীক্ষা। ইলোরা দেখার আনন্দ অনেকেরই কমে যায়।

পরিষ্কার বাধানো রাস্তায় আমরা একটা পাহাড়ের দিকে এগিয়ে এলুম। হিমালয়ের মতো পাহাড় নয়, নয় গভীর অরণ্যময়। একটা বেঁটে নিচু পাহাড়ের শ্রেণী আধখানা চাঁদের মতো দিগন্তকে খানিকটা আড়াল করে রেখেছে। ড্রাইভার হঠাৎ এক জায়গায় গাড়ি দাঁড় করাল। ডান হাতে লতাগুল্মহীন রুক্ষ পাহাড়। বললুম ঃ কী হল ?

ড্রাইভার বলল ঃ এইখানে নামলে অর্ধেক রাস্তা সংক্ষেপ হবে।

কী রকম করে ?

এইখান থেকেই গুহা শুরু হয়েছে। দেখতে দেখতে এগিয়ে যাবেন। এক নম্বর থেকে ষোল নম্বর। কৈলাস মন্দিরের সামনে আমি অপেক্ষা করব।

আমি নেমে পড়েছিলুম। মামা ইতস্তত করছিলেন, বললেন: এখানে পথ কে দেখাবে ?

পথ দেখাবার দরকার হবে না। এই পায়ে চলা রাস্তা ধরে একটু ওপরে উঠলে নিজের চোখেই সব দেখতে পাবেন। গাইডরাও হয়তো দাঁড়িয়ে আছে।

স্বাতি নেমে দাঁড়িয়েছে। মামীকে অনুসরণ করে মামাও নামলেন। ড্রাইভার নিজে খানিকটা এগিয়ে মামাকে সাহস দিল।

খানিকটা উঠেই চোখ আমাদের জুড়িয়ে গেল। ইলোরার সমস্ত গুহা বুঝি চোখের সামনেই বিস্তৃত হয়ে আছে। ভিতরের সৌন্দর্য আছে বাহিরের আলোকে বিজ্ঞাপিত। আমরা স্তব্ধ হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলুম। এই মায়াময় পরিবেশের মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নিতে কিছু সময় লাগল।

ড্রাইভার ফিরে গিয়েছিল। তার বদলে দুজন গাইড এগিয়ে এসেছে। একজন সরকারী গাইড, তার দাম বেশি। আর একজন বেসরকারী ছেলে মানুষ। তার সাদাসিধে সরল মুখ দেখেই মামা তাকে পছন্দ করলেন। দক্ষিণার দাবী মাত্র দু টাকা। সবিনয়ে একবার মাত্র জিজ্ঞাসা করেছিল: হাতে সময় কত ?

এ প্রশ্ন কেন ?

সারাদিন সময় থাকলে সমস্ত গুহা দেখাবে, তা না হলে শুধু ভাল গুহাগুলো।

শুধু যদি ভাল গুহা দেখি ?

তাহলে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হবে। তিন চার ঘণ্টা তো লাগবেই।

ব্যস্তভাবে মামা বললেন : যথেষ্ট ! তার বেশি আর ঘুরিয়ো না।

পাহাড়ের ধার কেটে রাস্তা তৈরি হয়েছে, আর ভিতরে গুহা। গুহার মতো একটা রূঢ় কথায় সমস্ত পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ঘর নয়, গৃহ নয়, মন্দির। মন্দির শব্দের মধ্যেই কল্পনার অবকাশ আছে। তার শিল্প-মণ্ডিত প্রবেশ পথ, মূর্তি ও কারুকার্যে অপূর্ব। কোন কোন গুহার সামনে প্রশস্ত অঙ্গন আছে। বারান্দা আছে। সে বারান্দা বর্তমান শতাব্দীর মতো সাদা সাপটা নয়, নানা নক্সা ও মূর্তি অলঙ্কৃত বিচিত্র বারান্দা। একটার পর একটা গুহা, পাশাপাশি, ঢেউএর মতো আগে ও পিছনে। উপরে ও নিচে।

বাহিরে দাঁড়িয়ে স্বাতি বলল : এ কতদিনের পুরনো গোপালদা ?

দুহাজার বছর।

দু হাজার !

স্বাতির একথা বুঝি বিশ্বাস হল না। বললুম : গৌতম বুদ্ধের বয়স আড়াই হাজার বছর হয়ে গেছে। এ সমস্ত স্তূপ আর মঠ তাঁর জন্মের দু তিন শো বছর পর থেকে তৈরি শুরু হয়।

মামা বললেন : এ সমস্তই কি বৌদ্ধ কীর্তি ?

প্রশ্নটা আমাদের গাইডও বুঝতে পেরেছিল। বলল : অজন্তার সব কিছুই বৌদ্ধ। কিন্তু এখানে তিন রকম গুহা আছে— বৌদ্ধ হিন্দু ও জৈন। এই কারণেই ইলোরা আরও ইণ্টারেস্টিং। চৌত্রিশটা গুহার ভেতর অর্ধেক হিন্দু, বারোটা বৌদ্ধ আর জৈন পাঁচটা। খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে এগুলো সব পাশাপাশি, বারোটা বৌদ্ধ গুহার পর সতেরোটা হিন্দু গুহা, আর শেষ পাঁচটা জৈন। লোকে মনে করে, বৌদ্ধ গুহাগুলিই সবচেয়ে প্রাচীন, দু হাজার বছরের পুরনো গুহা। তার পর ব্রাহ্মণরা এসেছে। সব শেষে জৈন। মাঝখানের কৈলাস মন্দির থেকে জৈন গুহাগুলি প্রায় দেড় মাইল দূরে। এই পাহাড়ের একেবারে আর এক প্রান্তে।

দাঁড়িয়ে আর কতক্ষণ থাকবে ?

বলে মামা এক নম্বর গুহার ভিতরে ঢুকে পড়লেন।

গাইড বলছিল : এই গুহাগুলো মাটির নিচে চাপা পড়ে ছিল। সাড়ে তিন শো বছর ধরে খুঁড়ে বার করা হয়েছে। ষোলশো বছর আগে এ সবের প্রথম হদিশ কে পেয়েছিল জানি নে, কিন্তু খোঁড়াখুঁড়ি তখুনি শুরু হয়ে যায়।

মামাকে ভিতরে যেতে দেখে তাড়াতাড়ি সে এগিয়ে গেল। বলল : এইটেই বোধ হয় সবচেয়ে পুরনো গুহা। বিহার এটা।

বিহার মানে ?

বৌদ্ধরা দুরকমের ঘর তৈরি করত—বিহার আর চৈত্য। বিহারে তাদের বাসের ও অধ্যয়নের ব্যবস্থা, চৈত্যে উপাসনার। চৈত্যের ভিতব চিতাভস্ম বা অস্থি রক্ষার জন্য স্তূপ নির্মিত হত। আমি আপনাদের দেখিয়ে দেব।

এই বিহারের ভিতর আমরা আটটি ছোট ঘর দেখলুম।

দু নম্বরের গুহাটি বোধ হয় চৈত্য। দুধারে বসবার ব্যবস্থা, মন্দিরে সিংহাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধেব বিবাট মূর্তি। গাইড আমাদের চাবটি বুদ্ধ মূর্তি দেখাল। বলল : সেকালের শিল্পীরা মূর্তি কী করে গড়ত, তার একটু নমুনা আছে। প্রথম মূর্তিটি দেখুন শিল্পী শুরু করেছে মাথার দিক থেকে। বাকিটা অসম্পূর্ণ। দ্বিতীয়টা দেহ ও হাত। এমনি করে নিচে নেমে সম্পূর্ণ হয়েছে।

বাহিরে এসে গাইড বলল : তিন নম্বর গুহা দু নম্বরের মতো।

তবু আমরা ভিতরে গেলুম। দু নম্বরের চেয়ে ছোট। বুদ্ধ পথের উপরে উপবিষ্ট।

চার নম্বর গুহায় আমরা পদ্মপাণির মূর্তি দেখলুম। আর গাছের নিচে বুদ্ধ।

পাঁচ নম্বর গুহাটি সব চেয়ে বড়। গাইড বলল : এই গুহায় স্কুল বসত। লম্বায় ১১৭ ফুট আর আটান্ন ফুট চওড়া। পাশে আরও জায়গা আছে।

পরে শুনেছিলুম, স্কুল নয়, এ গুহায় অতিথি শ্রমণদের বিশ্রামের ব্যবস্থা হত।

ছ নম্বর গুহায় নারী মূর্তির প্রথম সন্ধান পেলুম। গাইড বলল: সরস্বতী।

হিন্দুর বিদ্যাদাত্রী দেবী সরস্বতী। ছোট কক্ষের ভিতর আরও অনেক মূর্তি আছে। দ্বারপাল ও ভক্ত সেবক পরিবৃত বুদ্ধ।

আট নম্বর গুহায় বাপ মায়েব সঙ্গে শিশু বুদ্ধকে দেখে, আর ন' নম্বরের বারান্দা দেখে আমরা দশ নম্বর গুহায় এলুম। গাইড বলল: এটি হল একটি খাঁটি চৈত্য। এখানকার লোকে বলে ছুতার কি ঝোঁপড়ি।

ছুতোরের ঘর কেন বলে, গাইড তা বলতে পারল না। খোঁজ করে জেনেছিলুম যে এই গুহার নাম বিশ্বকর্মা, স্বর্গেব ঐ শিল্পীর নামে উৎসর্গ করা ঘর। বাহিরটা যেমন সুন্দর, ভিতরটাও তেমনি। ঘবের ছাদ সমতল নয়, খিলানের মতো। থামের উপরে নানা মূর্তি খোদাই করা। উপবে বুদ্ধ, নীচে গণ। পিছনে স্তূপ, তার সামনে বুদ্ধের বিরাট মূর্তি।

এগারো আব বারো নম্বব গুহাকে লোকে দোতলা আর তিন তলা বলে। কিন্তু দুটো গুহাই তিন তলা। এগাবো নম্বরের তৃতীয় তলাটা নাকি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। বারো নম্বরের বিহার একশো পনর ফুট লম্বা আর তেতাল্লিশ ফুট চওড়া। তিন সারি স্তম্ভে ঘরটি ভাগ করা। দোতলা ও তেতলায় প্রচুর কারুকার্য। তেতলার ঘর লম্বায় একতলাবই সমান। কিন্তু চওড়ায় অনেক বড়, প্রায় সত্তব ফুট। এক দিকে বুদ্ধের বড় বড় মূর্তি গাছের নিচে, অন্য দিকে ছাতার তলায়। মন্দিরে বিরাট আকাবেব বুদ্ধ মূর্তি।

মামা বললেন: মোটামুটি একই রকম দেখছি।

গাইড হিন্দীতেই কথা বলে ইংরেজী মিলিয়ে, বলল: এবারে

অন্য রকম দেখবেন। বৌদ্ধ গুহা শেষ হয়ে গেল। এবারে হিন্দু গুহা।

কতগুলো যেন বলছিলে ?

সতেরোটা।

সবই দেখতে হবে ?

আমি জানি, হাঁটতে মামার কষ্ট হয়। মামীরও ভাল লাগে না। কিন্তু দেখবার শখ আছে ষোল আনা। তাইতেই এত প্রশ্ন। গাইড বলল: পাঁচটি গুহা দেখলেই সব দেখা হবে। চোদ্দ পনর ষোল, তারপর একুশ আর উনত্রিশ।

বল কী ?

উৎসাহ পেয়ে গাইড বলল: ইলোরা দেখতে এসে যদি শুধু কৈলাস মন্দির দেখে ফিরে যান, তাহলেও আফশোস করবার কিছু থাকবে না! বিদেশীরা এলে ওখান থেকে আর বেরতে চায় না, ক্যামেরার সব ফিল্ম এক জায়গাতেই শেষ করে ফেলে।

মামা বললেন: তবে সেখানেই তাড়াতাড়ি চল।

স্বাতি বলল: সে কি বাবা, আর কিছু দেখবে না ?

গাইড বলল: চলুন না, চোদ্দ আর পনর তো পথেই পড়বে। রাবণ কি খাই আর দশ অবতার। তারপরেই কৈলাস।

চোদ্দ নম্বর গুহায় ঢুকেই বৌদ্ধ ও হিন্দু গুহার পার্থক্যটা বোঝা গেল। সামনেই চারটে স্তম্ভ, বড় ঘরে বারটি, আর তার শেষ প্রান্তে মন্দির। দক্ষিণের দেওয়ালে যত মূর্তি, সবই শৈব—মহিষাসুর বধ, হরপার্বতীর দাবা খেলা, শিবের তাণ্ডব নৃত্য, রাবণের কৈলাস হরণ, আর ভৈরব। উত্তরের দেওয়ালে সব বৈষ্ণব চিত্র—লক্ষ্মী, বিষ্ণুর বরাহ অবতার, চতুর্ভুজ বিষ্ণু ও লক্ষ্মী নারায়ণ। মন্দিরের ভিতর দুর্গার প্রতিমা। বাহিরে দক্ষিণের রাস্তাতেও নানা দেবদেবীর মূর্তি।

পনের নম্বরের গুহাটি দোতলা। মস্ত প্রাঙ্গণ, তার চারিধারে

ছোট ছোট মন্দির ও পুরোহিতের আবাস ঘর। উপরের তলাটি ঠিক আগের গুহার মতো।

একুশ আর উনত্রিশ নম্বরের গুহা আমরা পরে দেখেছিলুম। প্রথমটির বারান্দা আর থামগুলি আমাদের ভাল লেগেছে। আর দ্বিতীয়টির নির্মাণের কৌশল। গাইড বুঝিয়ে দিয়েছিল যে একমাত্র এই গুহাটিতেই একাধিক প্রবেশ দ্বার, ঠিক যোগেশ্বরী গুহার মতো। আর নির্মাণের কৌশল হল বম্বের এলিফেন্টার মতো। সে সবের চেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছিল একটি ঝর্ণা। পাহাড়ের উপর থেকে নিচে গভীর খাদের ভিতর পড়ে বয়ে যাচ্ছে। মন্দিরের পাশে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে দেখতে হয়। জলের স্বচ্ছ ধারা নিচে বাষ্পাকুল হয়ে আছে। কিন্তু এ সবের আগে আমরা কৈলাস দেখেছিলুম।

কৈলাসের বর্ণনা আছে কালিদাসে, কিন্তু সে তুষারমৌলি কৈলাস। হিমালয়ের যে শিখরে শিবের অধিষ্ঠান। ইলোরার কৈলাসের বর্ণনা কোন কবির লেখায় পড়িনি। স্তব্ধ হয়ে নির্বাক বিস্ময়ে যা দেখতে হয়, নীরস গদ্যে তার প্রমাণ অসম্ভব। সে চেষ্টা কোন কবি করবেন।

ইলোরার চায়ের দোকানের সামনে দিয়ে আমরা কৈলাসের দরজায় এসেছিলুম। আমাদের গাড়ির মতো আরও কয়েকখানি গাড়ি সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। দৌলতাবাদেও এই গাড়িগুলি দেখেছি। বুঝতে কষ্ট হল না যে সেই বাঙালী দলটি এখন এখানে আছেন। তাঁদের ফেরার সময় নিশ্চয়ই হয়েছে। একজন দুজন করে বেরিয়ে আসছিলেন।

বাহিরে দাঁড়িয়ে কৈলাসের ভিতরের ঐশ্বর্যের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। তবু আমি কিছু খুঁজছিলুম। হঠাৎ কানে গেল: তার অভিভাবকরা যখন প্রশ্রয় দিচ্ছে, আমাদের কিছু বলার নেই।

এক প্রৌঢ়া মহিলা বললেন: আমি তাকে সাবধান করে দেব।

পাশের বউটি অল্প বয়সের। আর্তনাদের মতো বলে উঠল: না না, তার কী দরকার। পরের ব্যাপারে মাথা না গলানোই ভাল।

মামা মামী ভিতরে চলে গেলেন। স্বাতিও গেল। কিন্তু যাবার আগে আমার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে গেল। এই কথোপকথন বোধ হয় সে শুনতে পেয়েছে।

আমি আরও একটু দাঁড়িয়ে ছিলুম। বোধ হয় আরও কিছু শোনবার প্রত্যাশা ছিল। এবারে দুজন পুরুষ আসছিলেন পাশাপাশি। একজন বললেন: হতভাগা ভাবছে, দেশে ফিরলেই সব ফুরিয়ে যাবে।

সবটুকু আমি শুনতে পেলুম না। স্বাতি পিছিয়ে এসে বলল: দাঁড়িয়ে রইলে কেন গোপালদা, এগিয়ে এস।

মুখে তার কৌতুকের হাসি।

ভিতরে গিয়ে অনেকক্ষণ দাড়িয়ে থাকতে হয়। পরিকল্পনার বলিষ্ঠতা বুঝতে সত্যিই সময় লাগে। এ তো গুহা নয়, চোখে না দেখলে এ জিনিস কল্পনা করা যায় না। পাহাড়ের মাঝখানে একটি অপূর্ব মন্দির—প্রাঙ্গণ আছে, ধ্বজস্তম্ভ আছে। অলিন্দ আছে চারিদিক ঘিরে—সবই পাহাড়ের মধ্যে। এই মন্দিরের চারিদিকে পাহাড় বললে ভুল হবে। পাহাড়ের মধ্যে মন্দির। তফাৎ শুধু এইখানে যে প্রাঙ্গণের উপরে ছাদ নেই সেই গুহার মতো। মন্দিরের শিখর আছে মন্দিরেরই মতো।

মামা মামীর পাশে এসে আমরা দাড়িয়েছিলুম। অনেকক্ষণ ধরে দেখবার পর মামা বললেন: এ কেমন করে সম্ভব হল?

মনে মনে আমি একটা ধারণা করে ফেলেছিলুম। বললুম: পাহাড়টা এখানে ভরাট ছিল। মজুররা ওপর থেকে কেটে কেটে নিচে নেমেছে, একেবারে আমাদের পায়ের কাছ পর্যন্ত। চারিদিক থেকে কেটে নেমেছে, কিন্তু মাঝখানটা কাটে নি। যে দরজা দিয়ে আমরা ভেতরে এলুম, সেটা ছিল সুড়ঙ্গের মতো।

মামা বলে উঠলেন : বুঝেছি বুঝেছি। এই দরজা আর প্রাঙ্গণটা আগে গড়েছে। মাঝখানের পাহাড়টা খুদে মন্দির গড়েছে পরে।

ধীরে ধীরে স্বাতি বলল : দুহাজার বছর আগের মানুষ এসব কী করে তৈরি করেছিল, আজ আমরা সেই কথা ভাবছি। কিন্তু তারা কী ভেবেছিল বলতে পার ?

গাইড বলল : হিন্দুদের এই গুহাগুলো সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবিষ্কৃত হয়েছে। রাষ্ট্রকূট রাজা প্রথম কৃষ্ণের কীর্তি। শোনা যায়, অসংখ্য মজুর একশো বছর ধরে এই মন্দির গড়েছে। তিরিশ লক্ষ কিউবিক ফুট পাহাড় কেটে চেঁচে বাইরে ফেলতে হয়েছে। তৈরি জিনিস দেখে কাজের পরিমাণের ধারণা করা আজ বোধ হয় শক্ত।

তারপর বলল : আসুন।

মাঝখানের এই শিবের মন্দির লম্বা ও চওড়ায় দেড়শো আর একশো ফুট। পঁচিশ ফুট উঁচু ভিত্তির উপর পঁচানব্বই ফুট উঁচু মন্দির। পঞ্চাশ ফুট উঁচুতে নন্দীর স্থান। দুপাশে দুই ধ্বজস্তম্ভ। প্রার্থনা ও উপাসনার ঘর দোতলায়। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়। সামনা-সামনি তিনটি গৃহ সিঁড়ি দিয়ে যুক্ত। প্রথমে আমরা উপরে না উঠে নিচেটাই ভাল করে দেখতে লাগলুম।

মন্দিরের গায়ে কারুকার্যের ঐশ্বর্য দেখে বিস্ময় জাগে। এক জায়গায় গোটা রামায়ণখানা চিত্রিত দেখলুম। পাথরের উপর এমন সূক্ষ্ম কাজ আগে কখনও দেখিনি। স্বাতিকে একখানা ছবি নিতে বললুম। আমি বলবার আগেই সে ক্যামেরা খুলেছিল।

অলিন্দের ধার দিয়ে আমরা মন্দির প্রদক্ষিণ করছিলুম। পিছনে এক সারি হাতি দেখলুম। বিরাট আকারের—যেন জীবন্ত জীব। আরও অনেক জন্তু ও মূর্তি।

বারান্দার অন্য ধারে গিয়ে আর একটি চিত্র দেখলুম। অদ্ভুত অপূর্ব কল্পনা। দশানন রাবণ এসেছে শিবকে লঙ্কায় নিতে। শিব

যাবেন না। দশানন তাই গোটা কৈলাসটাকেই লঙ্কায় নিয়ে যাবে। পাহাড়ের উপর নিশ্চিন্তে বসে ছিলেন হর-পার্বতী। নীচে দুই অনুচর নন্দী ও ভৃঙ্গী। ক্রুদ্ধ রাবণ তার বিশ হাতে কৈলাসকে উৎপাটিত করবে। সমস্ত পাহাড় থরথর করে কাঁপছে। পার্বতী চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। অর্ধশায়িতা হয়ে শিবের বাম বাহু আবেষ্টন করেছেন নিজের দক্ষিণ হাতে। শিব একখানি পায়ের ভার রেখেছেন পাহাড়ের উপর। রাবণ স্বেদাক্ত ক্লান্ত হচ্ছে।

নিচে থেকে এ দৃশ্যের সম্পূর্ণ ছবি উঠবে না। স্বাতি উপরের বারান্দায় উঠে ছবি নিল। বললুম: একটা জিনিস লক্ষ্য করো। কৈলাস যে কাঁপছে তা রাবণের দশ মুণ্ড ও বিশ হাত দেখে বোঝা যাচ্ছে। মনে হয়, ছবিতেও এই ভাবটি ফুটে উঠবে। ক্যামেরা বা অব্‌জেক্ট নড়ে গেলে যেমন ছবি ওঠে, এই দৃশ্যের ছবিও ঠিক তেমনি ওঠে। শিল্পীর কল্পনাকে অভিনন্দন জানাতে হয়।

উপরতলা থেকে স্বাতি মূল মন্দিরের ছবি নিল। পিছনে পাহাড়, তার উপরে আকাশ।

মামা মন্দিরের ঠাকুর দেখতে গেছেন, শিবলিঙ্গ। নিজাম বাহাদুরের রাজ্যে শিবের পুজা চালু হয় নি। দেশ বিদেশের লোক এখানে মন্দির দেখতে আসে, দেবতার দর্শনের জন্য আসে না।

বাহিরে এসে মামী বললেন: খাবে কখন?

ড্রাইভার বলল: আধঘণ্টার মধ্যেই বাকি কএকটা গুহা দেখিয়ে দেব।

একবার দূরের হিন্দু গুহাগুলি, আর একবার জৈনদের গুহা। বড় অসমতল পথ। কখনও নিচে নামছে, তারপর উপরে উঠছে। পুরনো গাড়ি টানতে চায় না, গতি রোধ হয়ে গড়িয়ে পড়বে! গিয়ার বদল করে করে কোনরকমে আমরা জৈন গুহার সামনে এসে পৌঁছলুম।

পাঁচটি গুহার মধ্যে সবচেয়ে ভাল লাগে ইন্দ্রসভা, তারপর জগন্নাথ

সভা। ইন্দ্রসভা দোতলা গুহা। পাহাড়ের ভিতর প্রায় দুশো ফুট লম্বা। চৌকো উঠোন। ডান পাশে একটি সুন্দর হাতি। উপরের তলাটি অদ্ভুত সুন্দর। ইন্দ্রের পায়ের কাছে ঐরাবত, সভার ছাদে একটি বিরাট পদ্ম। বারোটি স্তম্ভে অপূর্ব কারুকার্য, চব্বিশটি তীর্থঙ্করের মূর্তি। সভার চারিদিক ঘিরে মহাবীরের মন্দির। অনেকে বলেন, এইটিই ইলোরার সবচেয়ে সুন্দর গুহা।

জগন্নাথ সভার পরিকল্পনা একই রকম কিন্তু আকার ছোট।

এই পাহাড়ের উপর পার্শ্বনাথের একটি মূর্তি আছে। ষোল ফুট উঁচু। মন্দিরটি দুশো বছরের পুরনো। কিন্তু আমাদের আর দেখবার সময় নেই। আকাশের সূর্য অগ্নিবৃষ্টি করছে, আর পেটে হুতাশন। এখন কোন ছায়ায় বসে ক্ষুধা নিবৃত্তি না করলে সৌন্দর্য চেতনা ফিরে পাব না।

ড্রাইভার বলল : গিরীশেশ্বর শিবের মন্দিরে খাবার ভাল জায়গা আছে। পৌঁছতে দশ মিনিটও লাগবে না।

কৈলাসে প্রবেশের আগে আমরা একবার জল খেয়েছিলুম। আবার একটু জল খেয়ে যাত্রা শুরু করলুম। খালিপেটে সৌন্দর্যের সমালোচনা আর ভাল লাগছে না।

রাণী অহল্যাবাঈ-এর তৈরি গিরীশেশ্বরের মন্দির বেশি দূরে নয়। বড় রাস্তা ধরে ফেরার পথে একটুখানি ভিতরে যেতে হয়। উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা শিবের মন্দির। প্রশস্ত অঙ্গন। প্রাচীরের ধারে যাত্রীদের বিশ্রামের স্থান। বড় বড় গাছে অনেকটা জায়গা ছায়াচ্ছন্ন হয়ে আছে।

মামা খাবার জিনিসপত্র নামাতে বলেছিলেন। মামী বলে উঠলেন : কী নাস্তিক গো। মন্দিরে এসে কোথায় ঠাকুর দর্শন করবে, তা নয় আগেই খাবার ভাবনা।

মামীর পিছনে পা বাড়িয়ে মামা বললেন : বিপদের কথা।

আক্রমণের জন্য ব্রাহ্মণেরা প্রস্তুত ছিলেন। মামা মামীকে পূজোর জন্য ধরে নিয়ে গেলেন।

স্বাতি আর আমি একটা বাঁধানো গাছের নিচে বসলুম। স্বাতি বলল : শুনলে তো ?

কী শুনলুম ?

ওরা কী বলল তোমাকে ?

কে কী বলল, আমি মনে করতে পারলুম না।

স্বাতি বলল : দেশে ফিরেই সব ফুরিয়ে যাবে ভাবছ !

এইবারে আমার মনে পড়ল, বললুম : কী এমন পাচ্ছি যে ফুরিয়ে যাবার ভয় পাব ! কোনদিন ফুরোবে না, এমন জিনিস কি কিছু পাই নি ?

স্বাতি একথার উত্তর দিল না, বলল : বোধহয় ঐ মেয়েটার কথা বলছিল, তাই না ?

ঐ মেয়েটাই, যাকে আমরা একটি যুবকের সঙ্গে দেখেছিলুম

দৌলতাবাদের দুর্গ থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে। সঙ্গীব তাদের পিছিয়ে থাকবার সুযোগও দিয়েছে, আবার সমালোচনাও করছে আড়ালে। মজা দেখছে, উপভোগ করছে। ভুলে যাচ্ছে নিজেদের যৌবনের কথা।

কৌতুকে মুখ উজ্জ্বল করে স্বাতি বলল : আমি ভাবলাম, তোমার কথাই বুঝি বলছে।

প্রথমটায় আমিও তাই ভেবেছিলুম। দুজন বউ তোমাকে সাবধান করে দেবে বলছিল।

তখুনি ভাবলাম, তোমার কথা নিশ্চয়ই না।

কেন ?

তুমি তো কাপুরুষ, তোমার আর সাহস কতটুকু !

আমি চমকে উঠলুম ! কী বলছে স্বাতি ! এ কেমন অভিযোগ ! এই কৌতুকের আড়ালে কোন গভীর ইঙ্গিত নেই তো ! বললুম : সত্যি বলছ স্বাতি ?

মুখে আঁচল দিয়ে স্বাতি হেসে উঠল। কেন হাসল, তা কিছুতেই বলল না।

পুজো শেষ করে মামা মামী আসছেন। আমরা খাবাব আনতে গেলুম। মন্দিরের অঙ্গনে বসেই আমাদের খেতে হবে। আর কোন ভাল জায়গা নেই।

আহার সেরে ধীরে সুস্থে যখন গাড়িতে উঠলুম, মামা বললেন : এইবারে গোপাল কিছু বল।

তার আগেই ড্রাইভার বলল : ইলোরা একবার বিকেলেও দেখতে হয়।

কেন ?

বেলা শেষের শেষ আলোয় তার অপূর্ব দৃশ্য। সমস্ত পাহাড়টা লাল হয়ে যায়, আর গুহার ভিতরগুলো উজ্জ্বল আলোয় যায় ভরে।

একেবারে শেষপ্রান্তে যে সব বুদ্ধের মূর্তি আছে, মনে হবে, তাদেরও যেন প্রাণ সঞ্চার হচ্ছে।

পিছন ফিরে দেখলুম, স্বাতি আমার দিকে তাকিয়েছে করুণ ভাবে। এমন একটা দৃশ্য না দেখে ফিরতে হবে! মামা বললেন: তাহলে তো বিকেল পর্যন্ত এখানেই বসে থাকতে হয়।

ড্রাইভার ঔরঙ্গাবাদের দিকে ছুটেছে। বলল: রোয়াজা, বিবি কা মক্‌বারা আর পানচাক্কি দেখতে এখনও বাকি আছে। দেখা শেষ করতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

কাজেই আর কোন কথা বলা চলে না।

রোয়াজায় ঔরঙ্গজেবের সমাধি। বড় রাস্তার ধারেই ফটক। ডান হাতে ফুল ও মালার দোকান। ভিখারীরা বসে আছে। লোকে ফুলের মালা দেয় সমাধির উপর। প্রায়ই দেখতে পাই যে মসজিদের ভিতর হয় সমাধি, কিংবা সমাধির পাশে উঠেছে মসজিদ। শ্রীরঙ্গপত্তনে টিপু স্থলতানের সমাধির পাশেও মসজিদ দেখেছি। এখানেও তার ব্যতিক্রম দেখলুম না।

মামী গাড়ি থেকে নামলেন না। সমাধি শুনেই শ্মশানের মতো কোন স্থান কল্পনা করে মুখ ফিরিয়ে রইলেন।

ফুলওয়ালা ফুল নেবার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল। মামা ভেংচি কেটে বললেন: ফুল দেবার তো আর লোক নেই, এইখেনেই দিচ্ছি।

বাংলা কেউ বোঝে না, তাই রক্ষে। ঔরঙ্গজেবকে নিশ্চয়ই এরা সম্মানের আসনে বসিয়েছে। মুসলমান প্রজার জন্য তিনি কী না করেছিলেন। মুসলমান যেন নেমকহারাম না হয়!

ঔরঙ্গজেবের হিন্দুবিদ্বেষ অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা আজ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। সে তো বাদশাহ ঔরঙ্গজেব, যাকে মামা ঘৃণা করেন। মানুষ ঔরঙ্গজেবের খবর কি তিনি মনে রেখেছেন? সাদাসিধে সরল নিরভিমান মানুষ, নিষ্ঠাবান ধার্মিক মুসলমান। মদ তিনি স্পর্শ

করেন নি। চরিত্রহীনতা তাঁকে কলঙ্কিত করে নি। মৃত্যুশয্যায় শুয়েও তিনি পুত্রদের যে পত্র দিয়েছিলেন তা তো ঘৃণা করবার মতো নয়, কোন আদর্শ রাজর্ষির অমূল্য উপদেশ বলে শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা হবে।

ঔরঙ্গজেবের শিল্প ও সাহিত্যপ্রীতি ছিল না, সরকারী ইতিহাস রচনা বন্ধ করেছিলেন। সাধারণ লোকও যাতে তাঁর রাজ্যশাসনের কথা না লেখে, তিনি সেই আদেশই জারি করেছিলেন। ধর্মে তাঁর গোঁড়ামি ছিল। সেই গোঁড়ামি তাঁকে সন্দিগ্ধ ও নিষ্ঠুর করেছে। তাঁর উদ্যম ও দক্ষতাকে অতিক্রম করেছে তাঁর সন্দিগ্ধ মন। এত বড় মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস হবার বীজ তিনি নিজে হাতেই বপন করে গেছেন। সে ইতিহাসের কথা।

এমন সাদাসিধে অনাড়ম্বর কবর আমরা আগে কখনও দেখিনি। উন্মুক্ত আকাশের নিচে একটি শ্বেত পাথরের বেদী। তার উপর কিছু ফুল ছড়িয়ে দিয়েছে। ভক্তদের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য।

আমার মনে পড়ল ঔরঙ্গজেবের শেষ বাসনার কথা। তাঁর রাজকোষের কোন অর্থ ব্যয় হবে না তাঁর সমাধি নির্মাণের জন্য। নিজে হাতে টুপি তৈরি করে বিক্রি করতেন। মৃত্যুর পূর্বে সেই টাকা থেকে চার টাকা দু আনা সরিয়ে রেখেছিলেন তার সমাধির খরচ বলে। আসমুদ্র হিমাচল হিন্দুস্থানের পরাক্রান্ত বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের সমাধি নির্মিত হয়েছে চার টাকা দু আনায়।

দুঃস্থ প্রজার জন্যও তিনি স্বোপার্জিত অর্থ রেখে গিয়েছিলেন— তিনশো পাঁচ টাকা। নিজে হাতে তিনি কোরাণ নকল করেছিলেন, সেই কোরাণ বিক্রির টাকা।

এই ঔরঙ্গজেবের সমাধি দেখে আমরা ফিরে এলুম। তাঁকে আমরা খামখেয়ালি বাদশাহ বলেই জানি, নিরভিমান মানুষ বলে তাঁর পরিচয় পাই নি।

বিবি কা মকবারা তাঁরই পত্নী রাবিয়া দুরানীর সমাধি। ঔরঙ্গাবাদ শহরের এলাকার কাছেই অবস্থিত। দূর থেকে এই

সমাধিকে তাজমহল বলেই মনে হবে। অনেকক্ষণ সময় লাগবে ভুল বুঝতে। ঔরঙ্গজেব দ্বিতীয় তাজমহল রচনার হুকুম দিয়েছিলেন। কিন্তু শিল্পপ্রীতির অভাবে অর্থব্যয় করেন নি অকৃপণ হাতে। সেই দারিদ্র্যের জন্যই তাজমহল হয় নি, হয়েছে বিবি কা মকবারা।

এখানে একটি নতুন খবর পেলুম। এই মকবারা নাকি ঔরঙ্গজেবের পুত্র আজমশাহ নির্মাণ করেছেন ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে তার মা দিলরসবানু বেগমের স্মৃতিতে। রাবিয়া দুরানী নামে তিনিই পরিচিত ছিলেন। স্থপতির নাম আতাউল্লা ও হন্স্পৎ রায়। খরচ হয়েছে ছ লক্ষ আটষট্টি হাজার দুশো তিন টাকা সাত আনা।

উঁচু খিলানওয়ালা ফটক থেকে মকবারা পর্যন্ত ফোয়ারার সারি আছে। সাইপ্রাস গাছ আছে দুধারে, আছে ফুলের বাগান। সাদা মার্বল পাথরও কিছু ব্যবহার করা হয়েছে, বাকিটা স্টাকো প্ল্যাস্টার আর অরাবেস্ক। ফাঁকির কাজ, কিন্তু এ ফাকি দূর থেকে ধরা পড়ে না, ছবিতে ধরা পড়ে না, ধরা পড়ে না চাঁদের আলোয়। দূর থেকে স্বাতি ছবি তুলল।

এখানে আমরা বেশি সময় নষ্ট করলুম না। অন্ধকার হবার আগেই আমাদের পানচাক্কি দেখতে হবে। পানচাক্কি কী জিনিস, না দেখে তা বুঝতে আমাদের কষ্ট হয়েছিল। দেখবার পর সহজেই সব বুঝতে পারলুম। কয়েক পয়সার টিকিট কেটে ঢুকতে হয়েছিল। ছোট গেট, ডান দিকে একটা বড় জলাশয়। কোনখান থেকে তোড়ে জল আসছে। নদীর সঙ্গে নাকি যোগাযোগ আছে। নদী দেখি নি। জলাশয়ের তিনদিক ঘুরে আমরা অপর প্রান্তে এলুম। তিনদিকেই বাঁধানো রাস্তা। সেই কোণায় একটি ঘর। সেইটেই পানচাক্কি। আমাদের টিকিট দেখে একজন লোক চাক্কি দেখাল। গম পেসার জাঁতা। সেটা হাতে চলে না, চলে জলে। কোথাও একটা ব্যবস্থা আছে, সেখানে ঘুরিয়ে দিলেই হুড় মুড় করে সেই মস্ত জাঁতাটা ঘোরে। ঘর থেকে বেরিয়ে একটা জানালা দিয়ে আমরা জাঁতা

ঘোরানোর কারসাজিটা দেখলুম। কোন এক রন্ধ্র দিয়ে এই জলাশয়ের জল ভিতরে ঢুকছে, জলের তোড়ে নিচে একটা পাখনা ঘুরছে। উপরের জাঁতা তার সঙ্গে যুক্ত বলে জাঁতাও ঘুরছে। ভাবি সরল ব্যবস্থা। পুবাকালে নাকি এতেই গম পেসা হত। আজকাল পানিচাক্কির বদলে তেল কলেব চাক্কি বসেছে। বিদ্যুতের চাক্কিও।

আব কী দেখবাব আছে খবর নিলুম। খাস ঔরঙ্গাবাদে আব কিছু নেই। কাল ভোর বেলায় অজন্তা যেতে হবে। পঁয়ষট্টি মাইল রাস্তা যাওয়া আসা। মোটবে গেলে আমাদের ফিবে আসতে হবে। সঙ্গে মালপত্র বেশি আছে। অত মালপত্র মোটবে উঠবে না। বাসে গেলে সব নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু মামা তাকে হাঙ্গামা মনে কবেন। কাজেই আমরা মোটবে যাব, ফিবে এসে ট্রেন ধরব এইখানেই।

ড্রাইভাব বলল, পঁয়ত্রিশ মাইল দক্ষিণে একটা শহব আছে, নাম পাইথন। গোদাববী নদীর তীবে হিন্দুদেব একটি তীর্থস্থান। নাগ ঘাট একটি প্রসিদ্ধ স্নানেব ঘাট। নিকটেই দুটি মন্দিব, গণপতির মন্দিব তাদেব অন্যতম। অনেক প্রাচীন ভাঙ্গা বাড়ি পাইথনের একটা ঐতিহ্যময় ইতিহাসেব সাক্ষ্য দিচ্ছে। টোলেমি লিখে গেছেন যে অন্ধ্রবাজা দ্বিতীয় পুলমায়ীব বাজধানী ছিল পাইথনে। সে গৌরব আজ নেই।

একটি নতুন ধর্মসম্প্রদায়ের নাম শুনলুম। মনভাও। একান্ত ভাবে তাবা কৃষ্ণভক্ত। চতুর্দশ শতাব্দীতে এই সম্প্রদায়েব কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে পাইথনে।

পাইথনেব আবও একটি জিনিস বিখ্যাত। সোনা-রূপোর কাজ-কবা কিংখাব, তাতে অজন্তাব নক্সা। সেই জন্যেই বোধ হয় সুন্দর বেশি।

ড্রাইভাব যখন হোটেলেব সামনে নামিয়ে দিল, সূর্য তখন অস্ত গেছে। কিন্তু অন্ধকার ঘন হয়ে নামে নি। বলল : আবার আসব কি?

আবার কেন?

কেনাকাটার যদি কিছু থাকে?

মামী উৎকর্ণ হলেন, বললেন : কেনবার মতো কিছু আছে কি?

ড্রাইভার বলল : ঔরঙ্গাবাদের অনেক জিনিস বিখ্যাত। পাইথনের কিংখাব বলেছি, ঔরঙ্গাবাদেরও কিংখাব আছে। কার্পেট আছে সুতো রেশম আর পশমের। সুতোর শাল, হিমরু, মশরু, নির্মল আর বিদ্রির কাজ—

মামী বিচলিত হলেন।

আমি বললুম : ঘণ্টাখানেক পরে বেরব।

আবার বেরবে ?

মামা খুশী হতে পারলেন না। কিন্তু বাজারে গিয়ে মামী যে খুশী হবেন, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ছিলুম। স্বাতিও সে কথা বিশ্বাস করে। আমার মতলব বুঝে স্বাতি একটু হাসল।

বাজারে গিয়ে স্বাতিও খুশী হল। আমি তার সামনে একটি নতুন জিনিস ধরে দিলুম, সুতোর শাল, কিন্তু দেখে তা বোঝবার উপায় নেই। নানা রঙের, নানা ডিজাইনের। অল্পসল্প কাজ করাও আছে, আবার জামেয়ারের মতো সারা গায়ে কাজও আছে। আশ্চর্য হয়ে স্বাতি বলল : এসব কলকাতায় আজকাল দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এমন সুন্দর কোথাও দেখি নি।

দাম শুনে মামী আশ্চর্য হলেন। পনর ষোল থেকে পঁচিশ ত্রিশ টাকা পর্যন্ত। আঠারো কুড়ি টাকাতেই পছন্দমতো পাওয়া যাচ্ছে। আশ্চর্য হবারই কথা।

শাড়ি সব আর্ট সিল্কের। আর্ট সিল্কের কারখানা আছে ঔরঙ্গাবাদে। স্বাতি এসব পছন্দ করে না। বলল : আর্ট মানে তো নকল। আমি খাঁটি জিনিস পছন্দ করি।

বললুম : আর্ট নকল নয়, তোমরা আর্ট নকল কর। জগতে খাঁটি জিনিস যদি কিছু থাকে তো সে আর্ট।

মামা বললেন : গোপাল ঠিকই বলেছে। মানুষ যতদিন খাঁটি

ছিল, ততদিনই আর্টের মর্যাদা দিয়েছে। এই ভেজালের যুগেই নকলের নাম হয়েছে আর্ট।

এসব কথায় মামীর কান ছিল না। তিনি ততক্ষণে দুখানা শাল কিনে ফেলেছেন।

ড্রাইভার যে সব নাম বলেছিল, সে সবও আমরা একে একে দেখলুম। হিমরু আর মশরুও নক্সা করা কাপড়। হিমরু দিয়ে পুরুষের আর মশরু দিয়ে মেয়েদের পোষাক হয়। মোটা হিমরু দিয়ে টেপেস্ট্রির কাজও চলে।

বিদ্রি আর নির্মলের কাজ অন্য দোকানে। বিদরের মাটি দিয়ে নানা জাতের জিনিস হয়। মেয়েদের হাতের বালা ট্রে সিগারেট-কেস, আরও কত কি। কুচকুচে কালো আর উজ্জ্বল সাদার উপরে নক্সা। ভিতরে ধাতুব জিনিস, বাহিরে মাটির সঙ্গে রূপোর জরি। নক্সা তুলেছে বিদরের প্রাচীন দুর্গ থেকে।

নির্মল হল খেলনার কাজ। এক রকমের হাল্কা সাদা কাঠ পাওয়া যায়। তার উপরে রঙ চড়িয়ে নানা রকমের খেলনা তৈরি হয়। এখন কাজের জিনিসও তৈরি হচ্ছে—ট্রে ফার্নিচার ইত্যাদি।

মামা বললেন: আর কত ঘোরাবে?

ড্রাইভারের বোধ হয় আরও কিছু দেখাবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমবা রাজী হলুম না। কালকের জন্যে উৎসাহ আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

ফেরার পথে মামা বললেন: আর একটি দিন।

তারপর?

তারপর আমাদের যাত্রা শেষ।

স্বাতি বলল: কিন্তু যাত্রার কি শেষ আছে? কই পৃথিবী তো থামে না!

মানুষ থামে।

কেন থামে?

এ কথার উত্তর কে দেবে! উত্তর আমাব জানা নেই।

৩৫

সকাল বেলাতেই বেরতে হল। পঁয়ষট্টি মাইল পথ যাতায়াত আছে, তারপর ঘুরে দেখা। শুধু তো গুহা আর তার কারুকার্য নয়, মূর্তি আছে, চিত্র আছে। সমস্ত দেওয়াল ভরা বিচিত্র চিত্র। বিজলির বাতি জ্বেলে একটা একটা করে দেখতে হয়। ইলোরায় এসব চিত্র ছিল না। রঙের কাজ যা সামান্য ছিল, তা দেখতে সময় লাগে নি।

মামা বললেন : গোপাল আজকাল কিছুই বলছ না।

স্বাতি বলল : ভাণ্ডার খালি হয়ে গেছে।

সত্যি নাকি ?

নিরাপদে থাকবার জন্য বললুম : সত্যি।

মামা বললেন : বল ক্লান্ত হয়েছ।

তাও সত্যি। একসঙ্গে এত ঘোরার অভ্যাস ছিল না।

আমাদেরই কি ছিল ! হরিদ্বার গেলে কাশী, আর দিল্লী গেলে মথুরা বৃন্দাবন। বড় জোর প্রয়াগ আর আগ্রা। এবারের মতো রাজ্য জয় আমরা করি নি।

স্বাতি বলল : রামখেলাওন থাকলে—

মামীর চোখের দিকে চেয়ে স্বাতি থেমে গেল।

ভেবেছিলুম, পিছন ফিরে ইতিহাস শোনাবার হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছি। দুধারের প্রান্তর আর গাছপালা দেখতে দেখতেই চলতে পারব। কিন্তু স্বাতির কথায় সে ভুল ভাঙল।

বলল : এত শহর থাকতে গাঁয়ের ভেতর কেন অজন্তা হল ?

অজন্তা নিজে থেকে হয় নি, মানুষে গড়েছে।

সেই কথাই তো বলছি। মানুষ যখন গড়ল, তখন একটা ভাল জায়গায় গড়তে পারত। কলকাতা কিংবা দিল্লীতে।

কলকাতায় পাহাড় কোথায় ?

দিল্লীতে তো আছে। ঐ বেঁটে আরাবল্লীতেই তো গুহা তৈরি করতে পারত।

দুহাজার বছর আগে দিল্লীর বেশি মান ছিল, না অজন্তার, সেইটে ভেবে দেখতে হবে।

মামা বললেন: বল কি ?

আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থের পরে দিল্লীতে আর দর্শনীয় কিছু ছিল না। বর্তমান দিল্লীর ইতিহাস খুব পুরনো নয়। এদিকে অজন্তার দাম ছিল অন্য কারণে। ভারতের উত্তর থেকে দক্ষিণে যে বাণিজ্য পথ ছিল, অজন্তা তারই ধারে। তার নাম ছিল দাক্ষিণাত্যের দরজা। বৌদ্ধ শ্রমণরা তাই এই স্থানকেই সংঘারামের উপযুক্ত বলে বেছে নিয়েছিলেন। নিজেদের স্বার্থ ছাড়া আরও একটা সুবিধা ছিল। যাত্রীরা বিশ্রাম নিতে আসত। তাদের প্রয়োজন মেটাবার সময় কিছু উপদেশও দেওয়া চলত।

বুদ্ধের নির্বাণের প্রায় তিন শো বছর পরে সন্ন্যাসীরা এই স্থান পছন্দ করেন। আর অনলস পরিশ্রমে এই গুহাগুলি নির্মাণ করেন প্রায় সাড়ে চার শো বছর ধরে। এই প্রসঙ্গে চালুক্য ও রাষ্ট্রকূট রাজাদের কথা এসে পড়ে। চালুক্যরা সকল ধর্মকে সমান সম্মান দিতেন। আর তাঁদের সময়েই এই গুহা মন্দির নির্মাণ উৎকর্ষের চরম সীমায় পৌঁছেছে। রাষ্ট্রকূটেরা এত উদার ছিলেন না। বৌদ্ধদের প্রতিপত্তি কমেছে, কিন্তু এই নির্মাণের কাজ কতকটা অবাধেই চলেছিল। পণ্ডিতেরা বলেন, দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই সব কাজ হয়েছে।

মামা বললেন: যত গুহা মন্দির সব এদিকেই শুনেছি।

পশ্চিমঘাট পাহাড়টা শুনেছি তার খুব উপযোগী। এদেশের লোক বুঝেছিল যে ইট কাঠের মন্দিরে অনেক ঝামেলা আছে, মেরামত লেগেই থাকবে। কিন্তু এই কঠিন পাহাড় কেটে একবার একটা মন্দির গড়লে আর কোন ভাবনা নেই, চিরদিনের মতো নিশ্চিন্ত।

যে পথ ধরে আমরা চলেছি, সে পথে কোন সৌন্দর্য নেই। আশে পাশে কোথাও কিছু সুন্দর দেখতে পাচ্ছি না। স্বাতি বলল: অজন্তার পথ এমন রুক্ষ?

ড্রাইভার তার মন্তব্য বুঝতে পেরেছে। বলল: সুন্দর পথ দেখতে হলে জলগাঁও থেকে অজন্তা আসতে হয়। প্রাচীন ঘর বাড়ি, শস্যশ্যামল গ্রাম, নদী পাহাড় সবই আছে। অজন্তার পাহাড় থেকে যে নদী বেরিয়েছে, সে নদী আপনি তিনবার পেরবেন।

স্বাতি নিরাশ হয়েছিল। ড্রাইভার তাকে সান্ত্বনা দিল: ফর্দাপুর পেরিয়ে আপনার ভাল লাগবে। ঘাটের দৃশ্য খুবই অপূর্ব। দুদিকের পথ এসে মিলেছে, তারপর পাহাড় ওঠা।

অজন্তা বুঝি পাহাড়ের ওপর?

পাহাড়ের মাঝখানে। গুহা না থাকলেও অজন্তা ভাল লাগত।

অজন্তা পৌঁছতে আমাদের বিলম্ব হল না। সকালের রোদ প্রখর হবার আগেই আমরা পৌঁছে গেলুম। প্রাঙ্গণের মতো একটা প্রশস্ত খোলা জায়গায় মোটর দাঁড়ায়। বড় বড় বাস এসেও এইখানে দাঁড়াবে। এক ধারে একটি চালা ঘরের ভিতর চা-এর দোকান। অর্ডার দিলে নাকি ডাল ভাতও খেতে দেয়, কিংবা ডাল রুটি, ডিমের ওমলেট। অভুক্ত অবস্থায় ফিরে যাবার দরকার কারও নেই। একটা পাকা ঘরের ভিতর যাত্রীদের মালপত্র রাখবার ব্যবস্থা। যারা বাসে আসে, তাদের মালপত্র নামিয়ে রাখা হয়। পয়সা দিতে হয় মাল প্রতি এক আনা। কুলিদের আলাদা পয়সা। পরে দেখেছিলুম, বাসের মাথায় যারা মাল তোলে তাদের স্বতন্ত্র দক্ষিণা।

চারিদিকে চেয়ে স্বাতি বলল: অজন্তা কোথায়?

অজন্তার পথ ড্রাইভার দেখিয়ে দিল। ধাপে ধাপে বাঁধানো সিঁড়ি উঠেছে। ততক্ষণে গাইড এসে মামাকে চেপে ধরেছে। সরকারী গাইড আট টাকার কমে যাবে না। আমাদেরও গাইড চাই।

কাজেই সে বহাল হয়ে গেল। হাতে যাব সময় আছে, ইলোরায় তাব গাইড না হলেও চলবে। এখানে নাকি অসম্ভব। ছবি দেখতে হলে বুঝতে হলে গাইডেব সাহায্য অপবিহার্য।

কয়েক ধাপ উঠেই মামা বললেন: এব চেয়ে ইলোবা দেখছি ভাল।

মামী বললেন: কিছু না দেখেই কী কবে তা বলছ?

না দেখে কেন, দেখেই তো বলছি। এত পবিশ্রম সেখানে ছিল না।

তাই বল।

গাইড বাঙলা বোঝে কিনা জানি না, বলল: সব দেখবাব পব একথা বলবেন না, বলতে পাববেন না। আপনাদেব তো বেশি বলবাব দবকাব নেই, এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে ফ্রেস্কো ছবিব এমন নমুনা পৃথিবীব আব কোন দেশে নেই। ষোল নম্বব গুহায দি ডাইযিং প্রিন্সেস নামে একটি ছবি আছে। সে সম্বন্ধে গ্রিফিথ্স্ সাহেব বলেছেন, for pathos and sentiment and the unmistakable way of telling its story—cannot be surpassed in the history of art. The Florentines could have put better drawing and the Venetians better colour, but neither could have thrown greater expression into it.

অজন্তাব গাইড প্রথমে জিজ্ঞাসা কবেছিল, কোন ভাষায কথা বলবে—হিন্দী না ইংবেজীতে। মামা হিন্দীব চেয়ে ইংবেজী বোঝেন সহজে। বলেছিলেন, ইংবেজীতেই বল। এখন দেখছি, অনেক কথা সে মুখস্থ কবে বেখেছে। গড গড কবে বলছে অনাযাসে।

এখানেও ঊনত্রিশটা গুহা। চাবটি চৈত্য, বাকিগুলি বিহাব। সবই বৌদ্ধ গুহা। হীনযান সম্প্রদাযেব গুহাগুলি একটু সাদাসিধে বেশি, অলঙ্কৃত বেশি মহাযান গুহাগুলি। ভিতবে বুদ্ধেব মূর্তিও আছে।

গাইড বলল : যাঁদের হাতে সময় কম থাকে, তাঁদের আমরা অল্প কয়েকটা গুহা দেখাই—এক আর ষোলতে বিহারের নমুনা, চৈত্যের নমুনা উনিশ আর ছাব্বিশে।

যেসব গুহার ভিতরে চিত্র আছে, তা দেখবার জন্য বাতির দরকার। পাঁচ টাকা জমা দিলে সরকারী বাতি পাওয়া যায়। একটা ডায়নামো আছে, তাতেই বিদ্যুতের আলো পাওয়া যায়। ঘরময় তার ছড়ানো, সরকারী লোক সেই তার টেনে টেনে দেওয়ালে বাতি দেখায়। ছবি তোলায় আপত্তি নেই, কিন্তু এই আলোতে পরিষ্কার উঠবে না। ফ্লাশ দিয়েই তুলতে হবে।

এক নম্বর গুহাটা আমরা ভাল করে দেখলুম, মহাযান গুহা। মস্ত বারান্দা, নক্সা করা দরজা আর উড়ন্ত গন্ধর্ব ও অপ্সরার মূর্তি আঁকা স্তম্ভ। ছাতে ও দেওয়ালে যে ছবি আছে, একে একে তাও দেখলুম—রাজসভায় রাজদূতের অভ্যর্থনা, নন্দর ধর্মান্তর, যুবরাজ মহাজনকের রাজ্যপ্রাপ্তি, পদ্মপাণি বোধিসত্ত্ব, পত্নী ও পুরনারী পরিবৃত নাগরাজ।

দু নম্বর গুহাতেও অনেক সুন্দর চিত্র আছে। বুদ্ধের জন্ম, ক্রীতদাসী কন্যার শাস্তি, একটি দূত, একটি শোভাযাত্রা।

চার নম্বর গুহাটি সবচেয়ে বড় বিহার। ছ নম্বরটি দোতলা। আর সাত নম্বরটি নাকি বম্বের এলিফ্যান্টার মতো।

আট নম্বর থেকে হীনযান গুহা। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হল নয় নম্বর। খ্রীষ্টজন্মের একশো বছর আগে তৈরি। দশ নম্বর গুহাটি যে সবচেয়ে বড় তাই নয়, তার মধ্যে অনেক মজার ছবি আছে। সে যুগের মানুষ কেমন কাপড় পরত, কেমন গহনা, তার নমুনা আছে। বর্ট-পরা সৈনিক দেখেছি, বিচিত্র নক্সার ম্যানিলা সার্ট, আর মেয়েদের হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ। ফোল্ডিং চেয়ার টেবিল, আধুনিক যুগেও ব্যবহৃত হচ্ছে, এমন অনেক জিনিস।

ষোল নম্বর গুহার স্থাপত্য অতি চমৎকার। মন্দিরের ভিতর

বুদ্ধের বিরাট মূর্তি। আর দেওয়ালে সেই বিখ্যাত চিত্র মুমূর্ষু রাজকন্যা। দি ডাইয়িং প্রিন্সেস্।

সতর নম্বর গুহার অনেক চিত্র নষ্ট হয়ে গেছে। অনেক আছে—বুদ্ধপত্নী যশোধরা ও পুত্র রাহুল, বিজয়ের সিংহলে অবতরণ, নিষ্ঠুর লোভী ব্রাহ্মণ, হস্তী নলগিরি শাসন, সিদ্ধির পর বুদ্ধের স্ত্রীপুত্র দর্শন। বাহিরের বারান্দাতেও কয়েকটি সুন্দর ছবি আছে—রাজপুত্র ও তাঁর পত্নী, ছত্রধারী রাজকন্যা আর গন্ধর্ব।

উনিশ নম্বর গুহা একটি সুন্দর চৈত্য। চব্বিশ নম্বর গুহা সম্পূর্ণ হলে সবচেয়ে বড় বিহার হত। ছাব্বিশ নম্বর গুহার ভিতর নির্বাণপ্রাপ্ত বুদ্ধের বিরাট মূর্তি আছে। কিন্তু এই বর্ণনায় অজন্তার রূপ ফোটে না। চোখে দেখেও সবটুকু সৌন্দর্য ধরা পড়ে না। একটি চারকোণা থামের উপর হয়তো একটা পাথরে খোদাই করা নক্সা দেখছি। একটি বৃত্ত, তার ভিতর পদ্মের দল, আরও নানান কাজ। গাইড বলল : দেখা আপনার সম্পূর্ণ হয় নি।

কী রকম ?

ঘরের আর এক ধার থেকে বাতিওয়ালাদের এনে বলল : ধর।

তারা বাতি তুলে ধরল।

এ কি ! এতো মরা পাথর নয়। এর ভিতর থেকে যে আলো ঠিকরে বেরচ্ছে, এ কি হীরের কুচি দিয়ে তৈরি !

তেমনি ছবির বেলায়। একাগ্র মনে আমরা একটি ছবি দেখছি। আলোতেই দেখছি। এমন লীলায়িত ভঙ্গি বুঝি কোনদিন দেখি নি, এমন সুন্দর কমনীয় রূপ। পাশে থেকে গাইড বলল : গলার মালাটি দেখেছেন ?

বাতিটা তুলিয়ে দিতেই সেই মালা ঝকমক করে উঠল। মনে হল না যে ওটি শিল্পীর তুলিতে আঁকা রঙের মালা। চোখের সামনে যে জড়োয়া মালা দেখতে পাচ্ছি। নিশ্চয়ই কোন মণিকার শখ করে ঐ মালা পরিয়ে দিয়েছে ছবির গলায়।

এমনই জীবন্ত কত মূর্তি, কত ছবি! গ্রিফিথ্‌স্‌ সাহেব ঠিকই বলেছেন, দুনিয়ার অন্য দেশে হয়তো ভাল নক্সা আঁকতে পারত, কিংবা রঙ লাগাত ভাল, কিন্তু ছবিতে এমন প্রাণ দিতে পারত না।

দেখতে দেখতে আমরা অজন্তার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলুম। বাঁকা চাঁদের মতো পাহাড়, তারই গায়ে এই গুহাগুলো অনাদিকাল থেকে মানুষ আকর্ষণ করছে। সামনে একটা ঝর্ণা ঝরঝর করে গড়িয়ে নামছে। নিচের দিকে তাকিয়ে অজন্তার অন্য রূপ দেখতে পেলুম। ছোট একটি পাহাড়ি নদী উপল ও বালির বুকের উপর দিয়ে বইছে। ছোট ছোট গাছপালা, ফুলের গাছও দু একটি দেখছি। এ সমস্ত প্রায় আড়াইশো ফুট নিচে। আমরা এই নদীর উপরেই যেন দাঁড়িয়ে আছি। একেবারে খাড়া পাহাড়, তাই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়েছে।

আমার মতো স্বাতিও নিচের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। তার চোখে আমি যেন নিমন্ত্রণ পেলুম। নিচের ঐ নদীর ধার যে অগম্য নয় তা জেনে ফেলেছি। দু একজন তরুণ সেখানে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দ্বিপ্রহরের উত্তাপ সেখানে পৌঁছচ্ছে না।

মামা মামী ফিরে যাচ্ছেন। অর্ধচন্দ্রের আকার এই পাহাড়টা ঘুরে আমরা অন্য ধারে পৌঁছব। পাথরের ধাপ আছে, কাঠের পুল আছে, ঝরণার জল আছে—এ সমস্ত ছাড়িয়ে পাহাড়ের নিচে নামবার সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে ওঁরা নিচে নেমে যাবেন। আমরাও নামব। তারপর আহার। বেলা এখন দ্বিপ্রহর, ক্ষিধে পেয়েছে, তৃষ্ণাও পেয়েছে। দেহের ক্ষুধা মিটবার আগে আর কিছু হয় তো ভাল লাগবে না।

ইতিমধ্যে যে কয়েকখানা বাস এসে পৌঁছে গেছে, তাতে সন্দেহ নেই। অনেক মানুষ এসেছে। বাতির টাকা জমা দিয়ে অনেকে অনেকটা এগিয়ে এসেছে। দেখতে দেখতে সবাই এদিকেই আসছে। ইলোরার সেই বাঙালী দলটিকেও আমরা দেখতে পেলুম। বিচ্ছিন্ন-

ভাবে তাঁরা এগোচ্ছেন। এতে সময় নষ্ট হয়, গাইডেরও অসুবিধা হয় যখন তা বুঝতে পারবেন, তখন হয় তো একসঙ্গে চলবেন।

স্বাতি বলল : সেই মেয়েটিকে দেখতে পাচ্ছি নে।

সেই পুরুষটিকেও না।

এই দলটিকেও আমরা সন্তর্পণে এড়িয়ে গেলুম।

স্বাতি বলল : লজ্জায় বোধহয় আর বেরয় নি।

লজ্জা কিসের!

আর কী বাকি আছে!

একসঙ্গে বয়ে গেলে যে আরও লজ্জা।

প্রথম গুহাটা আমরা পেরিয়ে যাচ্ছিলুম। অজন্তার এই শেষ গুহা। এর পর আমরা নিচে নামব। আর হয় তো উঠব না, আর হয়তো আসবও না দেখতে। স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি তার হৃদয়ের কথা শুনতে পাচ্ছি। এই অন্ধকার গুহাটাই সে একবার শেষবারের মতো দেখে যাবে। বললুম : চল।

স্বাতি আগে, আমি তার পিছনে। কিন্তু ভিতরে ঢুকেই সে থমকে দাঁড়াল, আমার ডান হাতটা চেপে ধরল তার বাঁ হাত দিয়ে, তারপরেই আমাকে বাহিরে টেনে আনল।

অস্পষ্ট আলোয় আমি যা দেখতে পেয়েছিলুম, তাই যথেষ্ট। দুটি মানুষকে বড় বেশি ঘনিষ্ঠ দেখাচ্ছিল। শুধু একটু সৌরভ নিয়েই আমরা পিছিয়ে এলুম। চেনবার চেষ্টা না করেও যে মানুষ দুটিকে আমরা চিনতে পেরেছি।

স্বাতি আমার হাত ছেড়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিল। আমি ভুলি নি। আমি তার হাতের উত্তাপে যেন মনের উত্তাপ পাচ্ছি। আমার দেহমন কি মরা মানুষের মতো শীতল!

৩৬

আহারের পর স্বাতি বলল : এই দুপুর রোদে আমরা ফিরব , নিচের ঐ নদীর ধারে একটু বিশ্রাম নেব। তোমরা গাড়িতে থাক।

আমাকে ডাকল : এস।

আমি তার সাহস দেখে আজ বিস্মিত হলুম না। স্বাভাবিক সঙ্কোচে সে যে সাহসকে লুকিয়ে রেখেছে, সে পরিচয়ের আভাস আমি পেয়েছি। তার পাশাপাশি পা ফেলে আমি নদীর ধারে নেমে এলুম। বালির উপর, উপলের উপর। কোন স্নিগ্ধ ছায়ায় একটা বড় পাথরের উপর আমাদের বসতে হবে। স্বাতি অনেকটা গিয়ে গেল। বলল : সামনে ঝর্ণা চাই।

আমি হেসে ফেললুম।

হাসলে যে ?

মধ্যাহ্নের রৌদ্র যবে—

স্বাতি উত্তর দিল না। খুঁজে খুঁজে একটা বড় পাথর বার ল, একটুখানি ছায়াও। নিজে বসে আমাকে তার পাশে ল। সঙ্কীর্ণ স্থান, তবু নিমন্ত্রণ ত স্বঙ্গ। আমাকে ইতস্তত তে দেখে নিজের হাতটাই দিল বাড়িয়ে, আর দ্বিধা চলে না, নি এসে ঘেঁষে বসলুম।

দু একজন মানুষকে দেখা যাচ্ছে কাছে ও দূরে। কে লক্ষ্য করছে, বা করছে না, তা আমরা দেখলুম না। পৃথিবীতে আমাদেরও কটা অধিকার আছে, সে অধিকার থেকে নিজেদের কেন বঞ্চিত রব।

নদীর উপর দিয়ে গাছের নিচে দিয়ে পাহাড়ের ছায়ায় ছায়ায় াওয়া বইছে। রৌদ্রের উত্তাপ নেই এতটুকু, আছে একটু নেশার

মতো শিরশিরে শীত। স্বাতি তার শাড়ির আঁচল এক হাতে চেপে রেখেছে, ছেড়ে দিলেই বোধহয় ছোঁয়াছুঁয়ি হবে।

স্বাতি চুপ করে ছিল। আমি ভাবছিলুম, কী ভাবব। ভাববার মতো কোন কথা খুঁজে পাচ্ছি না।

হিউএন চাঙের কথা ভাবব! সেই চীনা পরিব্রাজক পায়ে হেঁটে সমস্ত ভারতবর্ষ পরিক্রমা করেছিলেন। তিনিও এসেছিলেন এই অজন্তা গুহায়। তারপর ফা হিয়েন। অজন্তাকে উপেক্ষা করতে তিনিও পারেন নি। দুজনেই তাদের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে অজন্তার ঐশ্বর্যের কথা ধরে রেখে গেছেন। দুঃসাহসী তাঁদের ভ্রমণের পথ।

কী আশ্চর্য! এই কথাটি যেন কোথায় আমি পড়েছি। দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে। কোথায় পড়েছি সহসা মনে পড়ছে না।

স্বাতি হঠাৎ প্রশ্ন করল : কী ভাবছ?

কী ভাবছি!

সত্যিই তো, আমি এখন কী ভাবছি! নিজের কথা ভাবছি না, স্বাতির কথাও না। অজন্তার কথাও আর আমার মনে পড়ছে না। আমি কি একটি কবিতার লাইন ভাবছি!

চুপ করে রইলে যে?

একটি কবিতার লাইন মনে পড়েছে, ভাবছি, কোথায় পড়েছি।

বল।

দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে—

স্বাতি একটু হাসল।

বললুম : হাসলে যে?

এই কবিতা তোমার এখানে কেন মনে এল?

তা তো জানি না।

স্বাতি বলল :

তুলে নিল দ্রুতরথে
দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে।

মনে পড়েছে। এ যে শেষের কবিতা। পরের লাইনটি সে বলল না, অকস্মাৎ থেমে গেল। এত কাছাকাছি বসে বুঝি বলা যায় না—তোমা হতে বহু দূরে।

আমার আর একদিনের কথা মনে পড়ল। দিনের কথা নয়, রাতের কথা। মাত্র কয়েকটা দিন আগে কন্যাকুমারীর সমুদ্রবেলায় আমি স্বাতির সঙ্গে পাশাপাশি বসে ছিলুম। একখানা বড় পাথরের উপর, আর একটু দূরে দূরে। আকাশে চতুর্দশীর চাঁদকে ঘিরে নক্ষত্রের নৃত্যসভা বসেছিল। কাছে দূরে সর্বত্র সমুদ্রের অশান্ত তরঙ্গ-ভঙ্গ, আর তার অবিরাম গম্ভীর গর্জন। বাতাস বড় দুরন্ত হয়ে উঠেছিল। তবু স্বাতি নিজেকে হারাতে পারে নি। অত জল, অত আলো, অমন আকাশ, অমন অসীম উদার পরিবেশেও স্বাতি ভবিষ্যতের কথা ভেবেছিল, বলেছিল: দেশে ফিরে বাবার অনুগ্রহ নিয়ে নিজেকে ছোট ক'রো না।

গদ্যে আমি সম্মতি জানাতে পারি নি। উত্তর দিয়েছিলুম কবিতায়। তবু সেদিন সাহস করে বলতে পারি নি:

কিছু মোর পিছে রহিল যে
তোমার প্রাণের প্রান্তে

শুধু নিজের কথা বলেছিলুম:

বিস্মৃত প্রদোষে
হয়তো দিবে সে জ্যোতি,
হয়তো ধরিবে কভু নাম-হারা স্বপ্নের মুরতি।

আজ আমাদের সামনে সমুদ্র নেই, ঢেউ নেই, নেই তার দুরন্ত গর্জন। উদার আকাশ থেকে চতুর্দশীর চাঁদ জ্যোৎস্নার মদ ঢেলে দিচ্ছে না। তবু আমার মন হয়েছে থমথমে, যেন নেশা ধরেছে। ইচ্ছে হল বলি:

আমার শূন্যতা তুমি পূর্ণ করি গিয়েছ আপনি।

কিন্তু এই আমিটা কে! গরীব বাঙলার একটা ভবঘুরে বাউণ্ডুলে

ছেলে বই তো নয়! আমার সমাজ কী, আমার পরিচয় কী, কিসের আমার মর্যাদা! কত দেশ তো ঘুরে ঘুরে দেখলুম, কত কীর্তি, কত নরনারী। এসব আমার দেশের ভেবে বুক হয় তো ভরে উঠেছে, কিন্তু আমাকে নিয়ে বুক ভরেছে কার! আমার মূল্য যে মাপা হয়েছে চাঁদির টাকায়, চাঁদের জ্যোৎস্নায় নয়। এত সহজে আমার নেশা হলে চলবে কেন! নিজেকে আমি সামলে নিলুম।

স্বাতি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল: তোমার নিজের সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন নেই, কোন কৌতূহল?

কী আশ্চর্য! স্বাতিও কি আজ আমারই মতো ভাবছে! বললুম: ভুলে থাকি। প্রয়োজন হয় না বলেই বোধ হয় মনে পড়ে না।

ভারতের অর্ধেকটা আমরা দেখে নিলাম, কিন্তু জীবনের কিছুটাও কি দেখতে পেয়েছি?

জীবনটা যদি জগতের মতো খোলামেলা হত, নিশ্চয়ই দেখতে পেতুম। সেটা সঙ্কীর্ণ বলেই এত অন্ধকার।

আমি কেন সঙ্কীর্ণ ভাবতে পারি নে, কেন আমি আলোর মতো হাওয়ার মতো জীবনকেও ছড়িয়ে দিতে চাই। এত দেখেও কি আমাদের মুক্তি হবে না?

আমি তাকে চেতনার জগতে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করলুম। বললুম: তাপ্তির কথা বোধ হয় শুনেছ। সে ঐ ফরাসী যুবকের সঙ্গে বিদেশে চলে যাচ্ছে।

তারপর?

তার পরের কথা তারা এখনও ভাবে নি।

গুহার ভিতর আমরা যাদের দেখে এলুম, তাদের কথা স্বাতি জানতে চাইল না। আমিও পারলুম না তাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে। আমার অন্য কথা মনে পড়ল। স্বাতির রুমালটা আমার পকেটে আছে। সেটা তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় নি, তার সুযোগ

পাই নি। আদৌ সেটা ফিরিয়ে দেবার ইচ্ছা ছিল কিনা, তা ভেবে দেখি নি। আজও কিছু না ভেবে আমি রুমালখানা বার করলুম।

স্বাতি চমকে উঠল, বলল: এ কি, এ তুমি কোথায় পেলে?

মহিসুরের চন্দনের গন্ধ। মিলিয়ে যেয়েও যায় নি। উগ্রতা কমে আরও মিষ্টি লাগছে। বললুম: ভুল করে তুমি আমায় দিয়েছ। ফিরিয়ে নাও।

স্বাতি তার হাত বাড়িয়েছিল, আমার কথা শুনে ফিরিয়ে নিল।

বললুম: নেবে না?

স্বাতির দৃষ্টি বেদনায় ছলছল। কিন্তু আমার মন বুঝি তৃপ্তিতে ভরে গেল। বললুম: থাক, আমার কাছেই থাক।

জীবনের এই প্রথম সঞ্চয়। রুমালখানা পকেটে পুরে স্বাতির মুখের দিকে যখন তাকালুম, তখন তার বেদনার্ত দৃষ্টি অন্তর্হিত হয়েছে। হঠাৎ তাকে প্রসন্ন দেখাচ্ছে।

উপরের বৌদ্ধ বিহারে কোনদিন আরতির ঘণ্টা বাজত কিনা জানি না। উদাত্ত স্বরে যতিরা মন্ত্রপাঠ করতেন, সুমুখ বহু জাবান। সুখে আমরা জীবন যাপন করব। সেই প্রার্থনা নিচের এই নদীতীরে এসে পৌঁছত, পৌঁছত এই পাহাড় ডিঙিয়ে ভারতের বিরাট সমতলে, হিমালয় পেরিয়ে চীন জাপানেও পৌঁছত। দক্ষিণের এই বাণিজ্যপথ ধরে মানুষ এই পথে আসত, জীবন পরিপূর্ণ করতে আসত।

আমার মনেও আজ কোন শূন্যতা নেই। স্বাতি যা ভাবছিল, তাও সে প্রকাশ করে দেখাল: সত্যি বল ত, আমরাও কি বেরতে পারি না দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে? যেমন—

কথাটা সে শেষ করতে পারল না। তার কি সেই অন্ধকার গুহার প্রাণবন্ত মানুষ দুটির কথা মনে পড়ছে! সেই ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ নরনারীর কথা! এখানেও যে আমরা বড় কাছাকাছি বসে আছি।

শুধু তো সৌরভ নয়, কবোষ্ণ উত্তাপও পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু তাদের মতো দুঃসাহস আমাদের কোথায়!

ঐ তো সেই দুঃসাহসী মানুষ দুটো! তারাও দেখছি এই দিকে নেমে আসছে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তাদের দেখা হয়ে গেল না আমরাই এখানে অনেকক্ষণ বসে আছি! দেখতে আ... একটু সময় লাগে! সময় লাগে তো জানতে। মানুষকে জা... চেয়ে বেশি সময় দরকার। একদিনে জানা যায় না, এক... হয়তো বাকি থেকে যায়। মানুষের জীবন যে অনেক ... দিয়ে, অনেক সংস্কার দিয়ে, অনেক অসত্য দিয়ে ঢাকা। ... বুঝি হাত বাড়িয়ে স্বাতির উত্তর দিতে পারলুম না: চল।

সে বড় নাটকীয় হত। বর্তমান শতাব্দীর শিক্ষিত ম... মতো সভ্য হত না। তাই আমি কবিতায় তার উত্তর দিলুম ... তো গরীব যাযাবর।

তোমারে যে দিয়েছিনু সে তোমারই দান,
গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।

দ্রাবিড়পর্ব সমাপ্ত